একটি ভোরের প্রতিক্ষায়

পৃষ্ঠপোষকতায়

জামান সরকার মনির
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
শীর্ষ খবর ডটকম

একটি ভোরের প্রতিক্ষায়

সম্পাদনায়

ডাঃ আব্দুল আজিজ
ও
সায়েক এম রহমান

শীর্ষখবর.কম
সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে

একটি ভোরের প্রতিক্ষায়
ডাঃ আব্দুল আজিজ
ও
সায়েক এম রহমান

প্রকাশনায়
শীর্ষ খবর ডটকম
৩৬/২, সোহেল প্লাজা, নীলক্ষেত
নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ : নান্টু ঘটক

বর্ণবিন্যাস : শীর্ষ খবর ডটকম

মুদ্রণ : শীর্ষ খবর ডটকম

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র।

UK £ 10.00

উ ৎ স র্গ

শ্রদ্ধেয় মরহুম বাবা
মোঃ আকমল আলী মা পরিবক্ত

অনুপ্রেরণায়

আমার জীবন সঙ্গিনী মোছাম্মৎ রাজিয়া বেগম ও আমার সন্তান গন ও নাতি নাতনি : আব্দুল হক শিপন, আব্দুল হাকিম রিমন, আবুল কালাম খান, নিপা বেগম রুনা, রাশেদা বেগম, আবুতাহের,আবিদা বেগম, তৌহিদা চৌধুরী, ছামির, আনিশা হক, নাফিসা, নিসা উদ্দিন।

কি ছু ক থা

স্বপ্ন আমাদের আকাশ ছোঁয়া

সুধী, ১২ বছরে পা রাখলো যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত অন-লাইন নিউজ পোর্টাল শীর্ষ খবর ডটকম। যাত্রাপথের এ সময়টাতে বেশ জনপ্রিয় এ নিউজ পোর্টাল। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই আমাদের অঙ্গীকার ছিল, দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মত পথ নির্বিশেষে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ উপহার দেওয়া। আজ "সত্য ন্যায়ের কথা বলে" শ্লোগানে এই অঙ্গীকার থেকে পাঠকের ভালোবাসায় আমরা সিক্ত। আপনাদের ভালোবাসা-ই আমাদের প্রাণশক্তি। সেই প্রানশক্তি ও প্রেরণার উৎস থেকেই আমাদের পোর্টালের গত তিন বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ লিখাগুলো স্বরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস, আমরা দুই সম্পাদকের যৌথ সম্পাদনায় "একটি ভোরের প্রতীক্ষায়" বইটি প্রকাশ করতে পেরে কিছুটা হলে ও সম্মানিত পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারব বলে আশাবাদী।

আপনাদের সকলের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সমর্থন পাওয়ায় সবাইকে এই শুভক্ষণে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বশেষে বলতে চাই...মাটি, মানুষ ও দেশ আমাদের কাছে সবার বড়ো অতএব একটি নতুন ভেরের প্রত্যাশায় থেকে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহ সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।

বিনীত
ডাঃ আব্দুল আজিজ
প্রধান সম্পাদক
শীর্ষ খবর ডটকম

উ ৎ স র্গ

যাকে আমি হারিয়েছি
যার অনুপ্রেরণায়
আমার সকল কাজের উৎসাহ যোগায়..
আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা
মরহুম আলহাজ এম. আব্দুল মতিন
ও
আমার মমতাময়ী মাতা শ্রদ্ধেয়া
আলহাজ সুরমা বিবি।

অনুপ্রেরণায়

প্রথমেই বলতে হবে জীবন সঙ্গিনী খায়রুন রহমান (সাজনা) ও আমার পরিবারবর্গ। বিশেষ করে যাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতার কথা না লিখলে না হয়, প্রাণপ্রিয় সন্তান সনিয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, আনিসা আক্তার, সাদিয়া আক্তার, ফারিহা আক্তার ও ইয়াছিন রহমান।

কি ছু ক থা

সুধী,

"সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে" শ্লোগান দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ ১২ বৎসরে পা রাখল, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক অন লাইন পোর্টাল "শীর্ষ খবর ডটকম"। পোর্টালটি প্রকাশের পর থেকে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, বহু প্রতিকূলতা আমাদের সঙ্গী হয়েছে কিন্তু পাঠক প্রিয়তার কাছে তা ছিল ম্রিয়মান। শীর্ষ খবর সর্বদা দেশ ও জাতিকে চিন্তা করে, সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে এগিয়ে যেতে চায়।

সুধী, আপনারা অবশ্য অবগত ২০১৮ সালের এপ্রিলে "অবরুদ্ধ বাংলাদেশ" নামে (লন্ডনে) আমার লেখা একটি বই প্রকাশ হয়েছিল। সেই দিন মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা ছিল আগামীতে যেন একটি "মুক্ত বাংলাদেশ" বই নিয়ে আসতে পারি।

বন্ধুরা, দুঃখিত আজও আমরা অবরুদ্ধ! আজ আমরা ফ্যাসিস্টের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে প্রিয় মাতৃভূমির লক্ষ কোটি মানুষ একটি ভোরের প্রতিক্ষায় দিন গুণছে!

আপনাদের ভাবাবেগ এবং আপনাদের চিন্তা-চেতনাকে একত্রিত করে আজকের এই প্রয়াস আমরা দুই সম্পাদকের যৌথ সম্পাদনায় "একটি ভোরের প্রতিক্ষায়" প্রকাশ করল শীর্ষ খবর পরিবার। বইটি তথ্য সম্বলিত সহজ সাবলীল ভাষায় রচিত। বিশেষ করে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২০২১ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিটি ঘটনার চিত্র তিনটি পর্বে বিভিন্ন কলামে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জানি না পাঠকসমাজের প্রত্যাশা পুরণে কতটুকু করতে পেরেছি? তারপর ও বলব যদি সামান্যতম ভালো লাগে বা সামান্যতম উপকৃত হোন, আমরা আমাদেরকে সার্থক মনে করব।

পরিশেষে একটি উজ্জ্বল প্রানোচ্ছল নতুন সূর্য উদয়ের প্রত্যাশা রেখে ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহ সহায় হোন।

বিনীত
সায়েক এম রহমান
উপদেষ্টা সম্পাদক
শীর্ষ খবর ডটকম

সূ চি প ত্র

- ক্ষোভে ফুঁসছে সারাদেশ, একটি ভোরের প্রতিক্ষায় বাংলাদেশ
  সায়েক এম রহমান ॥ ১৩

প্র থ ম প র্ব : ডাঃ আব্দুল আজিজ

- বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত মহিলা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ॥ ২৩
- রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা ইসহাক সরকার কেমন আছেন! ॥ ২৮
- প্রমাণিত হলো হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার "মা" খালেদা জিয়া ॥ ৩১
- শত্রু পক্ষের আতঙ্কের নাম তারেক রহমান, এক বক্তব্যে ঘুম হারাম ॥ ৩৫
- কারাবন্দি 'মা' খালেদা জিয়াকে দুই সন্তানের খোলা চিঠি ॥ ৩৯
- একনজরে আপসহীন দেশনেত্রী 'মা' খালেদা জিয়া ॥ ৪৩
- নির্বাচন এখন নির্বাসনে ॥ ৪৮
- তারেক রহমানকে নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজির শেষ কোথায়? ॥ ৫৩
- জনগনের নেত্রী তাই জনগণ কাঁদে খালেদা জিয়ার জন্য ॥ ৫৭
- সরকারি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনুমতি লাগে না, বিএনপির জন্য লাগবে কেন? ॥ ৬২
- লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বাস্তবে কতটা দৃশ্যমান? ॥ ৬৫
- ইলিয়াস আলী নিখোঁজ রহস্য ৭ বছরে অজানা থেকেই গেল! ॥ ৭১
- বাংলাদেশে ও বিশ্ব রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ণ! ॥ ৭৫
- আলোর পথযাত্রীরা মশাল হাতে এক অজানা দিনে 'মা' এর মুক্তির জন্য রাজপথে বেরিয়ে পড়বে ॥ ৮৪
- আপসহীন নেত্রী ম্যাডাম থেকে গণতন্ত্রের 'মা' ॥ ৮৯
- একটি ঘোষণা, একজন মেজর জিয়া এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম ॥ ৯২

দ্বি তী য় প র্ব : সায়েক এম রহমান

- মাতৃভুমি 'মা' তুমি জবান খুলো ॥ ৯৯
- রোহিঙ্গা ও বিশ্ব মানবতা ও শেখ হাসিনা ॥ ১০৩
- বেগম খালেদা জিয়ার ২০৩০-ই আজ এদেশের মানুষের মুক্তির ভিষণ ॥ ১০৮
- বসন্তের ফুল ফুটুক আর নাই-ই ফুটুক, আজ জেগেছে এই জনতা ॥ ১১৩
- পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য জন স্রোতে বেগম খালেদা জিয়া ॥ ১১৮
- প্রসঙ্গ : 'হাওয়া ভবন' ॥ ১২২
- দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হাজির ॥ ১২৭
- খেলার কার্ড এখন জনতার হাতে, আরেকটি পতনের অপেক্ষায় জাতি ॥ ১৩২
- রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ, ওরা-ই লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মা! ॥ ১৩৮
- হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের দেশ, 'আজকের বাংলাদেশ' ॥ ১৪২
- খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা মানে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা, খালেদা-ই গণতন্ত্রের প্রতীক ॥ ১৪৭
- এ কোন হিংস্রতা, বর্বরতা! এর শেষ কোথায়? ॥ ১৫১
- একজন গণতন্ত্রের প্রতীককে প্যারোলে মুক্তি নয়, জামিনে মুক্তি-ই তার অধিকার ॥ ১৫৭
- যদি হতে পার কবি নজরুলের মতো 'আমি সৈনিক' তবেই মুক্ত খালেদা জিয়া, তবেই মুক্ত এদেশের গণতন্ত্র ॥ ১৬১
- একজন প্রধানমন্ত্রী ও একটি ফোনালাপ, ইতিহাসের কালো পাতায় রক্ষিত থাকবে আজীবন ॥ ১৬৪
- একজন তারেক রহমান ও একটি অগ্নি ঝরা বক্তব্য ॥ ১৬৭
- মজলুম মাহমুদুর রহমান রক্তাক্ত হননি, রক্তাক্ত হয়েছে দেশ ও জাতির বিবেক ॥ ১৭১
- একজন মইনুল হোসেনকে আর কত? আওয়ামী ফ্যাসিজমের শেষই বা কোথায়? ॥ ১৭৪
- একটি "গণবিস্ফোরণ" এখন সময়ের ব্যাপার ॥ ১৭৭
- একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও কালো অধ্যায় ॥ ১৮০
- শুধু নিরাপদ সড়ক নয় নিরাপদ রাষ্ট্রও চাই ॥ ১৮৫
- আজ বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশ ॥ ১৮৯
- জিয়া তুমি স্বাধীনতা : জিয়া তুমি অম্লান ॥ ১৯১
- 'করোনা' হোক মানবজাতির এক মহান শিক্ষা ॥ ২০১
- "খেতাব সরানো যাবে, কবরও সরানো যাবে, কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা জিয়া কি সরানো যাবে" ॥ ২০৪

তৃ তী য় প র্ব : শীর্ষ খবরের সম্মানিত লেখকবৃন্দ

- বঙ্গভবনের সেই দিনগুলো : **মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ॥ ২১১**
- যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে : **শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ॥ ২২০**
- তবুও কি আ.লীগ জিয়ার অবদান অস্বীকার করবে? : **মারুফ কামাল খান ॥ ২২৩**
- আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া : **শওকত মাহমুদ ॥ ২২৮**
- তারেক রহমান সম্পর্কে যা শুনেছি শুনছি এবং যেরকম দেখেছি : **মিনার রশিদ ॥ ২৩৪**
- মুক্তিযুদ্ধ খেতাব বাতিলের রাজনীতি : **ড. আসিফ নজরুল ॥ ২৩৯**
- কৃষি-উন্নয়নে রণাঙ্গনের যুদ্ধা শহীদ জিয়ার অবদান : **জামান সরকার মনির ॥ ২৪৩**
- ইতিহাস তারেক ও কোকো'কে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাক্ষী দেয় : **রাকেশ রহমান ॥ ২৫০**
- চরিত্রহনন এবং গণতন্ত্র : **হুমায়ুন কবির ॥ ২৫৩**
- মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে জিয়ার সাহসিকতার খেতাব বাতিল কার স্বার্থে? : **ডক্টর এম মুজিবুর রহমান ॥ ২৫৮**

ক্ষোভে ফুঁসছে সারাদেশ, একটি ভোরের প্রতীক্ষায় বাংলাদেশ

সায়েক এম রহমান

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি আজ এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত! দিকে দিকে গণমানুষের গগনবিদারী চিৎকার! ধর্ষণের উপর ধর্ষণ, খুন, গুম, পৈশাচিক নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, দেশ আজ উলঙ্গ! ধর্ষিত আজ জনগণ, ধর্ষিত আজ গণতন্ত্র! নেই মানুষের মানবাধিকার, নেই ভোটের কোন অধিকার। এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ৪৭ থেকে শুরু করে ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭০, ৭১, ৯০, আজ এ সব অর্জন নসাৎ হয়ে গেছে।

আজ বিনা ভোটের নির্লজ্জ ক্ষমতাসীন দলের আওয়ামী সংগঠনের বেপরোয়া সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও সরকারি মদদ মিলিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি এক নরক রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এই তো ৪ অক্টোবর মানব জমিন শিরোনাম করল, "গত সাড়ে চার বছরে ৪, ৫০০ ধর্ষণ!"

শুধু গত নয় মাসেই ১, ৬০০ বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আর শুধু শিশু ধর্ষণই হয়েছে প্রায় ৭ শত। আর গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন প্রায় ৩ শত নারী। এখন হাজার কোটি টাকার প্রশ্ন..." এ সব কি মানবতাবিরোধী অপরাধ নয়? তা- হলে এখন কোথায় তথাকথিত সেই সব মানবতাবিরোধী অপরাধের ফেরি- দোকানিরা? ধিক্কার জানাই তাদেরকে।

নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ না করলে না হয়...

এক

- ২৭ নভেম্বর নরসিংদী রায় পুরায় রমিজউদ্দিন অডিটোরিয়ামে ডেকে নিয়ে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করল উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আসাদুল হক চৌধুরী (২৭)।
- ২১ অক্টোবর নোয়াখালীর চাটখিলে ঘড়ের দরজা ভেঙে প্রবাসীর স্ত্রীকে তার সন্তানের সামনে ধর্ষণ করল যুবলীগ সভাপতি মুজিবুর রহমান শরিফ (৩২)।
- বিয়ের কথা বলে ডেকে নিয়ে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করল ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি মো মামুন হাওলাদার। গত ২০ অক্টোবর ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে দাবি জানান হয়।
- দেশবাসী অবগত, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ একলাপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ানডের একজন নারীকে সম্পূর্ণই বিবস্ত্র করে প্রচণ্ড নির্যাতনের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়...নির্যাতনের ভিডিও ক্লিপ! কয়েক সেকেন্ড দেখে কার ও দেখার আর সাধ্য হয় নাই, এই নির্যাতনের ক্লিপ দেখতে, একজন নিরীহ নারীর উপর যেভাবে হায়েনারা হামলে পড়েছে। ধর্ষকের নাম দেলোয়ার। সরকারি দলের মানুষ। জাতি দেখছে, নোয়াখালীর এই আসনের এমপির সাথে তার ছবি ফেসবুকে হাঁটছে।
- নোয়াখালীতে আবারও গৃহবধূ কে বিবস্ত্র ভিডিও ধারন করে ধর্ষণ মেলা হয়। ৯ অক্টোবর উপজেলার ছাতার পাইয়া এলাকায়। তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করল। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ভাইরাল হল।

- এই তো সেদিন শত বৎসরের বিদ্যাপিঠ সিলেটের এস সি কলেজের হোস্টেলে স্বামীর হাত থেকে স্ত্রী কে কেড়ে নিয়ে স্বামী কে বেঁধে ধর্ষণ করল ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসীরা। উল্লেখ্য যারা এই ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটালো তারাই কিন্তু এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আগুন দিয়ে পুঁড়িয়েছিল। তারাই আবার এমসি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী খাদিজাকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ছিল।
- জাতি অবগত, আজও সাগর–রুনির সেই ৪৮ ঘন্টা হয় নাই! এই পর্যন্ত ৭৫ বার তদন্ত প্রতিবেদনের তারিখ পেছানো হল। বিধি জানেন আরও কত বছর লাগবে তাদের প্রতিবেদন দাখিল হতে! উল্লেখ্য ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তাদের নিজ বাসার বেড রুমে হত্যা হয়েছিলেন।
- পাঠক...প্রিন্ট মিডিয়া সহ প্রায় সকল মিডিয়ায় ই জাতি দেখছে, সাংবাদিক গোলাম সরওয়ারের কাহিনি!

  আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ পর পর একটু জ্ঞান ফিরলেই বলছিলেন, আমি আর নিউজ করব না, দয়া করে তোমরা আমাকে আর মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও। এভাবেই চিৎকার করে করে আহাজারি করছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর নিস্তার হয় নাই। শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের একটি খালের পাশে নিখোঁজের চার দিন পর অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
- লজ্জা শরমের এতই আকাল পড়েছে যে, সেদিন সিরাজগঞ্জ ১আসনের উপ-নির্বাচনে আঃ লীগ প্রার্থী প্রকৌশলী তানবির শাকিল জয় পেয়েছেন ১ লক্ষ

৮৮ হাজার ৩২৫ ভোটে। আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির সেলিম রেজা পেয়েছেন মাত্র ৪৬৮ ভোট! হায়রে ভোট! হায়রে ভোটাভুটি!

- মাত্র ১০ হাজার টাকার জন্য সিলেটের বন্দর বাজার পুলিশ ফাঁড়িতে এস আই আকবর কতৃক রায়হানকে রাতভর নির্যাতন করে হত্যা।
- সদ্য যোগ হয়েছে ভাস্কর্য নিয়ে আরেক পায়তারা! আঃলীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বললেন, "বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টা চলছে। ভাস্কর্যকে যারা মূর্তি বলে অপপ্রচারে নেমেছে, তারা নিজেরাই ভুলে আছেন।"

  আসলে কাদের সাহেবরা নিজেরাই জানেন না যে, লাউ আর কদু যেমন, ভাস্কর্য আর মূর্তি তেমনি। তারা আসলে একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে, মসজিদের দেশকে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চাচ্ছে। কাজ হবে না। মানুষ কিন্তু ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে! এটা শতকরা নব্বই জন মুসলমানের দেশ!
- এদিকে প্রদীপের হাতে মেজর সিনহার করুণ হত্যাকাণ্ড ও হাজি সেলিমের ছেলে ইরফান বাহিনীর হাতে নৌ কর্মকর্তা লেঃ মো ওয়াসিফ আহমদকে মারধর করে তাঁর দাঁত দুইটি তুলে ফেলে। আর কি দেখতে হবে? বর্বরতার সব সীমা যেন শেষ হয়ে গেছে।

এত সমস্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কথা গুলি একটু শুনে আসি.. তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ বললেন, "বিএনপির আশ্রয় প্রশ্রয়ে নারী ধর্ষণ হচ্ছে।" আর আইন মন্ত্রী আনিসুল হক বললেন, "নোয়াখালীর নারী নির্যাতনের ঘটনা বিএনপির ষড়যন্ত্র হতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, "বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন কোন দেশে ধর্ষণ হয় নাই।" এই কথাগুলো শুনে পাগলেও হাসে।

সব কথার মূলে এখন রাষ্ট্র যন্ত্র অকেজো, গণতন্ত্র নসাৎ, নেই মানবিকতা, চলছে বিচার হীনতার সংস্কৃতি। একটু পিছনে গেলে চলে আসে... যেখানে ৪৮ ঘন্টার ভিতরে সাগর রুনির হত্যার রহস্য উদঘাটন হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত ৭৫ বার তদন্ত প্রতিবেদনের তারিখ পিছানো হল। ৮ বৎসরে তদন্ত প্রতিবেদনটা দাখিল হয় নাই। এখানেই প্রতীয়মান হত্যাকাণ্ডে কারা জড়িত।

এ ছাড়া জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটির সেঞ্চুরিয়ান মানিক থেকে শুরু করে তনু-মিতু। আর তনু মিতু থেকে শুরু করে সুবর্ণ চড়ের চার বাচ্চার মাকে নৌকায় ভোট না দেওয়ার অপরাধে আওয়ামী দলের গণধর্ষণ। সিলেটের এম সি কলেজে স্বামী কে বেঁধে রেখে স্ত্রী কে ছাত্রলীগ কতৃক গণধর্ষণ। ষোলমাইদ উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী রাজধানী বাটেরা এলাকা থেকে ৯ বছরের লিজা দোকান থেকে

রং পেন্সিল কিনতে গিয়ে ধর্ষিত হয়ে, লাশ পৌঁছে মায়ের কাছে। আজ ধর্ষিতার চিৎকারে প্রিয় মাতৃভূমি এক নরক রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ উলঙ্গ! ধর্ষিত আজ গণতন্ত্র! বেপরোয়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী সংগঠন গুলো! আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়ে ছিলাম?

দুই

পাঠক গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিবিসির ডেবিট এডমন্ডসের একটি রিপোর্ট ছিল, একজন স্বৈরশাসককে ক্ষমতা থেকে সরাতে কত মানুষকে রাস্তায় নামতে হয়? নিউজটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একজন স্বৈরশাসক কে বিদায় করতে কোন কৌশল বেশি কার্যকরী? প্রশ্ন সহিংস আন্দোলন না অহিংস আন্দোলন? আর স্বৈরশাসক কে ক্ষমতা থেকে সরাতে বিক্ষোভ গুলি কত বড় হতে হবে? এবং কত মানুষকে জড়ো করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হার্ভাডের একজন গবেষক এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণা চালিয়েছেন বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব দেশে গণআন্দোলন ও গণবিক্ষোভ হয়েছে সে দেশগুলোর উপর। এ সব গবেষণার ভিত্তিতে তিনি পেয়েছেন কোন জনগোষ্ঠীর মাত্র তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ মানুষ যদি গণআন্দোলন বা গণবিক্ষোভে যোগ দেন, তাতেই একটা স্বৈর সরকার পতন হয়ে যায়। সেইদিক থেকে পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ রাস্তায় চলে আসলে পতন অনিবার্য।

বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর সফল আন্দোলনের অনেক নজির রয়ে গেছে। যেমন আশির দশকে পোল্যান্ডে হয়েছিল সলিডারিটি আন্দোলন। যার নেতৃত্ব দিয়েছিল শ্রমিক ইউনিয়ন গুলো। এছাড়া দক্ষিণ বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। চিলির স্বৈরশাসক আগাস্তো পিনোশের পতন ঘটেছিল গণআন্দোলনের মুখে। সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলাসেভিচকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয় সফল আন্দোলনের মাধ্যমে।

একেবারে নিকটতম উদাহরণ হলো আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল, ২০১০ সালে ২৩ বৎসরের স্বৈরশাসক জয়নাল আবেদীন বিন আলীকে তিউনিসিয়া থেকে বিদায়ের মাধ্যমে। সেখানে এই গণঅভ্যুত্থানের নাম দেওয়া হয়েছিল "জাসমিন বিপ্লব।

এছাড়াও ত্রিশ বৎসরের শক্তিশালী স্বৈরশাসক হোসনে মোবারক তাহরির স্কয়ারে মাত্র তিন সপ্তাহের একটি গণআন্দোলনের মুখে লজ্জাজনক বিদায় নিতে হলো মিশর থেকে। আর প্রায় চার দশকের আরেক শক্তিশালী স্বৈরশাসকের করুণ পতন হলো লিবিয়ার কর্ণেল গাদ্দাফির।

আর সদ্য আরেকটি সফল বিপ্লবের উদাহরণ হয়েছিল সুদানে, সেখানেও আন্দোলনের মুখে করুণ ভাবে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল অমর আল বশিরকে। প্রায় একই অবস্থায় বিদায় নিতে হয়েছিল আলজেরিয়ার আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকাচে।

এ ভাবেই আন্দোলনের পথ ধরে ধরে বিশ্বের সকল ফ্যাসিস্টরা লজ্জাজনক বিদায় নিতে হচ্ছে। বাংলাদেশও তার বাহিরে নয়।

বাংলাদেশ দেখেছে স্বৈরশাসক আইয়ুব, এয়াহিয়া, ও এরশাদের পতন!

এরশাদের পতনের ৩০ বৎসর পর আরেকটি পতনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ ইতিহাস বলে গেছে সব ফ্যাসিস্টরা এক বাপেরই সন্তান! তাদের রূপ, গন্ধ ও লক্ষ্য ছিল এক। মূল লক্ষ্য থাকে স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সৌখিন জীবন পরিচালনা করা, এটাই থাকে তাদের খায়েস! কোন ফ্যাসিষ্টেরই খায়েস কিন্তু পূর্ণ হয় না।

পাঠক, নভেম্বর ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ মাস, আন্দোলনের মাস, বিজয়ের মাস! এই ২/৩ মাসেই বাংলাদেশের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে! আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে শাসক দল যখন অস্থির ও দিশেহারার মতো দৌড় ঝাঁপ করছে। তখন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে ভাসছে শাসক দল প্রধানের মাছ ধরার ছবি, সেলাই মেশিনে কর্মরত ছবি, রান্না ঘরের রান্নার ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব অভিনয়ে কারো বুঝার বাকি নাই! অনেক আমলাদেরকে না কি পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে এবং অনেকে না কি পদোন্নতি নিচ্ছে না। এতে সহজে অনুমেয় অবস্থা কোথায়?

ইতিহাস বলে গেছে, যখন জনতার সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিয়ম নীতি মেনে জনতার দাবি আদায় হয় না। তখন নিজেই নিজের বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে। এ নিয়ম, এ আইন কার জন্য? তখন নিজের বিবেকই বলে দিবে এ আইন তো মানুষেরই জন্য। মানুষই তৈয়ার করবে, মানুষের আইন। মানুষের ন্যায্যতা, মানুষের অধিকার, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের সার্বভৌমত্ব মানুষকেই আদায় করতে হয়।

আজ দিকে দিকে মানুষ কিন্তু ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে। এখনই সময় কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে নামতে হবে।

বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব চাইতে বড় দল! মানুষ বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু ভার্চুয়েলে থাকলে কাজ হবে না। বিএনপিকে এই মুহূর্তে রাজপথে আসতে হবে। এখনই সময়! মহান সৃষ্টি কর্তা বলছেন, "তোমার ভাগ্য তোমাকেই পরিবর্তন করতে হবে। অধিকার কেউ কাহার ও ঘড়ে তুলে দিবে না।" ১২ টি বৎসর পার করে জতি এখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায়! যে যা-ই বলুন মানুষের শেষ ভরসা কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। কারণ বিএনপি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দল, বিএনপি আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল, বিএনপি দেশনায়ক তারেক রহমানের দল ও বিএনপি তৃণমূল নেতাকর্মীর দল। সাধারণ মানুষ চতুর্দিকে হাহাকার করছে আর একটি ভোরের প্রতিক্ষায় দিন গুণছে!

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ১ ডিসেম্বর, ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

প্র থ ম প র্ব

ডাঃ আব্দুল আজিজ

প্রধান সম্পাদক, শীর্ষ খবর ডটকম

সূ চি প ত্র

প্র থ ম প র্ব : ডাঃ আব্দুল আজিজ

- বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত মহিলা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ॥ ২৩
- রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা ইসহাক সরকার কেমন আছেন! ॥ ২৮
- প্রমাণিত হলো হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার "মা" খালেদা জিয়া ॥ ৩১
- শত্রু পক্ষের আতঙ্কের নাম তারেক রহমান, এক বক্তব্যে ঘুম হারাম ॥ ৩৫
- কারাবন্দি 'মা' খালেদা জিয়াকে দুই সন্তানের খোলা চিঠি ॥ ৩৯
- একনজরে আপসহীন দেশনেত্রী 'মা' খালেদা জিয়া ॥ ৪৩
- নির্বাচন এখন নির্বাসনে ॥ ৪৮
- তারেক রহমানকে নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজির শেষ কোথায়? ॥ ৫৩
- জনগনের নেত্রী তাই জনগণ কাঁদে খালেদা জিয়ার জন্য ॥ ৫৭
- সরকারি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনুমতি লাগে না, বিএনপির জন্য লাগবে কেন? ॥ ৬২
- লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বাস্তবে কতটা দৃশ্যমান? ॥ ৬৫
- ইলিয়াস আলী নিখোঁজ রহস্য ৭ বছরে অজানা থেকেই গেল! ॥ ৭১
- বাংলাদেশে ও বিশ্ব রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ণ! ॥ ৭৫
- আলোর পথযাত্রীরা মশাল হাতে এক অজানা দিনে 'মা' এর মুক্তির জন্য রাজপথে বেরিয়ে পড়বে ॥ ৮৪
- আপসহীন নেত্রী ম্যাডাম থেকে গণতন্ত্রের 'মা' ॥ ৮৯
- একটি ঘোষণা, একজন মেজর জিয়া এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম ॥ ৯২

বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত মহিলা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার বিএনপি'র নেত্রী বেগম জিয়ার ক্ষতি করতে গিয়ে তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে বেগম জিয়াকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। সমসাময়িক বিশ্বে স্বাধীন, এমনকি পরাধীন কোন দেশে বেগম জিয়ার মতো এত নির্যাতিত নারী আর কেউ আছেন কী না। সরকারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অং সান সুচিও বেগম জিয়ার ধারে কাছেও নেই।

তারই ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া যে হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তারই আজ্ঞাবহ আদালতের মিথ্যা ফরমায়েশি রায়ে ৭৩ বছরের একজন বৃদ্ধ মহিলা বিনা অপরাধে জেলে কাটছেন তার প্রমাণ নিজে হাসিনা লন্ডন সফর কালে অকপটে বলে ফেলেছেন একটি ফোন আলাপ এখন ভাইরাল। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ফোনালাপে শেখ হাসিনা তার এক বিশেষ নেতাকে ফোন করে বলেছেন হোটেলে যেন নেতাকর্মীর বেশি না আসে, দু-একজন আসলে আসতে পারে। হোটেল ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আর বিএনপিকে বলে দিবেন- তারেক রহমান যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তার মা কোনদিনও মুক্তি পাবে না। বেগম জিয়ার মূল অপরাধ তিনি ও তার নেতৃত্বাধীন দল বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) শেখ হাসিনা এবং তার নেতৃত্বাধীন দল আওয়ামী লীগ অপেক্ষা বাংলাদেশের জনগণের কাছে অধিকতর জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তাই শেখ হাসিনার চক্ষুশূল এবং রাজনৈতিক পথের কাঁটা। বাংলাদেশের আর কোন ব্যক্তি কিংবা দলকে শেখ হাসিনা তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। বিএনপি বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক ও ধর্মভীরু জনমতের প্রতিনিধি

বিশেষ। তাই শেখ হাসিনার ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও ভারতের দীর্ঘমেয়াদী বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী আগ্রাসী চক্রান্ত বাস্তবায়নের বিরোধী সাধারণ ও অভিন্ন শত্রু হলো বিএনপি।

তাই শেখ হাসিনা ও ভারত উভয়ই বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া। তারা জানেন বিএনপি'র প্রাণ ও কাণ্ডারি জিয়া পরিবার। এই পরিবারকে শেষ করতে পারলে বিএনপি'কে শেষ করা মুহূর্তের ব্যাপারে পরিণত হবে। তাই এই পরিবারের সদস্য বেগম জিয়া ও তার ছেলে তারেক রহমানকে রাজনীতি হতে দূরে রাখার জন্য শেখ হাসিনা ও তার সহযোগী ভারত অবিরাম চক্রান্তে লিপ্ত। এই দীর্ঘ চক্রান্তের চলমান শিকার বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম জিয়া এবং তার ছেলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশে কারারুদ্ধ। আর তারেক রহমানের দেশে আসার সব পথ বন্ধ করায় তিনি লন্ডনে নির্বাসিত। দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা নিশ্চিত চলমান বাংলাদেশে বেগম জিয়ার মতো স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক অমায়িক রাজনীতিক দ্বিতীয় কেউ নেই। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি বিরোধীদের সব দাবি মেনে নিয়েছেন। বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করতে ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন নি। গণতান্ত্রিক ধারা ও মূল্যবোধ হতে সরে আসেন নি। জনগণের চাওয়া-পাওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন নি। তার ধ্যান-ধারণায় কাজে একদলীয় একনায়কতন্ত্র কখনোই প্রশ্রয় পায়নি। হাজারো প্রচারণা সত্ত্বেও তিনি তার ক্ষমতাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন, কিংবা দুর্নীতি করেছেন বাংলাদেশের মানুষ এমন অপবাদে আজো বিশ্বাস করেন না। তার বিরুদ্ধে যতো প্রচারণা চলে তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা যতো বাড়ে তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ততো বাড়ে। এই জন্য শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন, "আমি এত উন্নয়নমূলক কাজ করি অথচ মানুষ আমার দলকে ভোট দিতে চায় না।"

শেখ হাসিনার এই আত্মোপলব্ধিই তাকে বিএনপি নির্মূলের অভিযানে জিয়া পরিবারকে রাজনীতি হতে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালাতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু বেগম জিয়ার নির্মল ও নির্লোভ অপসহীন চরিত্র সব চক্রান্তকে ব্যর্থ করছে। তিনি কখনোই নিজ স্বার্থে দেশের স্বার্থ ও অস্তিত্বকে বিদেশী শক্তির কাছে বন্ধক দেন নি, কোন চাপের কাছে মাথা নত করেন নি। বিশেষত দেশের সাথে বেইমানি করে ভারতের চাহিদা পূরণে সম্মত হলে বেগম জিয়ার কিংবা তার পরিবারের এবং বিএনপি'র আজকের দশা হতো না। বেগম জিয়া কিংবা বিএনপিকে আজকের বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়তে হতো না, যদি বেগম জিয়া স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে বেইমানি করে শেখ হাসিনার কথামতো ভাগাভাগির রাজনীতি করতেন। ২০১৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে নির্বাচন বর্জনের আন্দোলন হতে সরে এসে শেখ হাসিনার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেখ হাসিনা বেগম জিয়াকে বলেছিলেন, "আপনি যে যে পদ চান তা-ই আমি দেব।" উল্লেখ্য, মাইনাস টু ফর্মূলার অংশ হিসেবে মঈন ইউ আহমেদরা বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে। তাদের দুইজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। তাদের দুইজনকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। শেখ হাসিনা তাদের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে কানের চিকিৎসার নামে বিদেশে চলে যান। বেগম জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর জন্য বিমান সব প্রস্তুতি শেষ করেও মঈনদের চাপে আটক বেগম জিয়া সরাসরি বলে দিয়েছেন, মরতে হলে দেশের মানুষের সাথে দেশে মরবো, বিদেশে যাব না। বেগম জিয়াকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার কাহিনী আরো লজ্জাজনক চক্রান্তের প্রতিফলন। মঈনরা শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে মামলা দায়ের করে শেখ হাসিনা ওই মামলাসহ তার ও তার দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাসমূহকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা হিসেবে উল্লেখ করে প্রায় আট হাজার মামলা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বেগম জিয়া এবং বিএনপির নেতাকমীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার একটিও প্রত্যাহার তো করা হয়ই নি, বরং হাজার হাজার সাজানো নতুন মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। বেগম জিয়া যে জিয়া চ্যারিটেবল হতে কোনো অর্থই আত্মসাৎ করেন নি, তার প্রমাণ ব্যাংক একাউন্টে রয়েছে। কিন্তু দলীয়করণের আদালত অনেকের মতে শেখ হাসিনার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে বেগম জিয়াকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আদালত দলীয় প্রভাবমুক্ত কালে প্রথম শুনানির দিনেই মামলাটি এই যুক্তিতে খারিজ হয়ে যেতো যে, একই সরকারের আমলে একই ধরনের আরেকটি মামলাটি শেখ হাসিনা তুলে নিয়েছেন। সুতরাং আদালতের রায় যে কোনভাবেই আইনসম্মত নয়, বরং সুবিচারের বরখেলাপ তা অতি সাধারণ মানুষও বোঝেন।

এমন একটি রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক মিথ্যা মামলায় অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ অতি জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারারুদ্ধ। অনেকেই মনে করেন, শেখ হাসিনা কেবল নির্বাচনী প্রচারণা হতেই তাকে সরিয়ে রাখতে চান না, বরং তিনি চান বেগম জিয়া যেন কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন।

মহান আল্লাহ বেগম জিয়াকে সব অপমান ও নির্যাতন সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি ও আপসহীন থাকার ধৈর্য দিয়েছেন। শেখ হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের সময় চক্রান্তের শিকার প্রাণপ্রিয় ছোটো ছেলেকে হারিয়েও তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব তথা আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ান নি। বাকি ভবিষ্যতে বেগম জিয়া যে নুঁয়ে পড়বেন না, তা তিনি ইতোমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি আদালতকে বলেছেন, "যতো পারেন আমাকে শাস্তি দেন।" আর দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "গণতন্ত্র উদ্ধারে জোরদার আন্দোলন অব্যাহত রাখুন এমন আপসহীন নারী বাংলাদেশ কেন সমসাময়িক বিশ্বের কোথাও নেই। নেই এমন নির্যাতিত ব্যক্তিত্ব। এমন সৎ রাজনীতিক। এমন দেশপ্রেমিক। তিনি দেশ ও জাতির সম্পদ ও গৌরব। বেগম জিয়াই আমাদেরকে শিখিয়েছেন কীভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয়। দেশের স্বার্থ-সম্পদ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়। চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

জনতার আদালতে বেগম জিয়া নির্দোষ। তাই তিনি গণতন্ত্রের 'মা' হিসেবে জনস্বীকৃতি পাবার এবং ইতিহাসে অমর ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিবার মতো অবস্থানে পৌঁছেছেন। শেখ হাসিনার নির্যাতনের স্ট্রিম রোলারই এই জন্য দায়ী। ইতিহাস শেখ হাসিনাকে কীভাবে অভিহিত করবে, তা সবাই অনুমান নয়, অনুধাবন করতে পারেন। তবে ভয়ে বলতে পারেন না। তাদের মনে শেখ হাসিনার জায়গা নেই। আর এই জনগণই বেগম

জিয়ার জন্য দোয়া করছেন। জনগণের ভালোবাসাই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ হারানোর মতো নয়। শেখ হাসিনা বেগম জিয়ার এই সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। এখানেই বেগম জিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব নিহিত। আমরা তার জন্য দোয়া করি।

প্রকাশকাল : শুক্রবার, ১৭ মে, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা ইসহাক সরকার কেমন আছেন!

আজ কিছু লিখতেই হচ্ছে, সবার পরিচিতি মুখ, তুখোড় ছাত্রনেতা জাতীয়তাবাদের প্রাণ রাজপথের এক লড়াকু সৈনিক রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা তিনি আর কেহ নন তিনি হলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের এক বিপ্লবী সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার। সাংবাদিকতার সুবাধে তার সাথে আমার পরিচয়, সেই পরিচয়টি শেষ পর্যন্ত স্নেহ ভাজন ছোটো ভাইয়ে পরিণত। প্রায়শই তার সাথে কথাবার্তা হতো যদিও কখনো সরাসরি তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নাই তার কথা বার্তা ও আলাপ আলোচায় পর্যালচনায় সহজে বুঝতে পারি সে একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী ও রণাঙ্গনের যোদ্ধা। আমি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি ইছহাক সরকার চোর ডাকাত, সুবিধাবাদী চরিত্র কিংবা কোন অপরাধী নয়, শুধুমাত্র বিএনপি যাত্রীয়তাবাদের একজন নিবেদিত প্রাণ। এ ছাড়া আরো আরো জানতে পেরেছি আজ পর্যন্ত সে কারো কোন অনিষ্ট করেছে কিংবা অন্য সংগঠনের কাউকে অসম্মান করেছে এমন কোন অভিযোগ সারা ঢাকা শহর খুঁজলে একটিও হয়তো পাওয়া যাবে না। পাশপাশি জানা যায় সে একজন ধার্মিক ছাত্রনেতা।

তার পরও তার অপরাধ সে জাতীয়তায়বাদের সৈনিক এবং সৎ ও নিবেদিত প্রাণ, যার জন্য তার উপর ১৬৯ টি মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা। বিএনপির রাজনীতি করার অপরাধে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা কয়েক দিন আগে

তার ভাই ইয়াকুব সরকারকে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তখন তিনি নফল রোজারত ছিলেন। বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার মাঝারি কিংবা বড় মাপের নেতা কিংবা যে কাউকে বিনা অপারাধে গুম, খুন কিংবা ক্রসফায়ার হত্যা করা ও আদালতের রায়কে অমান্য করে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া, কেউ বলতে পারে না কাউকে ২দিন কাউকে আবার ৩ দিন পরে কোর্টে এনে হাজির করে। রিমান্ডের নামে অমানবিক নির্যাতন কি বৈধ? শুধু বাংলাদেশে আন্দোলনকারীদের জন্য কি আইন?

এই রণাঙ্গনের বীরের আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন লালবাগ জোনের পুলিশ কমিশনার আশ্রয় নেয় অবৈধ কূটকৌশলের। বংশাল থানায় বিএনপির কার্যালয়ে ঝুলিয়ে দেয় তালা। তবুও ইসহাক অন্যায়ের সাথে আপস করেনি একটু বিচলিত হয়নি।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় ইসহাক ও তার পরিবারের উপর চলেছে জালিম

ফ্যাসিস্ট সরকারের বর্বর নির্যাতন। তাদের বাসায় কখনও চলেছে গুলি, কখনও ফেলানো হয়েছে সাউন্ড গ্রেনেড, কখনও বাসায় তালা ঝুলিয়ে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে তার পরিবারের সদস্যদের। এখানেই শেষ নয় ইসহাকের মনোবল ভাঙতে তার হাতে গড়া মহানগর দক্ষিণের নয় জন ছাত্রদলের নেতাকর্মীকে গুম করা হয় ২০১৩ সালে। সবশেষ ইসহাকের গণতন্ত্রের মুক্তির যাত্রা রুখতে অবৈধ সরকার তার নাম নথিভুক্ত করে র‍্যাব এর ক্রসফায়ারের তালিকায়। এতসব নির্মম নির্যাতনের পরও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজপথে ছিলেন সোচ্চার ইসহাক সরকার।

মুক্তির জন্য তার দুই বোন ও স্ত্রী আকুতি জানিয়ে বলেন আমরা এতিম। আমার বাবা নাই। ইয়াকুব সরকার ও ইসহাক সরকার আমাদের বড় ভাই। এই দুই ভাইয়ে আমাদের গার্ডিয়ান। তারা একে একে আমাদের বড় দুই ভাইকেই ধরে নিয়ে গেল। বড় ভাই ইয়াকুব সরকার প্রিন্স কে ইসহাককে গ্রেফতার করার

পাঁচ দিন আগে। আমরা আমাদের ভাইকে একটু দেখতে চাই। সে কি অবস্থায় আছে? কোথায় আছে? আমাদের পরিবারের উপর তারা দীর্ঘ দিন ধরে অনেক নির্যাতন করে আসছে পুলিশের লোকেরা। আমরা এখন আমাদের নির্দোষ বড় ভাই ইসহাক সরকার ও নির্দোষ ইয়াকুব সরকারের মুক্তি চাই। " ইসহাক সরকারের ছোটো দুই বোন বলেন, "আমাদের ভাইকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তাকে নিয়ে আমাদের পরিবার আজ উদ্বিগ্ন।"

আর ইসহাক সরকারের স্ত্রী বলেন, "সাদা পোশাকধারী কিছু লোক এসে আমার স্বামীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। প্রথমে তার কোনো তথ্য জানতে পারিনি যদিও পরে আদালতে হাজির করে এখন রিমান্ডের পর রিমান্ড দিয়ে যাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "আমি আমার স্বামীকে একনজর দেখতে চাই।"

তিনি আরও বলেন, "সরকারের প্রতি আমার দাবি, আমার স্বামী যদি কোনো অন্যায় করে থাকেন তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক। অন্তত একবার আমার স্বামীকে আমার সামনে হাজির করা হোক।"

পরিশেষে আমি বলবো সরকারের যেন শুভ বুদ্ধির উদয় হউক এবং রণাঙ্গনের যোদ্ধা সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক তুখোড় ছাত্রনেতা ইসহাক সরকারকে যেন নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রকাশকাল : শনিবার, ১৫ জুলাই, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

প্রমাণিত হলো হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার "মা" খালেদা জিয়া

ধর্মের ঢোল আপনি বাজে, সত্য কখনো চাপা থাকে না। গণতন্ত্রের "মা" দেশনেত্রী খালেদা জিয়া যে হাসিনার প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তারই আজ্ঞাবহ আদালতের মিথ্যা ফরমায়েশি রায়ে ৭৩ বছরের একজন বৃদ্ধ মহিলা বিনা অপরাধে জেলে কাটছেন তার প্রমাণ আজ নিজে হাসিনা লন্ডন সফর কালে অকপটে বলে ফেলেছেন একটি ফোন আলাপ এখন ভাইরাল। হাসিনার কথা শুনে সারা বিশ্ববাসী অবাক, সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ফোনালাপে শেখ হাসিনা তার এক বিশেষ নেতাকে ফোন করে বলছে হোটেলে যেন নেতাকর্মীরা বেশি না আসে, দু-একজন আসলে আসতে পারে। হোটেল ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আর বিএনপিকে বলে দিবেন- তারেক রহমান যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তার মা কোনদিনও মুক্তি পাবে না। এ থেকেই বোঝা যায় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে কলকাঠি সরকার নাড়াচাড়া করছেন। প্রমাণিত হলো দেশ নেত্রী গণতন্ত্রের "মা" বেগম খালেদা জিয়া সহ জিয়া পরিবার হাসিনার ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার। একজন প্রধানমন্ত্রী যদি হোটেল ভাড়া পাবেন না কেন? তিনিতো ভিআইপি পার্সন হোটেল ভাড়া না পাওয়ার কারণ কী? এতেই প্রতীয়মান হয় জিয়া পরিবারের উপর জুলুম নির্যাতনের জন্য শুধু বাংলাদেশের জনগণ না বিশ্ববাসী হাসিনার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান। গুম-খুন, লুটপাট, আত্মসাৎ ও দখলের মহাসমারোহে গণতন্ত্রকে বন্দি করা হয়েছে।

বন্দি করা হয়েছে গণতন্ত্রস্বীকৃত বিরোধী দলের অধিকার, কথা বলা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে। সারাদেশ আজ বন্দিশালায় পরিণত হয়েছে। দুঃশাসনের বিষাক্ত বলয়ে বন্দি দেশবাসী। শেখ হাসিনার প্রতিহিংসার কোপানলে এক চরম নিষ্ঠুর অবিচারের শিকার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তার প্রতি চলছে ভয়াবহ এবং নজিরবিহীন অমানবিক আচরণ। দীর্ঘ তিনযুগ ধরে যিনি দেশে গণতন্ত্র আর সুশাসন কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করে আসছিলেন যিনি তার প্রতি বিরুদ্ধে কেন এ কোন ধরণের বিচার? খালেদা জিয়া তিনবারের নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারপার্সন। একটিবারের জন্যও ভাবা হয়নি তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরউত্তম ও মহান স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রী। একটিবারের জন্যও ভাবা হয়নি ৭৩ বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ মহিলা তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি স্বামীহারা সন্তান হারা, ২৯ বছরের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি হারা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কবলে পড়ে পরিবার পরিজন সন্তান স্বজনদের কাছ থেকে দূরে। তাঁর আপনজন দেশের জনগণ। এমন একজন নেত্রীকে জনমানবহীন এক নির্জন কারাগারে এক ভূতুড়ে পরিবেশে একটি স্যাঁতসেঁতে ভবনেই কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এই ভবনটি পরিত্যক্ত হবার কিছুদিন আগেও এই কারাগারে অনেকের ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। আর সেখানেই একাকী রাখা হয়েছে দেশনেত্রীকে। তিনি ছাড়া আর একজন বন্দিও সেখানে নেই। একজন নারী হিসেবে সামান্য মর্যাদাও কী তার প্রাপ্য ছিল না? এ কী নির্দয় ব্যবহার!

খালেদা জিয়ার প্রতি এই নির্মমতায় দেশের মানুষ আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। বাংলাদেশের হৃদয়ই যেন ভেঙ্গে গেছে। মানুষের অন্তর কেঁদে উঠছে। নাজিমউদ্দিন

রোডের পরিত্যক্ত কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আজ শুধু একজন ব্যক্তি খালেদা জিয়াকেই বন্দি করা হয়নি, বন্দি করা হয়েছে গণতন্ত্রকে। বন্দি করা হয়েছে মানুষের ভালোবাসাকে। বন্দি করা হয়েছে জাতির বিবেককে।

বরিশালে (৮ ফেব্রুয়ারি) এক জনসভায় দম্ভের সঙ্গেই উচ্চারণ করেন, "কাথায় আজ খালেদা জিয়া?"দেশপ্রেমিক সিরাজ সিকদারকে খুন করার পর চুয়াত্তর সালে সংসদে দাড়িয়ে শেখ মুজিব দম্ভ করে বলেছিল "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?" গণতন্ত্র হত্যাকারী পিতা শেখ মুজিবের মতো শেখ হাসিনা একইরকম দম্ভোক্তি করে বিকৃত সুখ অনুভব করে উল্লাসে মেতে উঠেছে।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার আগের দিন গুলশান কার্যালয়ে প্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলন করে জনগণের উদ্দেশ্য বলেছেন, 'আপনাদের খালেদা জিয়া কোনো অন্যায় করেনি। কোনো দুর্নীতি করেনি। ' বাংলাদেশের মানুষ তার এই কথা একশভাগ বিশ্বাস করেছে।

হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাটের বিচার হয় না অথচ মাত্র দুই কোটি টাকা নিয়ে এত হুলুস্থুল। শেখ হাসিনার নামে ১৫ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির পনের মামলা দলীয় বিচারপতিদের দিয়ে গায়েব করে ফেলা হয়েছে। তবে জনগণ সব জানে। খালেদা জিয়ার গগনচুম্বি জনপ্রিয়তায় নিদ্রাহীন হাসিনার অবিশ্বাস্য নির্মম জুলুমের শিকার বেগম খালেদা জিয়ার জন্য এখন প্রতিটি মানুষের প্রাণোৎসারিত সবটুকু সহানুভূতি, আবেগ, ভালোবাসা অকাতরে উপচে পড়ছে। কারাবন্দি খালেদা জিয়া হয়ে জনগণের প্রাণাধিক প্রিয়।

ইতোমধ্যে এক অভাবনীয়, অভুতপূর্ব জনপ্রিয়তার অনুসঙ্গে গণমানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন একজন মাতৃমূর্তিরূপি খালেদা জিয়া। দলের কর্মী সমর্থকই নয়, মানবতাবাদী গণতন্ত্রকামী মানুষের তিনি এখন 'মা'। মানুষের হৃদয়ে

এখন মায়ের আসন। 'মা' এখন কারারুদ্ধ। মা'য়ের অপমানে ডুকরে কাঁদছে বাংলাদেশ। কারাবন্দি 'মা' খালেদা জিয়ার শক্তি এখন অকল্পনীয়। অসামান্য অনন্য উজ্জ্বল মাতৃমূর্তিতে যেই উচ্চতায় বেগম জিয়া পৌঁছেছেন, অনেক রাজনীতিকের ভাগ্যেই এমন ভালোবাসা জোটে না।

প্রকাশকাল : শুক্রবার, ৩ মে, ২০১৯

শীর্ষ খবর ডটকম

শত্রু পক্ষের আতঙ্কের নাম তারেক রহমান, এক বক্তব্যে ঘুম হারাম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উত্তরসূরী তারেক রহমান। দলের দুঃসময়ে বিচক্ষন নের্তৃত্ব যে এ মুহূর্তে খুব জরুরি তা নেতা কর্মীরা ঠিকই অনুভব করছেন। তবে সিনিয়র নেতারা বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও তৃণমূল নেতা কর্মীরা বিএনপির উত্তরসূরি হিসেবে তারেক রহমানকেই বুকের মধ্যে লালন করেন। রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের জন্য তার আগমন জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু চলমান সঙ্কটে তিনির আগমন হয়তো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দেশের রাজনীতি দুটি ধারায় বিভক্ত। তারই ধারাবাহিকতায় বিএনপির পরবর্তী নেতা যে তারেক রহমান তা বলার অবকাশ রাখে না। তাই তো দলের তৃণমূল নেতা কর্মীদের নিয়ে তারেক রহমান রজনীতিতে একটি নতুন পরিবর্তন চেয়ে ছিলেন। এগিয়েও গিয়ে ছিলেন সমান তালে। বাবার নীতিকে বুকে নিয়ে তারেক রহমানও এগিয়ে গিয়ে ছিলেন অনেক দূরে। মা বেগম খালেদা জিয়ার সাথে থেকে রাজনীতির আমূল পরিবর্তন আনতে তার সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের আনাচেকানাচে। তার সক্রিয়তা এতই প্রকট ছিল যে তরুণদের মধ্যে একটি জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই দেশের পরবর্তী নেতা হিসেবে তাকে নিয়ে স্বপ্নও দেখে ছিলেন। অনেকে আতঙ্কিতও ছিলেন তারেক কে নিয়ে। আর এ আতঙ্কই হয়েছে তারেকের কাল। ঠিক যে ভাবে এগিয়েছিলেন। ১/১১ এর পর বিভিন্ন চক্রান্ত তাকে জনগণের সামনে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমান সময়ে এসে দেখা গেছে তার যতো মামলা সবই চাপা পড়ে আছে চক্রান্তেরেই জালে।

তারেক রহমান দেশের রাজনীতিতে আসলে অনেকের রাজনীতির পথ যে রুদ্ধ হয়ে যাবে তা টের পেয়েছে আওয়ামী লীগ। তাইতো অনেকদিন চুপ করে থাকা তারেক রহমানের নরাচড়া দেখে মাথা ঘুরেছে আওয়ামী লীগের। সম্প্রতি লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপির আঞ্চলিক শাখাগুলোর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আর সেখানে দলের নেতা কর্মীদের সাথে ঘরোয়া আলাপে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা দেখে সরকার দলের মধ্যে ভীতসঞ্চর হয়েছে। এত দিন তারেক রহমান কে নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথা ছিল না তাদের। বেশ কয়েকটি মামলা থাকলেও তা ছিল চাপা পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করে তারেক রহমানের দলে কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠায় আবার সেই মামলার হুমকি দিয়েছে সরকার দলীয় নেতারা। সরকার দলের এ হুমকিতে একটুও বিচলিত নন তারেক রহমান। তিনি তার দলের সকল নেতা-কর্মীকে সজাগ থাকার আহ্বান করেছেন। এ বিষয়ে তারেক রহমানের মন্তব্য-হুমকি দিয়ে সত্যকে আড়াল করা যায় না। দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিতে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করবেন তিনি। উল্লেখ্য, লন্ডনে যুক্তরাজ্য বিএনপির আঞ্চলিক শাখাগুলোর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তারেক রহমান বলেছেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিকরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। দেশে আজ গণতন্ত্র নেই, নেই আইনের শাসন, মানুষের সভা-সমাবেশের অধিকার নেই, নেই মানবাধিকার। তিনি বলেন, ১/১১-এর দুর্যোগে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা প্রমান করেছে দলকে ধরে রাখা যায়। বর্তমান সরকার দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশে যারা অবস্থান করছেন তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। দেশকে যারা ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে যারা ভালোবাসেন তারা কেউ বর্তমান এই পরিস্থিতিতে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। যারা বিএনপিকে ভালোবাসেন বা দলকে ভালোবাসেন, তারা শুধু নয়, দেশকে যারা ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে যারা ভালোবাসেন তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে দেশের প্রতি। তিনি বলেন, রাতের আধারে মতিঝিলে লাইট নিভিয়ে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সরকার এতগুলো লোক হত্যা করল। মতাদর্শে ভিন্নতা থাকতে পারে, তাই বলে এত গুলো মানুষকে এভাবে কেউ মেরে ফেলতে পারে না। এটা কোন সভ্য দেশে চলতে পারে না।

আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা যারা বলেন তাদেরকে বর্তমান এই পরিস্থিতি তুলে ধরার দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বসবাসকরী নেতাকর্মীদের। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ করে তারেক রহমানের সক্রিয় হওয়া ভালো চোখে দেখছেন না অনেকেই।

তবে বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রাণ ফিরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে। দলের এই ক্রান্তি লগ্নে তার সক্রিয় হওয়াকে পজিটিভ ভাবে নিচ্ছেন তারা।

এ মুহূর্তে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলো জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় যাবৎ আইনী লড়াই চালিয়েও কোন কর্তৃপক্ষ আদালতের কাছে দুর্নীতির প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় কোন কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক সন্দেহ পোষণ করেছেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ অনেকাংশেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল কিনা। রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে তৈরি এ চক্রান্ত যদি সত্যি হয় তবে চক্রান্তকারীরা সফল। এ মুহূর্তে তারেক রহমান অনেকের চেখের শূল। তবে আশার কথা হচ্ছে তারেক তার দলের নেতা কর্মীদের কাছে আজও সমান জনপ্রিয়। বর্তমানে রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও দলে তার অবস্থান আগের মতোই আছে। এখনও দলের কোনো বড় সিদ্ধান্ত তার কাছ থেকেই আসে। ১/১১-এর পরে কিছু নেতার সংস্কারপন্থী ভূমিকা তারই প্রমাণ। বর্তমানেও যে সেই চক্রান্তকারীরা দলের মধ্যে নেই তা বলা ভুল হবে। কারণ এখনও দলের কার্যালয়ে কি হয় তা মুহূর্তের মধ্যে বাইরে ছড়িয়ে যায়। কোনো গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্তও চলে যায় শত্রু পক্ষের কাছে। যদিও এর সত্যতা নিয়ে দল থেকে প্রতিবাদও করা হয়েছে। দল বিষটি মেনে নিতে নারাজ। তবে ঘটনা যে একেবারে অসত্য তা বলার অবকাশ নেই।

উইকিলিকস খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কিত নানান বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে অনেক আগেই। সেখান থেকে জানা যায়,

তারেক রহমান জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোটের বিজয়ী হওয়ার কৃতিত্ব তার। তাকে অনেকে বলে থাকেন দুর্নীতিবাজ, রাজনীতি ও ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ, অর্ধ শিক্ষিত ও দুর্বিনীত। আবার কেউ কেউ তাকে ডায়নামিক, স্মার্ট ও নতুন প্রজন্মের নেতা হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বিএনপির সিনিয়র পদে অভিষিক্ত হওয়ায় তার মা খালেদা জিয়া অধিকতর নিরাপদ অনুভব করেন। দলের অনেকেই মনে করেন তারেক জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব। তার সমৃদ্ধ অতীত আছে, আছে সৃজনশীল বর্তমান এবং সম্ভবনাময় এক ভবিষ্যত। তাকে নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনার সুযোগ তাই রয়েছে।

প্রকাশকাল : ১৮ মে ২০১৮

শীর্ষ খবর ডটকম

কারাবন্দি ‘মা’ খালেদা জিয়াকে দুই সন্তানের খোলা চিঠি

মননীয় তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন নেত্রী গণতন্নেরের প্রতীক ও দেশ মাতা “মা” বেগম খালেদা জিয়া, আসসালামু আলাইকুম, আপনি বাংলাদেশের একজন অসাধারন জনপ্রিয় নেত্রী, আপনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, তিন তিন বার আপনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। আজ পর্যন্ত আপনার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি, আপনি নির্বাচনে যে সংসদীয় আসনে নির্বাচন করেন সেখানে পাহাড় সমান ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন, একসাথে পাঁচটি আসনে দাঁড়ালেও নির্বাচিত হয়েছেন। আপনার জনপ্রিয়তায় ভাগ বসানো নেতা এখনো বাংলাদেশে জন্মায়নি। দীর্ঘ সময় আপনি ক্ষমতার বাহিরে থাকলেও আপনার জনপ্রিয়তার কোন ঘাটতি হয়নি।

আপনি চিকিৎসা শেষে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসলে আপনাকে বাংলাদেশের জনগণ যে স্বাগত জানিয়ে ছিল, তা রীতিমত বিস্ময়কর। আপনি যখন রোহিঙ্গাদের দেখতে কক্সবাজার সফরে বের হলেন তখন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ আপনাকে যে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছিল তা ইতিহাস হয়ে হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণ জিয়া পরিবারের প্রতি কি পরিমান ভালোবাসা তার কিছুটা দেখিয়েছে যেমন আপনার পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর নামাজে জানাজায়, সেদিন বিশ্ব দেখেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ, বায়তুল মোকারমের উত্তর গেইট থেকে নয়া পল্টন আর দক্ষিণ গেইট থেকে নবাবপুর পর্যন্ত লোকে ছিল

লোকারণ্য। আর আপনার স্বামী বাংলাদেশের রাখাল রাজা মহান স্বাধীনতার ঘোষক প্রয়াত শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যে নামাজে জানাজা মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন তিল ধারণ ক্ষমতা ছিল না। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে ইহাই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহত্তর জানাজা।

আপনাকে বাংলাদেশের জনতা আপসহীন নেত্রী, দেশ নেত্রী, লৌহমানবী বিশেষ বিশেষনে ডাকে তার কারণ হলো আপনি কঠিন নির্মম পরিস্থিতিতে ও ইস্পাতকঠিন দৃঢ় থাকতে পারেন যেমনি ছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আপনি যেকোন সিদ্বান্ত নিলে কেউ তা টলাতে পারেনা। এজন্য আপনার ব্যক্তিত্বকে সবাই শ্রদ্ধা করে। এই ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে আপনার মার্জিত কথা বলা, রুচিবোধ পোষাক আশাক আপনার লাইফ স্টাইল সর্বপরি আপনি বাংলাদেশের প্●থম রাষ্ট্রপতি, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনী। আপনার কোন নির্দেশ পেলে কোটি জনতা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়, জনগণ জানে দেশের স্বার্থে আপনি কখনো কোন হটকারী সিদ্বান্ত গ্রহণ করেন না। আপনার মধ্যে বিশেষ একটা গুন্ পরিলক্ষিত আপনি কখনো কোন হালকা কথা বলেন না, তাই বাংলাদেশের জনগণ আপনাকে আলাদা সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কেমন করে মানুষ স্বাধীন ভাবে ও নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে কি ভাবে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে তা আজ মানুষ ভুলে গেছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের জন্য আপনি আপসহীন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের আটারো কোটি জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সুষ্ট নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আপনাকে আবারো বসানো।

যদিও ভোটার বিহীন নির্বাচনে দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতের প্রত্যক্ষ মদদে ২০১৪ সালে ক্ষমতা দখল করার পর শুরু হয় আওয়ামী লীগ সরকারের মাইনাস ওয়ান খেলা। মাইনাস ওয়ান মানে আপনাকে রাজনীতি থেকে আউট করে দেওয়া। এই পর্যায়ে তারা আপনাকে কারাগারে ঢুকাতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দেশনেত্রী আপনাকে মুছে দিতে কতই না হিংস্র প্রয়াস চলছে। কিন্তু রাজনীতি করার, দেশটাকে বাঁচাবার, জাতিকে গণতন্ত্র দেবার ইচ্ছেটা কখনও আপনার মনবল মরেনি, মরবেও না। ৩৫ বছরের রাজনীতিতে তিন নম্বর স্বৈরশাসনকে গণজাগরণের মধ্য দিয়ে বিদায় দিতে আপনি দৃঢ়সংকল্প। আপনার আপসহীন সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

সম্প্রতি আপনাকে কে এশিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা হিসেবে আখ্যায়িত করে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির মোহাম্মদ বলেন ” সাউথ আফ্রিকার কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার যুগের পর যুগ

নির্বাসন এবং কারাবন্দি করে রাখায় তিনি যেভাবে বিশ্বনেতা হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ডের দেওয়ার কারণে তিনিও অচিরেই বিশ্বনেতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন।

ইতিহাসের এই আলোকিত সত্যকে, কে অস্বীকার করবেন? দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনি সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা নিয়ে বিরাজমান। সবচেয়ে বেশি আসনে নির্বাচিত হবার কৃতিত্ব আপনারই। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী আপনি। দেশবাসীর অকুণ্ঠ জনসমর্থন আর সহানুভূতি আপনাকে ঘিরেই আছে। আপনি রাস্তায় নামলেই লক্ষ মানুষের ঢল। তরুণেরা আপনার গাড়ি ঘিরে রাখে লৌহবেষ্টনী দিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতন। আপনার রাজনীতির শুরুই হয়েছে এরশাদের স্বৈরশাসনকে 'মানি না', এই ইস্পাত কঠিন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ এবং স্বৈরাচারী এরশাদের অশুভ আঁতাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নৈরাজ্য নীতিহীনতার ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে। তা থেকে বাঁচানোর একমাত্র উজ্জ্বল বাতিঘর আপনি।

আপনি বুক ভরা সাহসে লড়াইটা জনগণের পক্ষে একাই করেন। নব্বইয়ে তিন জোটের রূপরেখা থেকে আজ অব্দি সেই সৎ, নীতি-নিষ্ঠ রাজনীতি ধরে রেখেছেন আপনি। কেউ বলতে পারবেন না, আপনি বাংলাদেশের কোনো অবৈধ শাসনকে 'আই এম নট আনহ্যাপি' অথবা 'আমার আন্দোলনের ফসল' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরশাদ এবং মঈনউদ্দিন-ফখরুদ্দীনের স্বৈরতন্ত্রকে আপনি অনমনীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদায় করেছেন। বর্তমান দুনিয়ায় এমন কি কোন রাজনৈতিক নেতার কৃতিত্ব আছে দু'টি সামরিক শাসন হঠানোর? সেই কৃতিত্ব আপনারই আছে। লক্ষকুটি মানুষ কায়মনে সৃষ্টি কর্তার কাছে দোয়া করছে নফল রোজা রাখছে আপনারই জন্যে আপনার নেতৃত্বেই পতন হবে তৃতীয় ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসকের।

আপনার নেতৃত্বে গণমানুষের অনেক আন্দলোন সফল হয়েছে, আবার সুবিধাভোগী ও সুবিধা সন্ধানীদের জন্য তা বিফলও হয়েছে অনেক বার, কিন্তু মূল চিন্তা-ধারণা থেকে মুক্তিকামী স্বাধীনচেতা মানুষ সরে আসেনি। শত অন্যায়, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণমানুষের উত্থান দেখার জন্য সময় লাগতে পারে, তবে উত্থান অনিবার্য।

জাতি অবগত আপনি একটু আপোস করলে একটু নমনীয় ভাব দেখলে বোধ হয় এই বৃদ্ধ বয়সে জেলখানার প্রকোষ্টে থাকতে হতো না। কিন্তু আপনি আপোসের পথে যাননি। সংগ্রামের বন্ধুর পথ বেছে নিয়েছেন, কারণ আপনি দেশকে ভালো বসেন, জাতিকে ভালো বাসেন মানুষকে ভালো বাসেন আপনি চেয়েছেন জাতির মুক্তি দেশের মুক্তি মানুষের মুক্তি। এ সংগ্রামে ইনশাআল্লাহ আপনি আবারও জয়ী হবেন, দেশবাসীর এটাই দৃঢ় বিশ্বাস।

উল্লেখ্য যে কোন স্বাধীকার আন্দলোন সংগ্রামে রক্ত না ঝরালে আন্দলোন সফল হয় না। বাংলাদেশের মানুষ অতীতে ও ফ্যাসিটের শাসন মেনে নেয়নি আগামীতে ও মানবেনা জনগণ, এখন শুধু দেখার বিষয় একটি গণঅভ্যুত্থানের। সেদিন বেশি দূরে নয় অতি সন্নিকটে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ ও ছাত্রজনতা গণতন্ত্রের জন্য আবার জেগে উঠবে, আপনাকে মুক্ত করে ফ্যাসিস্টের কবর রচনা করবে, গণতন্ত্রের বিজয় নিশান উড়াবে, দেশনেত্রী আপনার ও দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবার নতুন সূর্য উঠবে মানুষ দেখবে আশার আলো ফিরে আসবে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের সরকার। মানুষ ফিরে পাবে বাঁচার অধিকার মানবতার অধিকার।

প্রকাশকাল : রবিবার, ১৩ মে, ২০১৮
প্রধান সম্পাদক ডাঃ আব্দুল আজিজ
ও উপদেষ্টা সম্পাদক সায়েক এম রহমান
শীর্ষ খবর ডটকম

একনজরে আপসহীন দেশনেত্রী ‘মা’ খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কিছু বিষয়ে খুবই কঠোর। যে কারণে তিনি আপসহীন উপাধি পেয়েছেন। তিনি কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন না। দেশ ও জনগণের কল্যাণে সবসময় লড়াই সংগ্রাম করেছেন। অতীতে তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখনো গণতন্ত্রের জন্য, দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়েই তিনি মিথ্যা মামলায় জেলে বন্দি। ছেলে হারিয়েছেন, বাড়ি হারিয়েছেন। এখন জীবনের বর্তমান ধাপে এসে তিনি অন্যায়ের কাছে মাথানত করবেন না। খালেদা জিয়া মানে ১৮ কোটি গণতন্ত্রকামী জনগনের আস্থার প্রতীক, খালেদা জিয়া মানে গণতন্ত্রের প্রতীক। খালেদা জিয়া কখনও ‘নিজের জন্য’ আপস করবেন না।

খালেদা জিয়া। বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির চেয়ারপারসন।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় পাঁচ বছরের দণ্ডিত হয়ে পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে জায়গা হয়েছে ৭৩ বছরের এ নারী রাজনীতিকের।

খালেদা জিয়ার জীবন ঘটনাবহুল। ব্যবসায়ী পিতার কন্যা সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনগুলোতে বন্দিজীবন কাটানো দুই সন্তানের মা খালেদা জিয়া দেশের সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিসেবে বর্ণাঢ্য জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

আবার স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হারিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু করতে না করতেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তেমন কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির হাল ধরেন তিনি।

রাজনীতিতে বেশ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন তিনি। চারবারের সংসদে পাঁচটি করে আসনে বিজয়ী হন তিনি। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনবার দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন।

একনজরে খালেদা জিয়া খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের জলপাইগুড়ি জন্মগ্রহণ করেন।

তার গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার ফুলগাজীতে। পিতা ব্যবসায়ী ইস্কান্দার মজুমদার ও মা তৈয়বা মজুমদার দিনাজপুরের চন্দবাড়ির মেয়ে। তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

খালেদা জিয়ার শৈশব ও কৈশোর পার করেছেন দিনাজপুরের মুদিপাড়া গ্রামে।

১৯৬০ সালে দিনাজপুর সরকারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ হন খালেদা খানম পুতুল। পরে তিনি দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে লেখাপড়া করেন। কলেজে পড়ার সময় তখনকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

১৯৬৫ সালে স্বামীর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে যান। ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত করাচিতে ছিলেন। এর পর ঢাকায় আসেন। কিছু দিন জয়দেবপুর থাকার পর জিয়াউর রহমানের পোস্টিং হলে চট্টগ্রামের ষোলশহর এলাকায় চলে যান।

জিয়াউর রহমান-খালেদা জিয়া দম্পতির দুই সন্তান তারেক রহমান পিনু আর প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকো।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি কিছু দিন আত্মগোপনে ছিলেন। পরে ১৬ মে নৌপথে ঢাকায় চলে আসেন। বড়বোন খুরশিদ জাহানের বাসায় ১৭ জুন পর্যন্ত ছিলেন। ২ জুলাই সিদ্ধেশ্বরীতে এস আব্দুল্লাহর বাসা থেকে পাকসেনারা তাকে

ও তার দুই ছেলেকে বন্দি করে। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি ছিলেন। ছোটো ছেলে কোকো ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়ার একটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। ১৯৮১ সালের ৩০ মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কিছু বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে নিহত হন।

স্বামী নিহত হওয়ার আগপর্যন্ত গৃহবধূই ছিলেন খালেদা জিয়া। দুই ছেলেকে লালন-পালন ও ঘরের কাজ নিয়েই সময় কাটাতেন।

জিয়াউর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট হলেও রাজনীতিতে তার উপস্থিতি ছিল না। পরে দলের নেতাকর্মীদের আহ্বানে বিএনপির হাল ধরেন তিনি। বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে একসময় তাকে রাজনীতিতে নামতে হয়েছে।

নীতি ও আদর্শে অটুট থাকায় তিনি আপসহীন নেত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। খালেদা জিয়া তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন হিসেবে তিনি একটানা ৩২ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮২ সালের ২ জানুয়ারি খালেদা জিয়া বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হিসেবে যোগ দেন। বছরখানেক যেতে না যেতেই নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় প্রশংসা অর্জন করেন।

পরের বছর মার্চে তিনি দলটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদোন্নতি পান। এক মাস পর ১ এপ্রিল তিনি দলের বর্ধিতসভায় প্রথম বক্তৃতা করেন।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অসুস্থ হলে তিনি ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন এবং একই বছরের ১০ মে চেয়ারপারসন পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

১৯৯৩ সালে ১ সেপ্টেম্বর দলের চতুর্থ কাউন্সিলে দ্বিতীয়বার, ২০০৯ সালের ৮ ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিলে তৃতীয়বার এবং ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ দলের দশম কাউন্সিলে চতুর্থবারের মতো বিএনপির চেয়ারপারসন হন।

বিএনপির দায়িত্ব নেওয়ার পরই নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়েন খালেদা জিয়া। দল ঐক্যবদ্ধ রেখে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে কোনো রকম সমঝোতা না করেই আপসহীন আন্দোলন করে গেছেন। ফলে এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে।

১৯৮৩ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সাত-দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। একই বছর সেপ্টেম্বরে জোটের মাধ্যমে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন।

১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ দফায় আন্দোলন চলতে থাকে। ওই বছর ২১ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাতেও এরশাদবিরোধী আন্দোলনে দমে যাননি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দল ভেঙে আট দল ও পাঁচ দল হয়ে যায়। ৮ দল নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সাত ও পাঁচ দল নতুন করে আন্দোলন শুরু করে।

১৯৮৭ সাল থেকে খালেদা জিয়া 'এরশাদ হটাও' এক দফার আন্দোলন শুরু করেন। একটানা নিরলস ও আপসহীন সংগ্রামের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিএনপি।

খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। এর পর ১৯৯৬ সালে ১৫

ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার ও ২০০১ সালে জোটগতভাবে নির্বাচন করে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন তিনি।

খালেদা জিয়া দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) দুবার চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনের ইতিহাসে খালেদা জিয়ার একটি অনন্য রেকর্ড হচ্ছে- পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে ২৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব কটিতেই তিনিই জয়ী হয়েছেন। সেনাসমর্থিত ওয়ান ইলেভেনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খালেদা জিয়াকে ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর তিনি আইনি লড়াই করে সব কটি মামলায় জামিন নিয়ে মুক্তি পান। কারাগারে থাকাকালে তাকে বিদেশে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ২০১০ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হন। খালেদা জিয়ার অভিযোগ, বলপ্রয়োগে তাকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তিনি ওই বাড়িটিতে ২৮ বছর ছিলেন। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার সেনানিবাসের বাড়িটি তার নামে বরাদ্দ দিয়েছিলেন।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালের ৩ মে, ১৯৮৭ সালের ১১ নভেম্বর তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন। ২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয়ে পরের বছর ১১ সেপ্টেম্বর তিনি হাইকোর্টের আদেশে মুক্তিপান।

শীর্ষ খবর ডটকম

নির্বাচন এখন নির্বাসনে

দেশের একটি সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে করা দেশ পরিচালনা করবেন তাহা নির্ধারণ করবেন নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন একটি কথা বলেন তাহা স্বাভাবিকভাবে গুরত্ব বহন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিগত নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা বলেছেন, কথা গুলা শুধু গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যই নয় ভিন্ন মাত্রার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উক্তি

ইভিএমের মাধ্যমে যদি ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তা হলে ভোটার আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করার সুযোগ খাবে না, রাতে ভোটার বাক্স ভর্তি করার জন্য করা দায়ী সেটা নির্বাচন কমিশনের বলার সুযোগ নাই বলে জানান সিইসি। কারা রাতে ভোটের বাক্স ভরে রাখার জন্য দায়ী তাদের কি করা যাবে সেই শিক্ষা দীক্ষা আমাদের কমিশনের নাই এবং কিছু বলার ও সুযোগ নেই, কি কারণে হচ্ছে এবং কারা দায়ী। তিনি আরো বলেছেন নির্বাচনের পরিবেশের দিন দিন অবনতি হচ্ছে। ভোটার তালিকা দিয়েও কাজ হচ্ছেনা, নির্বাচনের মত ছোটো বিষয়ে তিনি সেনাবাহিনী মোতায়েনের পক্ষে নন পৃথিবীর কোনদেশে জাতীয় নির্বাচনে সেনা মোতায়েন করা হয় প্রশ্ন করেছিলেন সিইসি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কথাগুলি বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়

১. নির্বাচন কমিশন অবগত ছিলেন যে আগের রাতে ব্যালটে সিলমেরে বাক্সভরে রাখা হয়েছিল।

২. যারা রাতে ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তিকরে রেখেছিলেন তাদের কিছু বলার নির্বাচন কমিশনের নেই।

৩. ইভিএম ব্যবহার করলে আর আগের রাতে ভোটের বাক্স ভর্তি করা যাবে না, জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগের রাতে ২৯ ডিসেম্বর রাট ১০ ঘটিকার পর থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল ভোটকেন্দ্রে ব্যালট পেপারে সীল মেরে বাক্সে ঢোকানো হচ্ছে তখন সেই অভিযোগ নির্বাচন কমিশন আমলে নেননি এখন নির্বাচন কমিশনার স্বীকার করছেন রাতে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করার কথা, তখন কেন তিনি কিছু করেনি বা বলেননি যারা রাতে ভোট দিয়েছে। যারা এসব করেছে তাদের কিছু বলার বা কিছু করার সুযোগ ও যোগ্যতা শিক্ষাদীক্ষা নির্বাচন কমিশনের নাই তিনি নিজে বলেছেন, কিন্তু সাধারণ জনগণ মনে করেন নির্বাচন কমিশন যাদের প্রয়োজন মনে করেন তাদেরকে নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেন, তাদেরকে শুধু নির্বাচনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা নয় তাদের বিরুদ্ধে যেকোন সময় যেকোন ব্যবসা নেওয়ার ক্ষমতা নেওয়ার সুযোগ নির্বাচন কমিশনারের আছে। বাংলাদেশের সংবিধান নির্বাচন কমিশন কে সেই ক্ষমতা দিয়েছে।

শিক্ষাদীক্ষা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নেই সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে সাধারণ জনগনের জানতে ইচ্ছা করবে নির্বাচন কমিশন যাদের নিয়োগ করেছেন তাদের বাহিরে অন্য কেহ বা কোন অদৃশ্য শক্তি রাতের অন্ধকারে ব্যালট বাক্স ভর্তি করছেন, নির্বাচন কমিশনকে অভিহিত না করে সরকার নির্বাচন কার্যক্রমে কাউকে সম্পৃক্ত করতে পারে না নির্বাচন কমিশন তেমন কোন অভযোগ করেন নাই, তা হলে সাধারণ জনগনের প্রশ্ন রাতের বেলা ব্যালট পেপারে সিল মেরে ভোটের বাক্স ভর্তি করার জন্য কাদেরকে নিয়োগ করলেন? নির্বাচন পরিচালনা করেছেন নির্বাচন কমিশন না অন্য কেউ?

ইভিএম : রাতের বেলা ভোটের বাক্স ভর্তিকারীদের যদি কিছুই না বলতে পারে তা হলে ভোটের জন্য ব্যবহৃত ইভিএম মেশিনগুলো কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে? সিল মেরে বাক্স ভর্তি করতে কিছু সময় ব্যয় হয় কিন্তু ইভিএম ভোট দিতে সময় বেশি লাগে না। যার ভোট তার স্মার্ট কার্ড বা আঙুলের চাপ ছাড়া ভোট দেওয়া যাবে না বলে যা বোঝানো হচ্ছে তা তথ্য হিসাবে সঠিক নয়। প্রিজাইটিং অফিসার ইচ্ছা করলে যে কারো ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে

পারবেন সে ভাবেই মেশিনের প্রগ্রাম সেট করা থেকে সাধারণত প্রিজাইটিং অফিসার ২৫ জনের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, এ প্রগ্রাম বাড়ানো প্রগ্রাম যারা সেটা করবেন সেটা তাদের কাজ।

সুতরাং ইভিএমের সমাধান এই বক্তব্যে মেনে নেওয়া যায় না। রাতে ভোটের বাক্স ভর্তির বিষয়ে এখন যা বলছেন সিইসি তা জাতীয় নির্বাচনের পর পড়ি সুনিদৃস্ট করে বলেছিলেন টি আই বি ৫০ টি কেন্দ্র মধ্যে তারা ৪৭ টি কেন্দ্রে অনিয়ম পেয়েছিলেন ৩৩ টিতে আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে রাখার প্রমান পেয়েছিলেন। টিআইবির প্রতিবেদন অনুযায়ী শতকরা ৬৬ ভাগ কেন্দ্রে রাতে সিল মারার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনকে নির্বাচন কমিশন বলেছিল এটা কোন গবেষণা নয় পূর্ব নিধারিত মনগড়া তথ্য দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে।

এখন সিইসির বর্তমান বক্তব্য ও টি আই বির প্রতিবেদনের মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সি ইসির বক্তব্য নিশ্চই মনগড়া নয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় না টিআইবির প্রতিবেদন সঠিক ছিল। ভোট শুরু হওয়ার আগে ব্যালট বাক্স ভর্তি ভিডিও চিত্র দেখিয়েছিল বিবিসি নির্বাচন কমিশন বিকাল ৩ ঘটিকার সময় ওই কেন্দ্র নির্বাচন বাতিল করেছিল, কারা সিল মেরে বাক্স ভিড়েছিল নির্বাচন কমিশন তা তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। খুলনার একটি সেন্টারে মোট ভোটারের চেয়ে প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা বেশি ছিল। রিট্রারিং অফিসারের তথ্য অনুযায়ী রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য অসত্য সংবাদ প্রকাশ করার দায় সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল আসলে সংবাদটি অসত্য ছিল না ডয়েচেভেলে সহ অন্যান্য গণমাধ্যম সংবাদ বিশ্লেষণ করে বিডি তথ্যচিত্র দেখিয়েছিল। বগুড়ায় কয়েকটি কেন্দ্রে শতভাগ ভোট কাস্ট হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এইসব ঘটনাগুলির তদন্ত নির্বাচন কমিশন করেছে এমন কোন তথ্য জানা যায়নি। এখন বিবিসি ভিডিও চিত্র ভোটের চেয়ে বেশি ভোটের ভিডিও চিত্র টি আই বির প্রতিবেদন ও সিইসির বক্তব্য আমলে নিয়ে রাতে ভোট দেওয়ার বিষয়টি তদন্তের ব্যবস্থা নিবেন প্রধান নির্বাচন কমিশন?

রাতে ব্যালটে সিল মারা বিষয় এখানে শেষ নয় বাসন নেতা জাসদ নেতা শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেছেন ভোটের আগের রাতে বোমা ভোটের মাধ্যমে বিলটি বাক্স ভরে রাখা সহ অনেক অনিয়ম সংগঠিত হয়েছে। রাশেদ খান মেনন বলেছেন উপজেলা নির্বাচনে এবার রাতে সিল মারা হবে না দিনের বেলায় সিল মেরে ভোট ডাকাতি হবে। নুরুল আম্বিয়া ও রাশেদ খান মহা

জোটেরই একটা অংশ দুজনের বক্তব্যে রাতের ভোট বা ব্যালট বাক্স ভরে রাখার তথ্য মিলেছে। বামজোট বলছে রাতের বেলা ভোট হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কি রাতের বেলা বাক্স ভর্তি করে রাখার বক্তব্যের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিবেন? যারা রাতের বেলা বাক্স ভর্তি করলেন তাদেরকে নির্বাচন কমিশন যখন যখন কিছু বলতে পারবেন না তখন নির্বাচন কমিশনার গণমাধ্যমের সামনে এসে তার অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে পারবেন কারা রাতে ভোট দিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানেন তিনি যদি বলেন কিছু বলার সুযোগ নেই বা ক্ষমতা নাই তা হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইতিহাস কি ভাবে মূল্যায়ন করবে। নির্বাচন সঠিক হয় নাই জেনে শুনে নির্বাচন বাতিলের বিষয় কিছু বলছেন না কেন? আপনাদের যে কাজ করার সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই কাজ বিষয়ে আপনারা অভিযোগের ভাষায় কথা বলেন কাজটি করবে কে? সুযোগ নেই ক্ষমতা নেই বললেই কি সাংবিধানিক পদে থকা যৌক্তিকতা থাকে?

এ দিগে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আশাবাদীরা আশা করেছিল বিশবিদ্যালয় প্রশাসন মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নির্বাচন পরিচালনা করবেন শিক্ষার্থীরা ভোট প্রদান করবেন, সেখানে শিক্ষকরা এমনকিছু করবেন না যার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের সম্মানহানি ঘটে শিক্ষকরা সেই আশ্বাস ও দিয়েছিলেন তাছাড়া ডাকসুর গৌরবময় ঐতিহ্য বলে সারা দেশের জাতীয় নির্বাচনের প্রতিফলন ডাকসু নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়নি, ২৮ বছর আগে ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল স্বৈরাচার এরশাদের আমলে সেই নির্বাচনে শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করেছিলেন শিক্ষার্থীরা বিনা বাধায় ভোট দিয়েছিলেন, স্বৈরাচার এরশাদের আমলে দেশে নির্বাচন বলতে কোন কিছু ছিল না কিন্তু ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছিল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের রাতের বেলা ভোটের বাক্স ভরার স্বীকার উক্তির পরও জনগণ আশা করেছিলেন ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠ হলেও হতে পারে বাস্তবে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে যা ঘটলো তার সংঙ্গে জড়িয়ে থাকলো শিক্ষকদের মানমর্যাদার প্রসঙ্গ। ১৮ মার্চের নির্বাচনের চিত্র দেখলে অনুমান হয় বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বর্তমান ভোট ব্যবস্থাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাংলাদেশে ওই রকম নির্বাচন কমিশনের হাতে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থাকলে নির্বাচন ঠিকই নির্বাসনে চলে যাবে।

প্রকাশকাল : ১৫ জুলাই ২০১৭
শীর্ষ খবর ডটকম

তারেক রহমানকে নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজির শেষ কোথায়?

লন্ডনে নির্বাসিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে নতুন করে সরকার রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজি শুরু করেছে। একের পর এক প্রপাগান্ডা দিয়ে কিভাবে তারেক রহমানকে বিতর্কিত করা যায় সেটাই মিডনাইট ভোটে নির্বাচিত সরকারের মূল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানের যুক্তরাজ্যে ব্যাংকে থাকা ৩টি হিসাব জব্দ (ফ্রিজ) করার আদেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত। বাংলাদেশের আদেশে লন্ডনের কোনো ব্যাংকে কারো অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে পারে না। এই ধরনের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের দেশের কোনো আদালতের নেই। তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো ক্ষমতা বর্তমান সরকার ও দুদকের নেই, ওয়ান ইলাভেনের পরে এবং তার পরবর্তী সরকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তন্নতন্ন করে দেখেছে বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের কোনো অর্থ সে দেশে আছে কিনা। তারা খোঁজ পায়নি। শেষ মুহূর্তে এসে যেহেতু বাজারে একটা গুঞ্জন চলছে যে, ডাঃ জোবায়দা রহমান হয়ত বাংলাদেশে আসবেন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন, এই গুঞ্জনের কারণে জোবায়দা রহমানকে এখানে ইমপ্লিকেট করা হয়েছে। এই কারণে তারা ভিন্ন পথে হাঁটছেন। এজন্যই তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এসব রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজি।

বাংলাদেশের উপর পরাশক্তি বিশেষ করে ইন্ডিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলা করতে মহান স্বাধীনতার ঘোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীরউত্তম) শহীদ প্রেসিডেন্ট

জিয়াউর রহমানের সুযোগ্য উত্তারিধাকারী তারেক রহমানের যে বিকল্প বাংলাদেশে নেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ। 'স্বাধীনতার মহান ঘোষক বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়ারউর রহমান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রী আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান বাংলা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতীক।

তরুণ প্রজন্মের অহংকার তারেক রহমান। 'সেনা সমর্থিত' মঈন-ফকরুদ্দীন এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ দেশপ্রেমিক নেতা তারেক রহমানকে ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ মইনুল সড়কের বাসা থেকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে যৌথবাহিনী। এরপর তার বিরুদ্ধে ১৩টি হাস্যকর মামলা করা হয়। বিভিন্ন মামলায় তাকে মোট নয়দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে অমানসিক নির্যাতন করে তারেক রহমানের কোমরের হাড় ভেঙে দেয় তৎকালীন স্বৈরশাসকরা। এরপর ২০০৮ সালের ৩১ জানুয়ারি তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ বছরের ১৯ জানুয়ারি নানি বেগম তৈয়বা মজুমদারের মৃত্যুতে তারেক রহমান মাত্র ৩ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পান। দীর্ঘ ১৮ মাস কারাবন্দি থাকার পর ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সব মামলায় জামিনে মুক্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যান। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে সপরিবারে অবস্থান করছেন।

বিএনপির তৃণমূলের প্রাণ পুরুষ তারেক রহমান দল ও দেশের জন্য এক অনন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করছিলেন তিনির যুগান্তকারি কর্মসুচি বিএনপির তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে গণ জাগরনের সৃষ্টি হয়েছিল নেতা কর্মিদের মধ্যে পিরে এসেছিল প্রাণ, তারেক রহমানের মাঝে খোঁজে পেয়েছিল তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বাংলাদেশের রাখাল রাজা শহীদ জিয়ার প্রতিচ্ছবি, আর সে কারণে ভীত হয়ে মঈন-ফখর গংরা ষড়যন্ত্র মূলকভাবে তাকে সেদিন গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আর দাবির মুখে তারা তাকে জেলে আটকে রাখতে পারেনি। আসলে কল্পিত দুর্নীতির অপপ্রচার চালিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতেই ঐ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসেছিল। কারাগারে যেভাবে তারেক রহমানের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে আর কোনো রাজনীতিকের ওপর এভাবে নির্যাতন করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা দেওয়া হয়েছিল। তবে একটি মামলাও কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। সব মামলাগুলো ছিল ভিত্তিহীন রাজ নৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনদিত যার একটি ও এখনো প্রমান করতে পারে নাই, 'শোনা গেছে, এর মধ্যে ১১টি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেছেন আদালত। রাখে আল্লাহ মারে কে। কারণ জিয়া পরিবারের উপর দেশবাসীর দোয়া ও আল্লাহের রহমত আছে।

মতলববাজ ফখরুদ্দীন মইনুদ্দিনের প্রস্তাবে রাজি হয়ে খালেদা জিয়া যদি তখন শেখ হাসিনার মতো দেশ ত্যাগ করতেন তখন তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমান কে গ্রেফতার হতে হতো না। মইনের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে সেটা এখন সবাই জেনেছে। বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের ধারাবাহিকতায় এখনও জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার অব্যাহত রয়েছে। অতীতের মত বর্তমান সরকারও তারেক রহমানকে টার্গেট করেছে। কারণ তারেক রহমান বাংলাদেশের গণমানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় নাম। বাবার মতোই তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শুনেছেন, সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। জনগণের সঙ্গে তারেক রহমানের সখ্যই আওয়ামী লীগ এখন মেনে নিতে পারছে না। তারেক রহমানকে শেষ করতে পারলে কিংবা জিয়া পরিবারকে বিতর্কিত করতে পারলেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া যায়। এ কারণেই জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে চালানো হচ্ছে সুপরিকল্পিত অপপ্রচার।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে চলছে দর্শনের মহামারী অহরহ চলছে খুন গুম ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস মানুষ আজ সন্ত্রাস, দর্শন, খুন, গুম থেকে বাঁচতে চায়, বিদ্যুত চায়, পেট ভরে খেতে চায় কিন্তু বাকশালী সরকার শুধু জিয়া পরিবারের কুৎসা করেই সময় কাটাচ্ছেন কোথাও কোন উন্নয়ন নেই, মানুষের কাজ নেই, বেঁচে থাকার অবলম্বনটুকু কেড়ে নেয় সন্ত্রাসীরা। নাভিশ্বাস উঠেছে এই সরকারের প্রতি, তাই দেশের মানুষ আজ ফ্যাসিস্ট বাকশালী স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেতে চায়।

ডিজিটাল নামক ফ্যাসিস্ট বাকশালী স্বৈরশাহীর আতঙ্ক তারেক রহমান, এই সরকার ভালো করেই জানে, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মানেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইন্তেকাল। এ কারণেই আওয়ামী লীগ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মরিয়া। তবে আমরা আশা করি তরুণ প্রজন্মের অহংকার এই তরুণ রাজনীতিবীদ তাড়াতাড়ি সুস্থ্য হয়েই দেশে ফিরবেন তার রাজনীতিতে আবারও সরব উপস্থিতির অপেক্ষায় বাংলাদেশ। তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন বেগম খালেদা জিয়ার পরে বাংলাদেশের মাটিতে তিনিই হবেন বিএনপির কর্নধার।

আগামী দিনের তারেক রহমান হবেন চৌকস রাজনৈতিক প্রশাসন সমন্বয়ে এক সমন্বিত সফল প্রতিষ্ঠান, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তারেক রহমান ফিরে আসবেন। বাকশালী নিকৃষ্ট শাসনে, নিপীড়নে জনজীবন, দেশের সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। কালো রাতের মাঝ প্রহর পেরিয়ে যাচ্ছে তার সাথে সাথে গোটা বাংলাদেশ প্রতিটা দিন গুনছে নতুন দিনের আশায়। কালো রাতের প্রহর শেষে অবশ্যই আসবে নতুন ভোর, আসবে সোনালি সূর্যোদয়। ফিরে আসবেন তারেক রহমান। সেই নবপ্রভাতের নতুন আলো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে সারা দেশবাসী। দেশের মানুষ আবার বিএনপি কে ভোট দিবেন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসাবেন। তখন তারেক রহমান ই হবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রকাশকাল : সোমবার, ২২ এপ্রিল, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

জনগনের নেত্রী তাই জনগণ কাঁদে খালেদা জিয়ার জন্য

খালেদা জিয়া পেশাগতভাবে কিংবা পারিবারিকভাবে রাজনীতিতে আসেননি। তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন গৃহবধূ। স্বামী হত্যার পর দেশের টানে দলের প্রয়োজনে অবস্থার চাপে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। রাজনীতিতে যোগদান করেই তিনি রাজপথ দখলে নিয়ে নিয়েছেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেছেন। হুমকি-ধামকি, লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি নিজেকে আপসহীন নেত্রী হিসেবে প্রমাণ করেছেন। স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিন জোটের আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলে আপসহীন নেত্রীতে পরিণত হন খালেদা জিয়া। দেশবাসী তার নাম দিয়েছেন আপসহীন দেশনেত্রী।

'৯১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম নির্বাচনেই দল যেমন সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়, তেমনি তিনি নিজে ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। ৫টি আসনে জয়লাভ করে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি সত্যিকার অর্থেই দেশনেত্রী। ঢাকার বাইরে ৪টি এবং ঢাকায় ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব কয়টি আসনে তিনি জয়লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিয়ে শেখ মুজিবের কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুই অখ্যাত লোকের কাছে হেরে যান। তারপর শেখ হাসিনা আর কোনোদিন ঢাকায় নির্বাচন করেননি। আওয়ামী লীগের মতো একটা পুরানো বড় দলের সভানেত্রী হয়ে রাজধানীতে তার একটা নির্বাচনী আসন নেই এটা মানায় না। খালেদা জিয়া বাংলাদেশের যেখানেই দাঁড়ান সেখানেই তিনি পাস করেন। অতএব, তার জনপ্রিয়তা হ্রাস করতে হবে। আর সেজন্যই তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা। যেন দুর্নীতিবাজ খালেদা জিয়াকে মানুষ ভোট না দেয়। ইতোমধ্যে 'খালেদা জিয়াকে ভোট দিবেন না' শিরোনামে পোস্টার দিয়ে

ঢাকা শহর ছেয়ে ফেলা হয়েছে। খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেকগুন বেড়ে গেছে তাই তিনি দেশনেত্রী থেকে এখন 'মা'।

এই অবস্থায়ও বেগম খালেদা জিয়া লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে কোর্টে উপস্থিত হন। মামলার রায় ঘোষণার পর শুধু আদালত চত্বরে নয় সারাদেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়। ঢাকা মহানগরে যেন এক নিস্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করছিল। অনেককে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে দেখা যায় ও হাজারো মানুষকে নফল রোজা রাখতে শোনা যায়। খালেদা জিয়ার সাজার খবর সেদিন শুধু 'টক অব দি কান্ট্রি' নয় টক অফ দি ওয়ার্ল্ড' ছিল। বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা আল জাজিরাসহ বিশ্বের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি মাত্র শীর্ষ সংবাদ ছিল, তা ছিল খালেদা জিয়ার সাজা। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা হাহুতাশ ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দলের সকল পর্যায়ে দ্বন্দ্ব কোন্দল ভুলে এক রকম ইস্পাতকঠিন ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই যে কর্মসূচি দেওয়া হয় জনতার ঢল নামে। সর্বত্র যেন এক বাঁধভাঙা জোয়ার সৃষ্টি হলো। '৭১ সালে ২৫ মার্চ পাক সেনাবাহিনীর ক্রাকডাউনের পর নেতৃত্বহীন স্তম্ভিত মানুষের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি ৮ ফেব্রুয়ারির পর সারা বাংলার মানুষের মধ্যে একটা অঘোষিত ঐক্য সৃষ্টি হলো। মুখে মুখে স্লোগান উঠেছে 'আমার নেত্রী আমার মা বন্দি থাকতে দেব না।'

পথেঘাটে, রাস্তায়, চায়ের দোকানে, বাসে লঞ্চে, স্টিমারে আড্ডায় সব জায়গায় সকলের মুখে একই কথা ছিল খালেদা জিয়ার মুক্তি। মিডিয়ায়ও সকল সংবাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো খালেদা জিয়া। সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও লেখা হয়েছে খালেদা জিয়াকে নিয়ে। অর্থাৎ সকলের মুখে ছিল একই বুলি খালেদা জিয়া। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পত্র-পত্রিকায় টিভিতে বাংলাদেশ সংক্রান্ত সংবাদই ছিল খালেদা জিয়া সংক্রান্ত। খালেদা জিয়া ছিলেন 'টক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ' ভারতের তামিলনাড়ুর জনপ্রিয় নেত্রী জয় ললিতাকে ঐ প্রদেশের লোকেরা আম্মা বলে ডাকত, বাংলাদেশে জনপ্রিয়তার কারণে খালেদা জিয়া হয়েছিলেন দেশনেত্রী, কারারুদ্ধ হওয়ার পর আবেগাপ্লুত জনতা এখন খালেদা জিয়াকে মা ডাকতে শুরু করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 'মা'খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা এখন সর্বোচ্চ মাত্রায়।

প্রমাণ হলো বন্দি খালেদা জিয়া মুক্ত খালেদা জিয়ার চেয়ে অনেক অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনকণ্ঠ ভারতীয় কতিপয় পত্রিকা ছাড়া সারা পৃথিবীতে সকল মিডিয়ায় খালেদা জিয়া ছিলেন শীর্ষ সংবাদ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ প্রভাবশালী দেশসমূহ খালেদা জিয়ার মামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ন্যায় বিচারের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশে বিএনপি ছাড়াও সরকারের বাইরে সব দলই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অরাজনৈতিক সুশীল সমাজও বিচারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। অর্থাৎ জিয়া অরফানেজ মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রতিহিংসা থেকে খালেদা জিয়াকে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখার জন্যই করা হয়েছে, এই নিয়ে প্রায় সকল মহলই একমত। তার প্রতি যে ন্যায় বিচার করা হয়নি এ ব্যাপারেও প্রায় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে।

জনতার বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মধ্যে আওয়ামী লীগের কণ্ঠ হারিয়ে যাচ্ছে। হতাশার অন্ধকারে আওয়ামী লীগ নিমজ্জিত হয়ে গেছে। সরকার ভেবেছিল রায় ঘোষণার সাথে সাথে বিএনপি কর্মীরা ভাঙচুর শুরু করবে আর সেই সুযোগে সরকার আবার নাশকতার অজুহাতে হাজার হাজার কর্মী খুন ও গ্রেফতার করে দেশে একটা তাণ্ডবলীলা ঘটাবে। খালেদা জিয়ার অবর্তমানে গড়ে ওঠা যৌথ নেতৃত্ব দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে এবং অহিংস নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণ নেতাদের নিয়ে যৌথ নেতৃত্ব সরকারের ফাঁদে পা দেয়নি।

ফলে বিএনপির উপর ক্র্যাকডাউন ঘোষণা করার সরকারি চক্রান্ত ভেস্তে গেছে। কোথায় এখন খালেদা জিয়া এমন উষ্মা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা

জিয়ার কারাবাস নিয়ে কোন কথা বলতে নেতাদের বারণ করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের কারণে পুলিশ বাধা দিচ্ছে না।

খালেদা জিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি মামলার রায়ের পূর্বে ছিলেন দেশের একচ্ছত্র নেত্রী, তাই জনগণ কেঁদে ছিল খালেদা জিয়ার জন্য। বাচাল নয়, স্বল্পভাষী যোগ্য নেত্রী বলে বিশ্বব্যাপী তার সুনাম বিরাজমান। ৮ ফেব্রুয়ারির পর তিনি হয়ে গেলেন দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত 'মা'। বিশ্ববাসী জানে, গণতন্ত্রহীন এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করছেন। তিনি লড়াই করছেন তিনি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য, তিনি সরকারের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। মানবাধিকারের প্রবক্তা।

সরকারের পরিকল্পনা ছিল খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে আরেকটি একদলীয় ভোটারবিহীন নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার করা, বাংলার ঘরে ঘরে একটা কথা আছে, প্রতি ডুবে শালুক পাওয়া যায় না। খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন। ইতিহাসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আব্রাহাম লিংকন মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ। বাংলা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছেন বাংলাদেশি কোটি কোটি জনতার মা বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে বিশ্ববাসী এখন আরও সোচ্চার। গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কারও পেতে পারেন তিনি। চতুর্থবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদও তার ললাটে জুটতে পারে। নদীর স্রোত যেমন প্রবাহমান, নদীর স্রোত কোনো বাধা মানে না, ইতিহাসের

গতিও তেমনি প্রবাহমান। ইতিহাসের গতিও কোনো বাধা মানে না, ইতিহাসই তার সাক্ষী। খালেদা জিয়া ইতিহাসের স্নেহ কন্যা। ইতিহাসই নির্ধারণ করবে তার ভবিষ্যৎ। তবে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না এটা ইতিহাসেরই শিক্ষা। ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। এটাও ইতিহাসের শিক্ষা। ইতিহাসের গতিরোধকারী স্বৈরশাসকরা ইতিহাসের গতিতে খড় কুটার মতো ভেসে যায়। এটাও ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম।

প্রকাশকাল : বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

সরকারি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনুমতি লাগে না, বিএনপির জন্য লাগবে কেন?

রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক অনুশীলন যথা- জনসভা, বিক্ষোভ, পথসভা, মানববন্ধন, এমনকি পার্টি অফিসের সামনে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলেও নোংরা গরম পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় পুরুষ বা মহিলা নেতাকর্মীদের। সাদা পোশাকধারীরা নেতাদের ধরে আনে পার্টি অফিসের ভেতর থেকে। কেন এসব করা হচ্ছে? এর উত্তর, পুলিশের অনুমতি ছাড়া রাজনৈতিক দল কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারবে না। তবে এ আইন সরকারি দলের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং কঠোরভাবে বিরোধী দলের জন্য প্রযোজ্য। স্বীকৃতভাবেই এ দেশে আইন দু'ভাগে প্রয়োগ হয়। সরকারি দলের জন্য আইন একভাবে এবং একই আইন একই বিরোধী দলের জন্য প্রয়োগ হয় ভিন্ন ও কঠোরভাবে। এ দেশে আইন প্রয়োগকারীরা বিরোধী দলের কর্মসূচিতে গ্রেফতার, লাঠিপেটা, গরম পানি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। অন্য দিকে, একই কর্মসূচির জন্য সরকারি দলকে পুলিশ পাহারায় দেওয়া হচ্ছে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে।

পুলিশ এটা প্রমাণ করেছে, ন্যায়-অন্যায় যা-ই হোক না কেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালন করাই তাদের চাকরির মূল শর্ত। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মনে করে, নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার যা-ই হোক না কেন, যাদের হাতে ঊর্ধ্বতনদের প্রমোশন ও লোভনীয় পদে পোস্টিং; তাদের খুশি রাখাই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে তারা ডান-বাম চিন্তা করেন না। নৈতিকতা

বোধ, আর্দশিক কোনো চিন্তাধারা বা একজন স্বাধীন দেশের নাগরিকের সাথে পরাধীন নাগরিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের দাস-দাসীদের মতো ব্যবহার করার সময় তাদের মনমানসিকতা ও বিবেক একটুও নাড়া দেয় না, বরং কী করলে প্রমোশন ও লোভনীয় পোস্টিং (অর্থাৎ যে পোস্টিংয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়) সেদিকেই জনগণের অর্থে লালিত পুলিশসহ সব রাষ্ট্রীয় বেতনভুক্ত কর্মকর্তার মনোযোগ বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটরা এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারা বলেন, ওপরের চাপে (ম্যাজিস্ট্রেটদের) বিচারিক সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হন। অথচ সাংধানিকভাবে বিচারিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা 'স্বাধীন'।

বিএনপি নেতারা অনেক দিন থেকেই অভিযোগ করে আসছেন, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অধিক মাত্রায় সংকুচিত করা হচ্ছে। রাজপথে তাদের কর্মসূচিতে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। নূন্যতম নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারছে না তারা। তবে সরকার বিষয়টি বরাবরই অস্বীকার করে আসছে এবং বিএনপির অতীত কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে আন্দোলন সংগ্রাম বিষয়ে কোনও প্রকার ছাড় না দেওয়ার কৌশল নিয়েছে।

বিএনপি বর্তমানে কেমন আছে? বিষয়টি নিয়ে দেশের প্রথম সারির একটি গণমাধ্যম তাদের বিশ্লেষণে বলেছে, বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও বিএনপি এখনো সেই 'জরুরি অবস্থার' মধ্যেই আটকে আছে। মামলা হামলা আর গ্রেফতার দলটির নেতাকর্মীদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সাদা চোখে দেখলে বিএনপির নামক দলটির জন্য সাংবাধানিক নাগরিক অধিকার এবং গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সুবিধা অন্যদের তুলনায় অনেকটাই সংকুচিত বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা যেদিন জেলে যান দেশজুড়ে সেদিন টানটান একটা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সবার চোখ ছিল সেই ঘটনা প্রবাহে আর আশংকা ছিল সহিংস কোনও ঘটনার। কিন্তু সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রায় নিঃশব্দেই ঘটে গেল পরবর্তী সব ঘটনা। দেশবাসী অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করলো নতুন এক বিএনপিকে। বিএনপি ঘোষণা দিল অহিংস আন্দোলনের। গান্ধীবাদী এই আন্দোলনের কথা বিএনপি যে শুধু মুখে বললো তা-ই নয়, বিচ্ছিন্ন কিছু কর্মকাণ্ড ছাড়া তারা তাদের কর্মসূচিতেও তার সাক্ষর রাখছে বলতে হবে।

সরকারি দলের পক্ষ থেকে যদিও বলা হচ্ছে কঠোর কর্মসূচির মুরোদ নেই বলেই অহিংস আন্দোলনের পথে হাঁটছে তারা। কিন্তু বিএনপির বর্তমান কর্মসূচি যে দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম আর আস্থা কুড়িয়েছে তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এতকিছুর পরও রাজপথে কর্মসূচির জন্য যথেষ্ট স্পেস দেওয়া হচ্ছে না দলটিকে, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। বিএনপি

পুলিশের প্রধান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতকালই সাংবাদিকদের বলেছেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জনসভার অনুমতি দেবে পুলিশ, তার এই বক্তব্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে, দেশ চালাচ্ছে পুলিশ। দেশে খুনখারাবি বেড়ে যাওয়ায় জনমনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও খুনের ঘটনা ঘটছে। আর পুলিশ বাহিনী প্রতিনিয়ত ব্যস্ত বিরোধীদের দমনে। আওয়ামী লীগ ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে বলেই দেশটা এখন পুলিশের কব্জায়।

চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ডাকা বৃহস্পতিবারের পুলিশের অনুমতি না পেয়ে সমাবেশ স্থগিত করেছে দলটি। বিগত ২৪ মার্চ গণতন্ত্র হত্যার দিনে সরকার প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় পার্টিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। বিএনপিকে না দেওয়ার ঘটনায় গণতন্ত্রকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হলো। এছাড়াও সম্প্রতি আওয়ামী জোটের ছোটো ছোটো আরো অনেক দলকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিএনপিকে দেওয়া হবে না কেন? তাহলে জনগণের প্রশ্ন বিএনপিকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ রাজনৈতিকদল?

পাঠক কান্না ও মায়াকান্নার তফাৎ মানুষ বোঝে। সমাজে বাহবা পাওয়ার জন্য অনেকেই অনেক কথা বলে, যা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু কার্যকর না হলে বক্তার প্রতি অবিশ্বাস বেড়ে যায়। রাজনৈতিক চর্চা করায় সাংবিধানিক অধিকার যখন আইনি দোহাই দিয়ে পুলিশ ক্ষুণ্ন করে, তখন প্রতীয়মান হয় সরকার সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য শাসন করছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের জন্য যেখানে সাংবিধানিক অনুমতি লাগবে কেন? সরকারি দলের কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তো পুলিশের অনুমতি লাগে না, তবে বিরোধী দলের জন্য তা লাগবে কেন? এসব প্রশ্ন জনমনে নিয়মিত দোল খাচ্ছে। এই বছর স্বৈরতান্ত্রিক দেশের তালিকায় ঢুকেছে নতুন করে পাঁচটি দেশ। নতুন যোগ হওয়া বিশ্বের ৫ স্বৈরতান্ত্রিক দেশের এক দেশ বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল : বুধবার, ২৮ মার্চ, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বাস্তবে কতটা দৃশ্যমান?

নির্বাচন হচ্ছে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক খেলা, যেখানে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে রেফারিং করতে হয়। খেলোয়াড়টি যত শক্তিশালী, অর্থাৎ তার গায়ে যে দলের জার্সিই থাকুক না কেন, ফাউল করলে তাকে হলুদ এবং প্রয়োজনে লাল কার্ড দেখানো রেফারির (নির্বাচন কমিশন) দায়িত্ব। যদি রেফারি এই দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালনে ব্যর্থ হন, তখন খেলায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা সবার জন্য সমান সুযোগ থাকে না। সবার জন্য সমান সুযোগ না থাকার অর্থই হলো বিশেষ কেউ সুবিধা পাচ্ছে। বিশেষ কারো সুবিধা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা তথা ব্যক্তি ও দল নির্বিশেষে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিতে গণমাধ্যমেরও একটি বড় দায়িত্ব আছে। কেননা, কোন প্রার্থী কোথায় কীভাবে অন্যের সুযোগ নষ্ট করছেন বা ফাউল করছেন, সেটি গণমাধ্যমের ক্যামেরাই প্রথম ধরা পড়ে। কিন্তু গণমাধ্যম সেই ছবি কতটা দেখাতে পারছে–তার ওপরেই মূলত নির্ভর করে খেলাটি কতটা উপভোগ্য হবে কিংবা কতটা একপেশে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন দশক ধরে নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে চলমান রাজনৈতিক মতবিরোধ। এর উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে যদি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। সারা

বিশ্বের গণতন্ত্রমনা মানুষ অধীর আগ্রহে বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে চেয়ে আছে। এ নির্বাচন কলঙ্কিত হলে শুধু দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১৫ কোটি মানুষ। আমাদের দেশে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ইতিহাস তিক্ত। কারণ যারাই ক্ষমতায় থেকে নির্বাচনের আয়োজন করেছেন, তারাই জনগণের ভোটের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছেন। হ্যাঁ-না ভোটের কথা আজকের তরুণ প্রজন্ম না জানলেও 'গায়েবি' ভোটের কথিত নির্বাচন দেখেছে।

নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে দেশবাসীর মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর শঙ্কা ততই বাড়ছে। জনমনে সংশয়- নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ হবে তো? সবাই নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যেতে পারবে তো? নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে তো? সর্বোপতি একাদশ জাতীয় নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বাস্তবে কতটা দৃশ্যমান হবে তা নিয়েই এখন টানাপোড়েন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে।

তবে তফসিল ঘোষণার পর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনও যে নিশ্চিত হয়নি তা স্পষ্ট। তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আওতায় সব কিছু চলে আসে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাও তাদেরই দায়িত্ব। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্বাচনী মাঠে সমান সুযোগের জোর দাবি থাকলেও এ বিষয়ে এখনও মুখে কুলুপ এঁটে নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভার অবস্থানে নির্বাচন কমিশন (ইসি)!

তফসিল ঘোষণার পর থেকে সব দলের জন্য সমান সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দেয় ইসি। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন উত্তোলন ও জমা দেওয়ার সময় কর্মীদের মিছিল-সমাবেশসহ নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে সরকার সমর্থিত রাজনৈতিক দলগুলো। অন্য দিকে নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি পুলিশি তল্লাশি ও গ্রেফতারসহ নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

বিগত ৮ নভেম্বর তফসিলের দিন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদা বলেন, 'ভোটার, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, প্রার্থী, প্রার্থীর সমর্থক ও এজেন্ট যেন বিনা কারণে হয়রানির শিকার না হন বা মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন না হন তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর কঠোর নির্দেশ থাকবে।'

তিনি বলেন, 'দলমত নির্বিশেষে সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদে সবাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ভোট শেষে নিজ

নিজ বাসস্থানে নিরাপদে অবস্থান করতে পারবেন। নির্বাচনী প্রচারণায় সব প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল সমান সুযোগ পাবে। সবার জন্য অভিন্ন আচরণ ও সমান সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করা হবে।'

কিন্তু সিইসি 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করার কথা বললেও তফসিল ঘোষণার পরও তার কার্যকর কোনও ব্যবস্থা এখনও চোখে পড়ছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তফসিল ঘোষণার পরও অব্যাহত রয়েছে বিরোধী দলগুলোর ওপর বিশেষত বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের গ্রেফতার অভিযান। বিএনপিসহ সরকারবিরোধী নেতাকর্মী সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মামলায় অনেককেই এখনও গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। এতে সারা দেশে বিরোধীদলের নেতাকর্মী এবং ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা নিরবিঘ্নে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করার বিষয়টি ভোটের আগেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

তফসিল ঘোষণার পর বিএনপির ৪৭২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে দলটি। এছাড়া বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়া 'গায়েবি মামলা' প্রত্যাহারসহ গ্রেফতার নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তফসিল ঘোষণার পর গত ৯ নভেম্বর থেকে দলীয় প্রার্থীদের কাছে মনোনয়ন ফরম বিক্রি করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে (৩/এ) এই কার্যক্রম চলে। মনোনয়নপত্র ক্রয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কার্যালয় ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। সকাল থেকেই শোডাউন করতে করতে আসেন মনোনয়ন কিনতে আসা নেতাকর্মীরা।

দলে দলে মিছিল নিয়ে আসেন ধানমন্ডিমুখী মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। ব্যানার-ফেস্টুনসহ নানা বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তাদের বহরে। ভিড় সামলাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বেগ পেতে হয়। ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের সমাগমে পুরো ধানমন্ডিতে দেখা দেয় যানজট। এর মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের মতো ঘটনাও ঘটে। এরপরও পুলিশ অথবা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে গত ১২ নভেম্বর থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু করে বিএনপি। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ উপলক্ষে নেতাকর্মীদের ব্যাপক সমাগমে সারা দিন জনসমুদ্রে পরিণত হয় রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকা। সকাল থেকেই ব্যানার-ফেস্টুনসহ মিছিল নিয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসতে থাকেন। অনেকে ব্যান্ড পার্টি, হাতি ও ঘোড়াও সাথে আনেন।

গত ১৪ নভেম্বর বুধবার হঠাৎ করে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের তৎপর বেড়ে যায়। সকাল থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতাকর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল। পুলিশ আশপাশের রাস্তায় তাদের দাঁড়াতে দিচ্ছিল না। মনোনয়ন ফরম বিক্রির কার্যক্রমের এক পর্যায়ে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে দলটির নেতাকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বেলা ১টা থেকে পরবর্তী এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আহত হন পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এ ঘটনায় তিনটি মামলায় বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে আওয়ামী লীগ উৎসবমুখর পরিবেশে মিছিলে শোডাউন নিয়ে মনোনয়নপত্র দেওয়া-নেওয়া করলেও মাথা ব্যথা ছিল না ইসির। কিন্তু বিএনপির মনোনয়ন বিক্রি শুরু হলে হঠাৎ নড়েচড়ে বসে কমিশন। ১২ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মিছিলে, শোভাযাত্রা ও মহড়া বন্ধের ব্যবস্থা নিতে চিঠি দেয় ইসি। আচরণবিধি প্রতিপালনে ব্যবস্থা নিতে উপজেলা একজন করে নির্বাহী হাকিম নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় ইসির যুগ্ম সচিব ফরহাদ আহাম্মদ খান। যে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করে না, সেখানে সুষ্ঠু ভোটাভুটি কিংবা সমতল নির্বাচনী খেলার মাঠ প্রত্যাশা করা যায় না এবং ক্ষমতাসীনেরা অসমতল মাঠে খেলতে পছন্দ করে। কারণ তারা জানে অসমতল মাঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়ানরাও হেরে যায়। আর দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীনেরা এত বেশি 'পেনাল্টি' পায় যে, প্রতিপক্ষ মাঠে থাকলে কী আর না থাকলেই বা কী। তখন প্রতিপক্ষ কেবল লালকার্ড পাবে। এ দিকে, ক্ষমতাসীন দল ফ্রি কিক পায় ডি বক্সের সামনে। নির্বাচনের মাঠে বড় খেলোয়াড় আওয়ামী লীগ সরকার এবং ঐক্যফ্রন্ট। নির্বাচন কমিশন হচ্ছে রেফারি। নিরপেক্ষভাবে রেফারির দায়িত্ব পালন করার

কথা থাকলেও এই কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে না। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও বাস্তবে তারা কতটুকু স্বাধীন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কমিশন ইচ্ছা করলে ভোট কারচুপি, ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই কিংবা অবৈধ সিলমারা প্রতিরোধ করতে পারে। আমাদের দেশে দৃঢ় নির্বাচন কমিশনের যেমন উদাহরণ আছে, তেমনি সরকারের কাছে নতজানু কমিশনেরও দৃষ্টান্ত অনেক। নির্বাচন কমিশন সত্যিকার অর্থে নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য; কিন্তু লজ্জাকর হলেও সত্য, যারা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে থাকেন তারা দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা একটি নিরপেক্ষ ও সাহসী নির্বাচন কমিশন পাইনি। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না বলেই কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে তৎকালীন সরকার সে দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি। তৎকালীন বিরোধী দল ও আজকের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির বিধান সংবিধানে সংযুক্ত করতে এমনকি, নৈরাজ্যের পথ বেছে নিয়েছিল। অথচ তারাই পরে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিলো। অজুহাত, কেয়ারটেকার ব্যবস্থা নাকি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। তা এমন একটি পদ্ধতি কি বের করা যেত না, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনী উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা থাকে। সর্বত্র বিরাজ করে নির্বাচনী আমেজ। এবারের নির্বাচন অতীতের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রথম নির্বাচন হতে যাচ্ছে, যেখানে পার্লামেন্টের ৩৫০ জন এমপি সপদে বহাল থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সে কারণে জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ও ভয় কাজ করছে। তফসিল ঘোষণার পরও বেশির ভাগ থানায় আগের ওসিরাই রয়েছেন। তারা দলীয় সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন বলে ভাবা যায় না। নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করতে পারে, এমন সম্ভাব্য কর্মকর্তাদের ব্যাপারে ইতোমধ্যে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী খোঁজখবর নিচ্ছে। এ অবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সমতল মাঠ, মন্ত্রী-এমপিদের পছন্দের ইউএনও এবং ওসিদের বদলি করা প্রয়োজন অবিলম্বে। কারণ ক্ষমতাসীনেরা গত ১০ বছরে

এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে বলয় সৃষ্টি করেননি। নির্বাচন কমিশনের অদক্ষতা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার নজির আমাদের দেশে বহু, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির হাস্যকর নির্বাচন।

তফসিল ঘোষণার পরও আইন প্রয়োগকারী বাহিনী এবার দলীয় বাহিনীর মতো আচরণ করছে। জামায়াত আর বিএনপির নেতাকর্মীদের গণহারে গায়েবি মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে। অথচ ক্ষমতাসীন দলের দলীয় কোন্দলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দু'জন নিহত হলেও পুলিশ নির্বিকার। এহেন পক্ষপাতমূলক আচরণ অব্যাহত থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে না। লেভেল প্লেয়িং কোথায় আছে? পোস্টার দেখলেই তো বোঝা যায়। রাজধানীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে নৌকার বিলবোর্ড, পোস্টার বা ব্যানার দেখা যাবে না। রাজধানীর বেশির ভাগ স্থানে নৌকার প্রচার অবিরাম চলছে। এমনকি সরকারি অফিসের সামনেও নৌকার পক্ষে ভোট চেয়ে লাগানো বিলবোর্ডগুলো দৃশ্যমান। আসলে আওয়ামী লীগ তার সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতায় আসার পর তারা লুটপাট করেছে, তা লিখলে হয়ে যাবে মহাকাব্য। সরকারের তলপিবাহকেরা ভাঙা রেকর্ডের মতো উন্নয়নের গল্পে জাতিকে বুঁদ রেখে বিভ্রান্ত করছে। তাদের মুখে উন্নয়নের স্লোগান যেভাবে মুখরিত হয়, সেভাবে যদি নির্বাচনী সমতল মাঠের দাবি শোনা যেত, তা হলে দূর হয়ে যেত সুষ্ঠু ভোটের ভয়।

প্রকাশকাল : শনিবার, ১ ডিসেম্বর, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

ইলিয়াস আলী নিখোঁজ রহস্য ৭ বছরে অজানা থেকেই গেল!

মধ্যরাত। দুই নম্বর রোড, সাউথ পয়েন্ট স্কুল এন্ড কলেজের সামনে, বনানী, ঢাকা। সময়টা ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল। সড়কে পড়ে আছে একটি প্রাইভেটকার। নেই চালক, নেই যাত্রী। বিষয়টি 'ব্রেকিং নিউজে' স্থান পেতে সময় লাগলো না মোটেও। প্রাইভেটকারটি যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা এম. ইলিয়াস আলীর!

নিজের ওই প্রাইভেটকারযোগেই বাসাতেই ফিরছিলেন ইলিয়াস আলী। পথিমধ্যে 'নিখোঁজ' হয়ে যান তিনি। একই ভাগ্য মেনে নিতে হয় তার গাড়িচালক আনসার আলীকেও।

তারপর সময় শুধু টিক টিক করে এগিয়েই গেছে। যেতে যেতে পেরিয়ে গেছে অর্ধযুগেরও বেশি সময়। আগামীকাল বুধবার, আরেকটি ১৭ এপ্রিল। এ দিনেই ইলিয়াস আলী 'নিখোঁজের' পুরো সাত বছর পূর্ণ হচ্ছে।

ইলিয়াস আলী কোথায় হারালেন? গাড়িচালক আনসার আলী বা কোথায়? তারা কি বেঁচে আছেন? এরকম অনেক প্রশ্নই শুধু আছে, উত্তর নেই কোথাও! ইলিয়াসকে খোঁজে পেতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো তৎপরতাও এখন আর দৃশ্যমান নয়।

বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সিলেট জেলা বিএনপির সংগ্রামী সভাপতি সিলেটের এক কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জীবন্ত

কিংবদন্তী ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের তুখোড় ছাত্রনেতা এম. ইলিয়াছ আলী নিখোঁজ হবার প্রায় ৭ বছর অতিবাহিত হচ্ছে। এতদিনে কি পরিণতি হয়েছে তার এ তথ্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেহ বলতে পারবেন না। শুধু ইলিয়াস নয় আজ পর্যন্ত খুঁজ মিলেনি তার ড্রাইভার আনসার আলীর। নিখোঁজ হওয়া ছাত্রনেতা ইফতেখার হোসেন দিনার ও তার সাথে নিখোঁজ আরেক ছাত্রনেতা মইনুল ইসলাম। এক জন জনপ্রিয় রাজনৈতক নেতা গুম হয়ে গেলেন কিন্তু আইন শৃংখলা বাহিনী এখন পর্যন্ত কোন সুরাহা করতে পারেননি। ইলিয়াস আলীকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেতে তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন স্ত্রী তাহসীনা রুশদী। প্রধানমন্ত্রী তাকে খোঁজে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন। তাছাড়া আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিন্টন বাংলাদেশে সফরকালে তার কছে বাবাকে ফিরে পেতে নিজ হাতে লিখা একটি খোলা চিঠিও দেয় ইলিয়াস আলীর ছোটো মেয়ে। তখন হিলারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইলিয়াসকে খোঁজে বের করার আহ্বান জানান। তবে এখনো তাদের করোরও আশ্বাসের কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED রক্ষক জখন ভক্ষকের ভূমিকায় তখন কতটুকু আশাবাদী পাঠকবৃন্দ আপনারি বলবেন। সরকার এম ইলিয়াস আলীর জনপ্রিয়তাকে ধংস করার জন্য তাকে গুম করেছে।

নিখোঁজ ইলিয়াস আলী টিঁপাই মুখ বাঁধ ও ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন আপসহীন তিনি এটাই হলো তাঁর জন্য কাল। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, এদেশের সকল জনগণের প্রধানমন্ত্রী। তিনি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী নন। ইলিয়াছ আলী নিখোঁজ, দেশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। "আতঙ্কগ্রস্ত বিভিন্ন কারণে। বাংলাদেশের ইতিহাসে গুম শব্দটা

অনেক পরিচিত। সেই স্বাধীনতার পরবর্তী থেকে এ ধরনের অনেক ঘটনায় আমরা শুনে আসছি। গায়ে শোয়ে যাবার মতো ব্যাপার হয়ে গেছে।

পত্রিকান্তরে জানা যায় ৭২-৭৫ এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনামলে ৩৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা বাম নেতা কর্মী গুম হন। এ ধারা তখন থেকে চলে আসছে। সবাই চায় ইলিয়াস আলীর কোন খোঁজ আসুক। মানুষ বেতার, টেলিভিশন এর সংবাদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে শুনছে। সবাই আশা করেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে সান্ত্বনামূলক আশার আলো দেখতে পাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি বললেন? বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নির্দেশেই ইলিয়াস আলী লুকিয়ে আছেন বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হত্যা-গুম করার রাজনীতি বিএনপিই শুরু করেছে। এটা জিয়ার আমল থেকেই শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামে জামাল উদ্দিনকে তাদের নিজেদের দলের নেতারা খুন করে গুম করেছিল। একটা রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক নেতা গুম বা খুন হওয়া অনেক ভাবনার বিষয়। এ দায় কোনভাবে সরকার এড়িয়ে যেতে পারেন না।" মানুষ স্বভাবতই বলবেন, সরকার ক্ষমতায় আসতে পারবে না এজন্য বিরোধীদলের নেতাদের গুম করছে!বর্তমানে এ গুমের পিছনে বড় একটা শক্তি যে কাজ করছে তা আমরা প্রায় সবাই ইতোমধ্যে ঠাহর করতে পেরেছি। অনেকে মনে করেন, সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের রেল বিভাগের দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে এ রহস্যজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য।

বিরোধী দল বলছে সরকার গুমের সাথে জড়িত। আবার সরকারি দলের লোকেরা বলছে বিরোধী দলের লোকেরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। জনগণ বোকা নেই এখন তারা সব বোঝে। সে যাই হোক। ইলিয়াছ ইস্যুতে বিরোধী দল হরতাল করলো। সিলেটে পুলিশের গুলিতে লোক মারা গেল। ফেসবুক ব্লগে বেশ ঝড় তুলতে দেখলাম নবীন প্রজন্মকে। তাতে কি? সরকার যে আজও ইলিয়াস কে খুজে পায় নি। নিখোঁজ ইলিয়াসকে ফিরে পাবে কি পাবেন না এমন দুশ্চিন্তায় এখনো অষ্ট প্রহর কাঠছে স্বজন পরিজনের। হতাশ হয়ে পড়েছেন দলীয় নেতা-কর্মী। আর অনাকাঙ্ক্ষিত গুমের ঘটনায় পুরো জাতি রয়েছেন অজানা শঙ্কায়। ঘটনার প্রায় চারমাস পেরিয়ে গেলেও এ পর্যন্ত কারোরই কোন প্রকার সন্ধান ও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়ায় তাদের পরিবার, দলীয় নেতা কর্মী সহ সর্বসাধারণে বিরাজ করছে চরম উৎকণ্ঠা। তারা এখনো স্পষ্ট হতে হতে পাছেন না যে এম. ইলিয়াস আলী এখনো জীবিত আছেন কি না। এদিকে নিখোঁজ স্বামীর সন্ধানে ঢাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ড্রাইভার আনছার আলীর স্ত্রী। করেছেন সংবাদ সম্মেলনও। কোলের শিশুকে নিয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরেছেন নিখোঁজ

স্বামীকে ফিরে পাবার আশায়। তার কোলের অবুঝ শিশুর এখনো বোঝার বয়স হয়নি কোথায় তার বাবা।

এ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পরপর সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তার খোঁজে কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করলেও বর্তমানে তাদের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া-শব্দ না মেলায় আহাজারিই এখন স্বজনদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে ইলিয়াস আলী নিখোঁজের পর বিশ্বনাথে বয়ে চলছে আরো আলোচিত কিছু ঘটনা। সরকারী আদেশে বরখাস্ত করা হয় বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ৭ ইউপি চেয়ারম্যানকে। পরে তারা উচ্চাদালতের নির্দেশে এ বরখাস্থের আদেশ স্থগিত করেন। অন্যদিকে বিশ্বনাথে থানা ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশ-গ্রামবাসী সংঘর্ষে তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের দায়ের করা পৃথক দুটি মামলায় ৬২ জন অভিযুক্ত। গ্রেফতারের ভয়ে অনেকেই এখনো ঘর ছাড়া। ফলে ইলিয়াস আলীর জন্মভূমি বিশ্বনাথের মানুষ এখনো ফিরে আসতে পারেনি স্বভাবিক জীবনে।

ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার পর উত্তাল হয়ে উঠে সিলেটসহ সারা দেশ। চলে হরতাল-ভাংচুর, দেশে জ্বলে উঠে আগুনের লেলিহান শিখা। ইলিয়াসের জন্মস্থান বিশ্বনাথে টালমাটাল অবস্থা হয়। গুলি খেয়ে মারা যায় ৩ টি তাজা প্রাণ। এরপরও চলছে ইলিয়াসকে ফিরে পাবার একদফা আন্দোলনে। অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরসহ থানা ঘেরাওর মতো কঠিন কর্মসূচি চালিয়ে যায় তারা।

আর বিএনপিসহ এর অংগসংগঠন এখনো নানা কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে ইলিয়াস আলীর সন্ধান ও তাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়ার দাবিতে। তবে আবারো ইলিয়াস ইস্যুকে নিয়ে সিলেটে আন্দোলন বেগবান হবে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

সম্প্রতি ইলিয়াস আলীকে ফিরে পাওয়ার আন্দোলনকে জোরদার করতে সিলেটে গঠিত হয়েছে 'ইলিয়াস মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ'। বিভিন্ন সময়ে মিছিল, সমাবেশ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করছে সংগঠনটি। সর্বশেষে আমাদের সকলের প্রত্যাশা সিলেটের মাঠিও মানুষের নেতা জননেতা এম.ইলিয়াস আলী সুস্থভাবে আমাদের ও তিনির পরিবারের কাছে ফিরে আসুন।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

বাংলাদেশে ও বিশ্ব রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ণ!

বাংলাদেশের ইতিহাসে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবস্থান অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান প্রসঙ্গ ও পরে মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্স এর কমান্ডার হিসেবে দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার প্রসঙ্গ। অন্য দিকে হচ্ছে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনকালে দূরদর্শী ভূমিকার প্রসঙ্গ, ১৯৭৫ সালের শেষ লগ্ন থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত সেনাবাহিনী পরিচালনা ও ১৯৮১ সালের মে পর্যন্ত দেশ পরিচালনার প্রসঙ্গ। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের শেষ লগ্ন পর্যন্ত সময়কালে একাধিক কারণে বিপর্যস্ত জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন জীবন দানের দায়িত্ব পড়েছিল তার ওপর। সেই সুবাদে, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর সরকারপদ্ধতি স্থি'তিশীলতা পাওয়ার যাত্রা শুরু করে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে। ওই দিন শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর বাংলাদেশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারপদ্ধতি গ্রহণ করে।

মুজিবুর রহমান হন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়। ও শেখ মুজিব ও

তৎকালীন আওয়ামী লীগের আগ্রহেই বহুদলীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করে কায়েম করা হয় একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা। মাএ চারটি সংবাদ পত্র রেখে বাকিগুলো বন্দ করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কে হরণ করা হয়। তখন একটি মাত্র দলের নাম ছিল বাকশাল। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর সামরিক শাসন জারি হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট সহচর ও মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ। অনেক দিন পর সামরিক শাসন যখন প্রত্যাহার করা হবে হবে ভাব, তখন জাতির সামনে একটি প্রশ্ন আসে এই মর্মে যে, বাংলাদেশ কি একদলীয় শাসনে ফেরত যাবে, নাকি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফেরত যাবে? বাংলাদেশের সব শ্রেণীর জনসাধারণের মনোভাব এবং সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মনোভাব ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনুকূলে। বলা বাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করা। সেই সময়ের বাংলাদেশের কর্ণধার জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেও বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভক্ত ছিলেন বিধায় তিনি সময় নিয়ে, পরিবেশ সৃষ্টি করে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যদি তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করতেন, তাহলে ওই সময়ের বাংলাদেশ আবার অন্ধকারে অরাজকতায় নিপতিত হতো। জিয়াউর রহমান দেশের ঐ ক্রান্তিলগ্নে দেশকে আলোর ও শান্তির পথ দেখান। একদলীয় শাসনের প্রবক্তা এবং অনুসারীরা তাঁকে অপছন্দ করার অন্যতম কারণ এটাই।

নিজ গুণে, মেধায় ও পরিশ্রমেই জেনারেল জিয়াউর রহমান একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মহীরুহ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের জন্য সর্বতোভাবে নিবেদিত হওয়া তথা বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, বাংলাদেশের মর্যাদা উন্নয়নের জন্য ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সহযোগিতা অর্জনের জন্য তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন।

বাংলাদেশের এক ক্রান্তিকালে জিয়াউর রহমান রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একাত্তরের মার্চের ১ তারিখে পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান মার্চের ৩ তারিখে অনুষ্ঠেয় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থ'গিত ঘোষণা করলে এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-জনতা বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে নারাজ; তাই বাঙালিদের মুক্তির জন্য দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর অন্য কোনো পথ খোলা নেই। এ সময় ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার দিকে জাতিকে ধাবিত করার জন্য প্রকাশ্যে মাঠে নেমে

পড়েন। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন এটি যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা দমিয়ে দিতে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই ঢাকা ত্যাগ করেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। ২৫ তারিখ রাতেই পাকিস্তান সরকারের হুকুমে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনা মোতাবেক হামলা চালানো হয় চট্টগ্রামসহ দেশের একাধিক সেনানিবাসে বাঙালি সৈনিকের ওপর, পিলখানায় বাঙালি ইপিআরের ওপর, রাজারবাগে বাঙালি পুলিশের ওপর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আবাসিক হলের ওপর এবং সারা দেশে অগণিত জনবসতির ওপর। এ দিকে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতিকে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বললেও ২৫ মার্চের কালো রাতে জাতি তার কাছ থেকে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা পাননি কিংবা তিনি সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা দেওয়ার সুযোগ চেষ্টা করেননি। এরূপ একটি প্রেক্ষাপটে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনানিবাসে কর্মরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈনিকেরা একটি ঐতিহাসিক ও দুঃসাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সব বাঙালি অফিসার ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন গুলোর মধ্যে সর্বাধিক অগ্রণী ও ত্বরিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান এবং তার সাথে ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরের ষোল শহরে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকেরা। একই সময়ে ঐতিহাসিক দুঃসাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) চট্টগ্রামের হেডকোয়ার্টারে কর্মরত বাঙালি অফিসার ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম এবং ক্যাপটেন হারুন আহমেদ চৌধুরী। ২৫ মার্চ মাঝ রাত ১২টার কয়েক মিনিট পর তথা ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের প্রথম প্রহরেই, ষোল শহরে নিজের ব্যাটালিয়নের অফিসার ও সৈন্যদের একত্র করে একটি খালি তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়েই নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন মেজর জিয়া। অফিসার ও সৈনিকদের সামনেই মৌখিকভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণেই ঐ ভাষণ ও ঘোষণাগুলোর কথা উপস্থি'ত সামরিক ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বাঙালি জাতির অন্য কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধকে সুসংহত করার জন্যই, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে অথবা সম্মতিতেই ২৭ মার্চ

১৯৭১ তারিখে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। প্রথমে তিনি নিজ নামে করলেও পরে বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণা করেন। দেশবাসী ও বিশ্ববাসী মেজর জিয়াউর রহমান নামক অকুতোভয় একজন সৈনিকের কণ্ঠ থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জিয়াউর রহমানের কণ্ঠনিঃসৃত স্বাধীনতার ঘোষণা ঐ আমলের সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত সব বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সব বাঙালি অফিসার ও সৈনিকের জন্য ছিল প্রেরণাময় ও উদ্দীপনাময় প্রায় অলঙ্ঘনীয় বার্তা। ২৭ মার্চ তারিখে বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়ার ঘোষণার মাধ্যমে পাক বাহিনীর মোকাবেলায় বাঙালি সৈন্যরাও যে যুদ্ধে নেমেছে এটি জেনে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে অতি স্বল্প পরিসরে বলা খুবই কঠিন। মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালের প্রথম সাড়ে তিন মাস জিয়াউর রহমান কুমিল্লা

সেনানিবাসে অবস্থিত ৪৪ পদাদিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন 'জেড ফোর্স' পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৪ পদাতিক ব্রিগেডে রূপান্তর হয়েছিল। এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান ছিলেন। অতঃপর ২৪ আগস্ট ১৯৭৫ তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের শেষ দিনগুলো এবং ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকের দিনগুলো ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার আঙ্গিকে অস্থিতিশীল সময়। মেজর জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হিসেবেই উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ৩ তারিখ ভোর রাত ৩টার দিকে তিনি নিজ গৃহে বন্দী হন এবং ৪০ ঘণ্টা পর বিপ্লবী বা বিদ্রোহী সামরিক নেতাদের চাপে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে সম্মত হন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহটি ছিল বিভীষিকাময়, উদ্বেগময় ও অনিশ্চয়তায় ভরা।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধা তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা এবং ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান, উভয় ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী মহলকে ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করে। একটি মহল দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। সেই মহলটি হচ্ছে ওই আমলের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদের অন্যতম অঙ্গসংগঠনের নাম ছিল গণবাহিনী। জাসদের সহযোগিতা বা পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা একটি গোপন ও অবৈধ সংগঠনের নাম ছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। বিপ্লবি সৈনিক সংস্থার সদস্য ছিলেন ঐ আমলের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক জুনিয়র কমিশন অফিসার ও সৈনিক। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং জাসদ মনে করত যে, সশস্ত্র পন্তায় ক্ষমতা গ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এরূপ একটি সশস্ত্র-রাজনৈতিক বিপ্লবের জন্য ঐ আমলের জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যৌথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসছিল। তারা যৌথভাবে কবে বা কোন তারিখে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবেন সেটি সুনিশ্চিত হওয়ার আগেই ঘটে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা। ১৫ আগস্টের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বা ঘটনার বস্ময়কর (সারপ্রাইজ-ইফেক্ট) কাটতে না কাটতেই ঘটে যায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের ঘটনা। ৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দারুণভাবে উদ্বিগ্ন জাসদ এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয় অতি দ্রুত সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য। এ বিপ্লব ছিল ৭ নভেম্বরের বিপ্লব। এই বিপ্লব শুরু হয়েছিল ৬ নভেম্বর রাত ১২:০১ মিনিটে তথা আন্তর্জাতিক নিয়ম

মোতাবেক ৭ নভেম্বর তারিখ শুরু হওয়ার মুহূর্তে। ওই বিপ্লবের তাৎক্ষণিক লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, যত বেশি সম্ভব সেনাকর্মকর্তাকে হত্যা অথবা বন্দী করা এবং দায়িত্বচ্যুত করা। অতঃপর অফিসারবিহীন সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত করা এবং ওই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও জাসদের নেতৃত্বে একটি কর্মকর্তাবিহীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কৌশলগত কারণেই জাসদ বা জাসদের গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান (যিনি নিজ গৃহে বন্দী ছিলেন) জিয়াউর রহমানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তাই ৭ নভেম্বর সৈনিক বিপ্লবের বা বিদ্রোহের প্রথম ঘণ্টাতেই তারা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যসংখ্যা ছিল কম। ঢাকা সেনানিবাসে হাজার হাজার সাধারণ সৈনিক এই সৈনিক সংস্থার গোপন পরিকল্পনা জানত না। সাধারণ সৈনিকদের কাছে তাদের অতি প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা সেনাপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ সৈনিকেরা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার আহ্বানে ওই রাতে রাস্তায় নামে কিন' যখনই তাদের গোপন পরিকল্পনা গোচরীভূত হয় তখনই তারা সাবধান হয়ে যায় এবং ওই সম্পর্কছেদ করে। সাধারণ সৈনিকেরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আগলে রাখে এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তথা জাসদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। সাধারণ সৈনিকদের এ প্রচেষ্টায় ঢাকা মহানগরের জনসাধারণ যোগদান করেন। তাই ৭ নভেম্বরের বিপ্লবকে বলা হয় সিপাহি-জনতার বিপ্লব। জেনারেল জিয়াউর রহমান ৭ নভেম্বর সূর্যোদয়ের আগেই সেনাবাহিনীর ওপর তার নেতৃত্ব ও কমান্ড আবার সম্পন্ন করেন। ওই দিন তথা ৭ নভেম্বর সকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিকেরা ও ঢাকা মহানগরীর জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি বিতর্কিত আত্মঘাতী রাজনৈতিক-সশস্ত্র হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বেঁচে যায়। বাংলাদেশ রক্ষা পায়; অপর ভাষায় বলতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা পায়। সেই রাতে ও দিনে অনেক কর্মকর্তা বিপ্লবী সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারান।

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের পর, অভ্যুত্থানের নায়কদের মুখ থেকে বের হওয়া কিছু কথা এবং নায়কদের ঘনিষ্ঠদের কিছু কর্মকাণ্ডে ঢাকা মহানগরে তথা বাংলাদেশে একটি অনুভূতি প্রচার হয়ে যায় এই মর্মে যে, '৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানটি ভারতপন্থি অভ্যুত্থান। ভারতপন্থি এ অভ্যুত্থানের মহানায়কেরা বাংলাদেশকে ভারতের অনুগত বানানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে বন্দী

করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে এবং ঢাকা মহানগরীর সাধারণ জনগণের মনে একটি আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এই মর্মে যে, বাংলাদেশকে ভারতের হাত থেকে বাঁচাতে হলে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করতে হবে। পাঠক এ পর্যায়ে লক্ষ করবেন যে, সাধারণ সৈনিকেরা একটি উদ্দেশ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছেন এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অনুসারীরা আরেকটি উদ্দেশ্যে তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছেন। বিপ্লবী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্যারিশম্যাটিক তথা জনপ্রিয় আবেদনময় চরিত্র ও নাম ব্যবহার করে জাসদের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহরে এসে ব্যর্থ হয়ে যায়। ওই অভ্যুত্থানের মহানায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার- এই তিনজনই বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঢাকা ত্যাগ করতে উদ্যোগ নেন। বাধাগ্রস্ত হয়ে তারা দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় নেন। দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট উত্তরবঙ্গে রংপুর সেনানিবাসে ওই ব্রিগেডের অধীন ছিল, যে ব্রিগেডটির ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা। নিজের নেতৃত্বে সম্পাদিত অভ্যুত্থানের সাহায্যার্থে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে রংপুর থেকে ঢাকা আনেন। ওই দশম বেঙ্গল অস্থায়ীভাবে ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলা নগরে অবস্থান নিয়েছিল এবং ঐ অবস্থানেই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে সেই তিন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে অনেক কিছুই লেখা যাচ্ছে না স্থানাভাবে; তবে যেকোনো সবিশেষ আগ্রহী রাজনৈতিক মনা ব্যক্তির জন্য এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

আয়তনে ছোটো ও দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পাশাপাশি বহির্বিশ্বে এ রাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ ভাবমর্যাদা অর্জনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অনন্য-অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এ সাফল্যের পেছনে গভীরভাবে কাজ করেছে তার বৈদেশিক নীতির অনুপম আদর্শ ও সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলো। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তার নেতৃত্বসুলভ পদ্ধতি ছিল উল্লেখ করার মতো। তিনি নিজেই বৈদেশিক বিষয়াদি বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরাসরি তদারকি করতেন। আলোচনা, পরামর্শ, মতবিনিময়, অধ্যয়ন, বৈঠক ও খোঁজখবর রাখা বা ফলোআপ করা ছিল তার কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যই তার বৈদেশিক নীতি আদর্শকে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী ও ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। তার পররাষ্ট্রনীতির

কারণে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্থবহ হয়েছিল, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি আর ভিক্ষুকের জাতি এই অপবাদ ঘোচাতে পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী কাজ করা শুরু করেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলিতেই অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও পেশাগত কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে স্বাধীন, স্বচ্ছ ও কার্যকর করার যে যুগান্তকারী নজির স্থাপন করে গেছেন তারই ফলে দেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল হয়েছে, দেশের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, পররাষ্ট্রনীতিকে যদি গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটি চলবে আমলাতন্ত্রের আপন গতিতে, আপন ধারায় ও আপন পথে। সেখানে গন্তব্য কোথায়? পৌঁছবে কখন? এসব বিষয় অজানা থাকে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এ ধারা থেকে বেরিয়ে এসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখেছিলেন। পররাষ্ট্র বিষয় নিয়ে তার মধ্যে একটা ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা ছিল, একটা নীতি ছিল, একটি গন্তব্য ও লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কাজে লাগিয়েছেন এবং সফলতা অর্জন করেছেন। পররাষ্ট্রনীতিতে দেশনেতা জিয়াউর রহমানের সরকারের সফলতায় পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রনায়কও হতবাক হয়েছিলেন। অপ্রিয় হলেও সত্য, আজ বাংলাদেশ সরকারের যেসব নীতি এবং মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে, পররাষ্ট্রনীতি তার মধ্যে অন্যতম। বন্ধুপ্রতিম অনেক দেশের সাথেই আমাদের এখন শীতল সম্পর্ক বিরাজমান। একটি দেশের জন্য এ অবস্থা অশুভ লক্ষণ।

দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা রাষ্ট্রপতি জিয়া সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও কার্যকর করার জন্য সার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়ন ছিল। ১৯৮০ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি জিয়া একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা ও শান্তি জোট গঠনের প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে দিল্লিতে যান। বাংলাদেশের নেতা রাষ্ট্রপতি জিয়ার এই বাস্তবধর্মী প্রস্তাবে আকৃষ্ট হন ভারতরত্ন ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত ও বাংলাদেশ নিয়ে প্রক্রিয়া শুরু হয় সার্ক গঠনের। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া তত দিন বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু এই দেশনেতা স্বীকৃতি পেয়ে যান সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে। এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় গৌরব ও অর্জনের বিষয়।

এ দেশের শিশুদের সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠা করেন শিশু একাডেমী। পুলিশ ও আনসার বিভাগে মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য মহিলা পুলিশ ও মহিলা আনসার বাহিনী সংগঠন করেন। গ্রামীণ জনগণকে শাসনকাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করেন গ্রাম সরকার। যুবশক্তিকে জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেন। কৃষিকাজেও অভূতপূর্ব সাফল্য আনেন তিনি। এক কথায় মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালের ৩০ মে শাহাদতের আগ পর্যন্ত শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন ছিল এ দেশের মাটি ও মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থাৎ বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ও বিকাশ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন, সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতির মুক্তি, স্বাধীনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সাথে অকৃত্রিম সম্পর্কোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে শহিদ জিয়ার চিরদিন অবদানের কথা এ জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখবে এবং তার মতো একজন নেতার শূন্যতা অনুভব করতে থাকবে।

প্রকাশকাল : শুক্রবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

শীর্ষ খবর ডটকম

আলোর পথযাত্রীরা মশাল হাতে এক অজানা দিনে 'মা' এর মুক্তির জন্য রাজপথে বেরিয়ে পড়বে

বিএনপি চেয়ারপারসন গণতন্ত্রের 'মা' আপসহীন দেশ নেত্রী তিবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চ্যেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃসঙ্গ কারাবরণের ২ বছর ২ মাস ১০ দিন কেটে গেল। ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় Solitary confinement, সেভাবেই কারারুদ্ধ আছেন তিনি।। পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের পাশে অবস্থিত পরিত্যক্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে বন্দি রাখা হয়েছে।

কারাজীবনে তার একমাত্র সঙ্গী গৃহকর্মী ফাতেমা। বার্ধক্যে একটু সেবা-যত্ন করার জন্য ফাতেমার সাহায্য না পেলে তার কারাবাস হতো অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায় জর্জরিত। তিনি খুবই অসুস্থ।

তিনি একজন নারী বটে, পুরুষ হলেও এ ধরনের কারাবাস সাধারণ কারাবাসের চেয়ে হাজারগুণ বেশি কষ্টের। তিনি অনেক রোগে আক্রান্ত, বহু বছর ধরে আর্থ্রাইটিসের রোগী।

এজন্য তার হাঁটু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও রোগ যন্ত্রণা একটুও কমেনি। এছাড়াও রয়েছে ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপের উপসর্গ। দিন দিন তিনি ক্ষীণকায় হয়ে পড়ছেন। তার বর্তমান ছবি দেখে বোঝা যায় না, এই মানুষটি একদিন এরশাদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে মাইলের পর মাইল জনতার মিছিল নিয়ে হেঁটেছেন।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার এই অক্লান্ত সংগ্রাম জনতার কাছে তার পরিচিতি দিয়েছে আপসহীন নেত্রীর। তিনি যখন রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার বছর দুই আগে যৌবনেই তিনি হারিয়েছেন স্বামীকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারকভাবে।

কোথা থেকে তিনি এত সাহস পেলেন, ভাবতেও বিস্মিত হতে হয়। বয়স বাড়লেও রাজনীতির চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে তিনি সাহস হারাননি।

শোনা যায়, কারাগারে তাকে নানা ধরনের আপস প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এসব মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না, এমনটাই ধারণা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমার পক্ষে হলফ করে বলা সম্ভব নয় এসব শোনা কথার সত্যতা কতটুকু।

খালেদা জিয়া রাজবন্দি কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ তার বিরুদ্ধে যে ৩০-৩৫টি মামলা চলছে, তার সবই ফৌজদারি মামলা। ফৌজদারি মামলার আসামি রাজবন্দি হতে পারে না, এমনটাই বলছেন শাসক দলের নেতারা।

এই শাসক দল একটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আছে। তাদের বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ না করেও আমাদের দেশের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বা Criminal offence-এ মামলা হলেও তার চরিত্রটি মূলত হয় রাজনৈতিক।

খালেদা জিয়া যদি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় নেত্রী না হতেন এবং অতীতে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে না থাকতেন, তাহলে তাকে এই বৃদ্ধ বয়সে কারাবাস করতে হতো না। পাকিস্তান আমলে রাজনীতিকদের এভাবে হয়রানি করার ঘটনা সংখ্যায় অনেক কম হলেও খুব অনুল্লেখ্য ছিল না। আমাদের রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির মামলা হয়েছিল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এসব মামলা আদালতের বিচারে টেকেনি। মরহুম আবুল মনসুর আহমেদ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তবে পাকিস্তান আমলে কারাবাসের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হতে হয়েছে বামপন্থী কমিউনিস্টদের। কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলেও তাদের বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক থাকতে হতো।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আটক রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আইন, প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন ও ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে বিনা বিচারে আটক শত শত রাজবন্দি মুক্তি লাভ করেছিলেন।

তাদের মধ্যে সর্বাধিক সময় জেল খেটেছেন বামপন্থী নেতা আশু ভরদ্বাজ। সেই যে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর তাকে বন্দি করা হল, তারপর ১০ বছরেরও বেশি কারা জীবনযাপনের পর তিনি মুক্তি পেলেন ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে। ১৯৬৯-এর ১১ দফা দাবির অন্যতম দাবি ছিল রাজবন্দিদের মুক্তি।

আন্দোলনের তীব্রতা, ব্যাপকতা এবং প্রচণ্ডতা এতই বাঁধভাঙা ছিল যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক শেখ মুজিবসহ অন্যদের মামলা চলা অবস্থাতেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিঃশর্তভাবে এদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। অথচ এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সিভিল না ক্রিমিনাল তা বলতে পারব না। কারণ আমি আইনজ্ঞ নই।

তবে এদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলো আমার কাছে ক্রিমিনাল বলেই মনে হয়। আইয়ুব খান কেন তাদের মুক্তি দিলেন, তা-ও একটি বিচার্য বিষয়।

আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে আইয়ুব খানের এভাবে নতিস্বীকার শুধু একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং সেটি হলো ডকট্রিন অব নেসেসিটি। রাষ্ট্র রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইনকেও উপেক্ষা করা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে ডকট্রিন অব নেসেসিটির প্রয়োগ প্রচলিত আইনে গণ্ডির মধ্যে না থাকলেও এটা আইনি ব্যাখ্যা থেকেই উদ্ভূত।

খালেদা জিয়ার কারাবাসের এক বছর পেরিয়ে গেলেও আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে তার মুক্তি সম্ভব এমনটি একজন রাখাল বালকও মনে করে না। আমাদের মতো দেশে প্রবাদতুল্য একটি কথা প্রচলিত আছে। তা হল, ক্ষমতার সিংহাসন থেকে কারাগার বেশি দূরে নয়।

এরকম অভিজ্ঞতা ১৯৪৭-এর পর অনেক রাজনীতিকেরই হয়েছে। খালেদা জিয়া তার ব্যতিক্রম নন। এর আগেও সেনাসমর্থিত অসাংবিধানিক সরকারের আমলেও তাকে কারাভোগ করতে হয়েছে। তবে এখনকার তুলনায় বেশ কিছুটা সুখকর অবস্থায় সেই সময়েও তার কাছে আপস প্রস্তাব এসেছিল।

কিন্তু জেদি খালেদা জিয়া সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সরকারের পক্ষে শেষ পর্যন্ত দুই নেত্রীকে মুক্তি দিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। একটি নির্বাচন করে তারা ক্ষমতা ছাড়লেন।

তবে এ যাত্রায় সংসদে বিএনপির অবস্থান খুবই সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। খালেদা জিয়া যদি আপস করতেন, তাহলে তার এই দুর্গতি হতো না। এখন শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, 'পারলে খালেদা জিয়াকে আন্দোলন করে মুক্ত করে নেন।'

এ রকম দম্ভোক্তি যারা করছেন তারা কি জানেন, এর পরিণতি কী হবে? অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আন্দোলনের মাধ্যমে যদি খালেদা জিয়া মুক্তি লাভ করেন তাহলে শাসক দলকেও ক্ষমতা হারাতে হবে, অথবা হারাতে হতে পারে।

খালেদা জিয়ার মতো একজন জনপ্রিয় নেত্রীকে কারারুদ্ধ করা যাবে কিংবা দণ্ডিত করা যাবে, এমনটি হয়তো কেউ ভাবেননি। না শাসক দল, না তাদের বিরোধী দল। কিন্তু বাস্তবে সবই হয়েছে। শাসক দল নিরুপদ্রবভাবে ক্ষমতায় আসীন আছে। অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয়, তাদেরকে আর নড়ানো যাবে না। গণআন্দোলনেরও কোনো সম্ভাবনা দিগন্ত রেখায় দৃশ্যমান নয়। কারণ একটিই।

যে বাংলাদেশ কবি সুকান্তের ভাষায়, 'করো কাছে মাথা নোয়াবার নয়', সেই বাংলাদেশে প্রচণ্ড এক ভয়ের সংস্কৃতি ভর করেছে। গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অসন্তুষ্ট মানুষকে ভয়ে গুঁটিশুটি করে ফেলেছে।

এত ভয় এদেশে আজ, যার ফলে গুটি খুলে প্রজাপতিও পাখা মেলে না। আকাশের ঘনমেঘ ভারি বর্ষণ করে না। এসবের অনেক নজির আছে। রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান যাচ্ছিলেন বিমানবন্দরের দিকে তার বিদেশ থেকে আগত কন্যাকে ঘরে নিয়ে আসতে।

কিন্তু তার কপালে সেই সুযোগ ঘটেনি। পথিমধ্যে তাকে তুলে নেওয়া হয়। তারপর থেকে তার আর কোনো হদিস মেলেনি।

এ ঘটনা সংবাদপত্রে এসেছে। দেশবাসীও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছে। এদেশের খুব কম লোকই জানত মারুফ জামান নামে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি কোনো মানুষই

জানত না রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সংশ্রব ছিল। হতে পারে কূটনৈতিক মহলের লোকরা তাকে চিনত। আজ অবধি তার কোনো হদিস নেই। সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কোনো রা' করা হয়নি।

একজন রাষ্ট্রদূতের যদি এমন পরিণতি হতে পারে, তাহলে আমাদের মতো আমজনতার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে, তা ভাবাই মুশকিল। শাসক দলের লোকজন বলবেন, এসব কথা তো আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তি খবরের কাগজের পাতায় প্রকাশ করতে পারছি, তাহলে এদেশে গণতন্ত্র নেই- এমন কথা কীভাবে বলা যায়? রাষ্ট্রদূত মারুফ জামানের উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এছাড়াও একই ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বছরের একটি দিনে প্রেস ক্লাবে সমবেত হয়ে এভাবে হারিয়ে যাওয়া মানুষের পিতামাতা, সন্তান ও স্ত্রীরা করুণ নয়নপাত করেন। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষটি আর ফিরে আসে না।

প্রতীক্ষার অবসান হয় না। জানা যায় না ওরা বেঁচে আছেন কি না, কিংবা কেমন অবস্থায় আছেন। হ্যাঁ, সংবাদপত্রে বা গণমাধ্যমে এসব কথা কিছু করে হলেও প্রকাশ করা যায় বলে দেশটি গণতন্ত্রের লেশমাত্রহীন হয়ে পড়েছে- এমন কথা বলা যায় না। দ্য ইকোনমিস্টের ভাষায় এটা হল, হাইব্রিড গণতন্ত্র। সভা-সমিতি করা বা সমাবেশ করা সবকিছুই এখন পুলিশের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

ভয়ের আবহ যখন ঘন কুয়াশার মতো দেশকে ছেয়ে ফেলে, তখন গণআন্দোলনই বা হবে কীভাবে? তারপরও আশা রাখি কুয়াশার চাদর ভেদ করে আলোর পথযাত্রীরা মশাল হাতে নিয়ে কোনো এক অজানা দিনে রাজপথে বেরিয়ে পড়বে। সে রকম মুহূর্ত এলে খালেদা জিয়া কেন, অন্যসব রাজবন্দিও মামলার জাল থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন। এদেশে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়।

সেই তুলনায় গণবিরোধী সরকারের স্থায়িত্ব অনেক বেশি। আমার আরও আশা থাকবে যদি কোনো অলৌকিক কারণে খালেদা জিয়ার মুক্তি হয়, তাহলে মুক্ত বাতাসে আমাদের নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ যেন অবারিত এবং অসীম হয়। কেউ যেন কোনো প্রতিশোধের স্পৃহায় আক্রান্ত না হয়। অন্যথায়, মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়াটাও ভারি হয় যাবে।

প্রকাশকাল : শনিবার, ১ ডিসেম্বর, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

আপসহীন নেত্রী ম্যাডাম থেকে গণতন্ত্রের 'মা'

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গ্রেফতারের প্রেক্ষাপট এবং গ্রেফতার পরবর্তী সময়ে তাকে সম্বোধন এবং সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে একটি আমূল পরির্তন এসেছে। বিএনপি নেত্রীকে তার দলের নেতাকর্মী এবং আশপাশের সবাই 'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করতেন। তিনিও তা পছন্দ করতেন। বরঞ্চ ম্যাডামের বাইরে কোনও সম্বোধন খালেদা জিয়া পছন্দও করতেন না।

কিন্তু এখন বিএনপি নেত্রী জেলে থাকায় তার পছন্দ-অপছন্দ জানা না গেলেও তাকে এখন সম্বোধন ও সম্মানের জায়গা উত্তরণ করেছে তার অনুসারীরা। তারা রাজকীয় মর্যাদার সম্বোধন ম্যাডামের চেয়ে এখন তাদের নেত্রীকে পৃথিবীর পবিত্রতম সম্পর্ক মায়ের স্থানে সম্মান, ভাবনা ও সম্বোধনেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। এমনকি আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক একাধিক জায়গায় বিএনপির সিনিয়র নেতা থেকে অসংখ্য নেতাকর্মী খালেদা জিয়াকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। বিএনপির অনেক নেতার সাথে গত কয়েক দিন কথা বলে জানা গেছে, তারা তাদের নেত্রীকে এখন মায়ের আসনে বসিয়েছেন।

মূলত কর্নাটকের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় তিনি যেমন এক নামে 'আম্মা' বলে পরিচিতি পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও নিজেদের নেত্রীকে মায়ের জায়গায় বসাতে চান বিএনপি নেতাকর্মীরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচিত ব্যক্তি পিনাকী ভট্টাচার্য তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, যেটা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেননি, তা হচ্ছে- বেগম খালেদা জিয়ার এই কয়দিনে সবচেয়ে বড় পলিটিক্যাল এচিভমেন্ট হয়েছে যে, তিনি তাঁর কর্মীদের কাছে 'ম্যাডাম' থেকে 'মা'তে উন্নীত হয়েছেন। বেগম জিয়াকে আর কর্মীরা ম্যাডাম বলে ডাকে না, 'মা' বলে ডাকে। এই উত্তরণের রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

এই উত্তরণের কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেগম জিয়া যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন সেই উচ্চতা ছোঁয়া আর কারো জন্য সম্ভব কি না, তা সন্দেহের বিষয়।'

তিনি লিখেছেন, "আমাদের কালচারে মাতৃমূর্তি খুব পাওয়ারফুল একটি প্রপঞ্চ। আমরা দেশকে মায়ের সন্মান দেই। আমরা সবচেয়ে অনুগত মায়ের। সেই সন্মানের জায়গা যদি একজন পলিটিক্যাল লিডারকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাঁর শক্তি হয়ে উঠতে পারে অকল্পনীয়।"

পিনাকী মনে করেন, আমাদের মায়েরা কষ্ট সহ্য করেন, মুখে কিছু বলেন না; হয়তো নীরবে অশ্রুপাত করেন। বেগম জিয়াকে যতই কষ্ট দেওয়া হবে, তাঁর কর্মীরা আরো বেশি করে তাঁকে মাতৃমূর্তির সাথে রিলেইট করবে। তাঁরা মনে করবে, মা নিশ্চয় নীরবে অশ্রুপাত করছেন। মায়ের সেই অদৃশ্য কল্পিত কান্না, তাঁদের বুকে ক্রমাগত শেলের মতো বিঁধতে থাকবে।

তিনি আরও লিখেছেন, বিএনপি নিশ্চয় আওয়ামী লীগকে ধন্যবাদ দিতে পারে। খালেদা জিয়ার গায়ে কালি লাগাতে গিয়ে উল্টা খালেদা জিয়াকে তাঁরা এক অনন্য উজ্জ্বল মাতৃমূর্তিতে উন্নীত করে দিয়েছে, যেই উচ্চতায় বেগম জিয়ার আশপাশে আপাতত আর কেউ নেই।

বিএনপি নেতা মেজর আখতারুজ্জামান রঞ্জন বলেন, এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ বেগম খালেদা জিয়া শেষ ক্ষমতায় ছিলেন ২০০৬ সালে। এখন ২০১৮। গত বারো বছরে একটা নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়ে গেছে। ৯০-এর দশকে যে শিশুটির জন্ম হয়েছে তারা এখন তরুণ। তাদের কাছে বেগম খালেদা জিয়া অবশ্যই মা। এই প্রজন্মটির কাছে বেগম খালেদা জিয়া শুধু মা নয়, মায়ের চেয়েও বেশি।

তাদের রাজনীতি চিন্তা, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, তাদের চাকরিবাকরি, তাদের সব কিছু তো মাকে নিয়েই। আমাদের সমাজে মা হলো সব কিছু। আজকের তরুণ সমাজের কাছে বেগম খালেদা জিয়া স্থান করে নিতে পেরেছেন। এবং দেশের তরুণ প্রজন্ম বেগম খালেদা জিয়াকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। এটাই তো স্বাভাবিক। এখানেই খালেদা

জিয়ার যত উত্তরণ। আজকের তরুণদের কাছে তিনি মা। কাজেই মায়ের জন্য তারা তো নড়বেই। লড়ার যে পথটা সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো বেগম খালেদা জিয়া আজকে এ প্রজন্মের মা হতে পেরেছেন।

খালেদা জিয়া কারাবন্দি হওয়ার আগেই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যেও খালেদা জিয়াকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি তার বক্তেব্যে বলেছিলেন- সমস্ত কর্কশে, কঠিনে, সিমেন্টে, কংক্রিটে, ইটে, কাঠে, পীঠে, পাথরে, দেওয়ালে দেওয়ালে বেজে উঠেছে এক দুর্বার উচ্চারণ, এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনী আমার নেত্রী আমার মা বন্দী হতে দেব না।

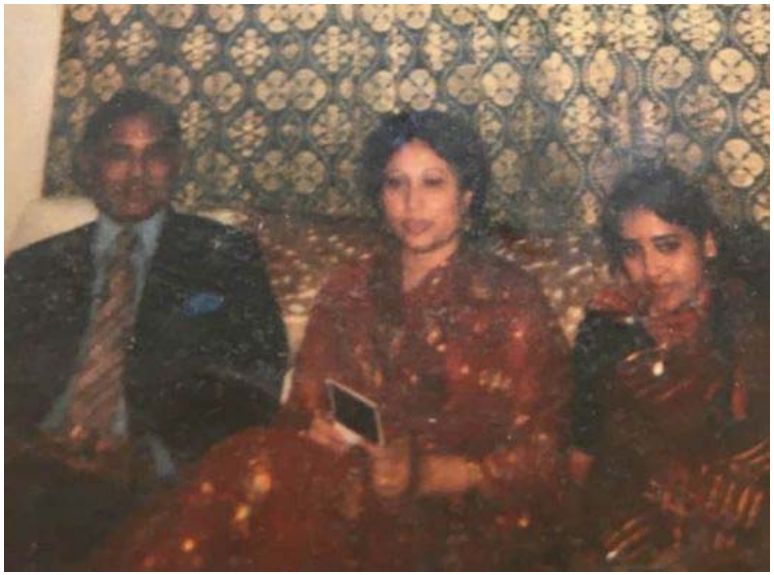

অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও খালেদা জিয়া গ্রেফতার হওয়ার দিন বলেছেন, বিএনপি নেতাকর্মীরা বেগম খালেদা জিয়াকে মায়ের মতো সম্মান করে, তাই তাদের ক্ষোভ থাকাও স্বাভাবিক।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ১৫ আগস্ট, ২০১৯

শীর্ষ খবর ডটকম

একটি ঘোষণা, একজন মেজর জিয়া এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম

একটি ঘোষণা : আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৭১ সালের এই দিনে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে। সেই ঘোষণাটি ছিল বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত মেজর জিয়াউর রহমান তখন চট্টগ্রামের ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামে চালানো নির্বিচার গণহত্যার খবর পেয়ে তিনি নিজ ব্যাটালিয়নসহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাৎক্ষনিকভাবে এবং পরদিন ২৬ মার্চে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে নিজেকে হেড অফ দ্য স্টেট বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বর্ণনা করে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই ঘোষণায় তিনি তার নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে বলেও জানান দেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শিরোনামের অধ্যায়ে ২৬ মার্চ পর্যন্ত উদ্ধৃত ছিল.. Yahya Khan left Dacca abruptly on 25 March 1971 and Tikka Khan let loose his reign of terror the same night. The next day, while the whereabouts of Mujib remained unknown, Major Ziaur Rahman announced the formation of Provisional Government of Bangladesh over Radio Chittagong.

অর্থাৎ 'ইয়াহিয়া খান হটাৎ করেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন এবং টিক্কা খান সেই রাতেই তার সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। পরদিন যখন মুজিবের খোঁজ অজানা তখন মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম

বেতার থেকে অন্তবর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মিত্রবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটে উদৃত এই অনুচ্ছেদটির ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ওই ঘোষণাটি পরবর্তী সময়ে একদিন পর ২৭ মার্চে তৎকালীন বাস্তবতার নিরিখে যথোপযুক্তভাবে সংশোধন করে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বারবার প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণাকে রাজনৈতিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য ও ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে '…On behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman…' কথাটি ইংরেজি সংস্করণের সংশোধিত ঘোষণায় সংযোজন করেন। এই সংশোধিত ঘোষণাটি বাংলায় ছিল... প্রিয় দেশবাসী, আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সব স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান আমাদের ন্যায়যুদ্ধে সমর্থন দিন এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত।' এই বাস্তবানুগ সংশোধনীর ফলে ২৭ মার্চের সংশোধিত ঘোষণাটি ২৬ মার্চের প্রথম ঘোষণার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল এবং সারাদেশে এমনকি বিশ্বজুড়ে তা বিপুলভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

২৬ মার্চের প্রথম ঘোষণায় মেজর জিয়া নিজেকে অন্তর্বতীকালীন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের হেড অফ দ্য স্টেট বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা করলেও সংশোধিত ঘোষণায় নিজেকে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর অন্তর্বতীকালীন প্রধান (Provisional Commander in Chief of Bangladesh Liberation Army) হিসেবে ঘোষণা করেন। সংশোধিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে রাজনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সহ প্রয়োজনীয় সবগুলো উপাদানই সুচিন্তিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে তা যেমন যুক্ত করা আছে, আক্রান্ত দিশেহারা দেশবাসীর প্রতি দুশমনদের প্রতিহত করার এবং দলে দলে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়ের প্রতি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি ও ন্যায়যুদ্ধে সমর্থনের আবেদনও জানানো হয়েছিল। এভাবে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ২৭ মার্চ এসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং বিপন্ন দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সমপ্রদায় উভয়কেই এর মাধ্যমে যথাযথভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তাটি পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

একজন মেজর জিয়া : সেই দিশাহীন সময়ে গ্রহণযোগ্য কারোর কাছ থেকে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণার খুবই প্রয়োজন ছিল। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল দিকনির্দেশনার। তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে স্বাভাবিক হত যদি সেই সময়ের প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই দিতে পারতেন সেই ঘোষণাটি। সেক্ষেত্রে হয়ত আজ ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারত। নির্বিচার গণহত্যাও হয়তবা সেক্ষেত্রে এড়ানো যেত। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হলেন। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতার আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অথচ সেই দরকষাকষির আলোচনার আড়ালে যে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে তা তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেননি। যদি বিবেচনায় নিতেন তবে হয়ত আত্মরক্ষা তথা সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেত। তার রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন একপর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপলাভ করলে করণীয় কি হবে, তা কি তিনি জানতেন? তার নেতৃত্বে পরিচালিত রাজপথের আন্দোলন ও অসহযোগ কর্মসূচির বিপরীতে যদি সশস্ত্র আঘাত এসে পড়ে তবে তার পাল্টা ব্যবস্থাই বা কি হতে পারে, তা কি তিনি ভেবে রেখেছিলেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এমন সব জরুরি বিষয়ে তার কিংবা তার দলের কোন যথাযথ বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছিল না।

ফলে যখন পূর্ব পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল এবং এক সময় সার্বিক পরিস্থিতি শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল তখন তিনিসহ তার দলীয় নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। ২৫ মার্চ রাতে নিজ গৃহে অবস্থান করে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণের মত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত না নিলেও তিনি পারতেন। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবিতে উন্মুখ জাতি যখন পাকবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল তখন স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বও তিনি দিতে পারতেন। কিন্তু যা করা উচিত ছিল তিনি তা করতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হলেন। তিনি গ্রেফতার বরণের পর তার পক্ষ থেকে সিনিয়র নেতাদের মধ্যে কেউ একজন এগিয়ে এসেও স্বাধীনতার ঘোষণাটি উচ্চারণ করতে পারতেন। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার বরণের আগেই সঙ্গীসাথী সবাই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুততায় পালিয়ে

সীমান্ত অতিক্রম করলেন। পেছনে পড়ে রইল সাড়ে সাত কোটি নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালি, হানাদার পাকবাহিনীর গণহত্যার সহজ শিকার হওয়ার জন্য। যারা বেঁচে গেল, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটল এদিক সেদিক।

শহর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে। এমনতর কঠিন সময়ে জাতির কি করণীয়, কে বলে দেবে তাদের? উন্নত শির এক বীর সিপাহসালার ঠিকই এগিয়ে এলেন জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে। নিজ সৈন্যদলসহ বিদ্রোহ করলেন ২৫ মার্চ রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং পরদিন ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা দিলেন 'আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।' মহান স্বাধীনতার এই ঘোষণাটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একজন আপাত অখ্যাত মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিলেন। তার অন্য সব পরিচয় ছাপিয়ে সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠল তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সংবর্ধিত করতে গিয়ে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি যথার্থই বলেছিলেন, 'Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave fighter who was the first to declare independence of Bangladesh…'

অর্থ্যাৎ...আপনার স্থান আপনার দেশের ইতিহাসে ইতিমধ্যে গ্রন্থিত রয়েছে একজন সাহসী যোদ্ধা হিসেবে, যিনি প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।'

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম : মেজর জিয়ার কণ্ঠে মহান স্বাধীনতার ঘোষণা ধ্বনিত হওয়ার পর সেই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল খুবই ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী। বিদ্যুৎগতিতে তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতি যেন এই ঘোষণার মাধ্যমে নিকষ কালো অন্ধকারে হটাৎ আলোর দিশা খুঁজে পায়। বিশেষ করে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক সামরিক কায়দায় চালানো নির্বিচার গণহত্যার বিপরীতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতেই কর্মরত একজন বাঙালি মেজর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন, তা ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙালি জাতির মনে বিশেষ সাহস জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। নিরস্ত্র একটি জাতি সশস্ত্র হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সম্মিলিতভাবে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। 'মরতে হলে কাপুরুষের মত নয়, লড়াই করেই মরব' ধরনের মনোভাব তৈরি হয়। মরণপণ লড়াই করে ঘোষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা এবং স্বাধীন দেশের মাটি হানাদার মুক্ত করার সংকল্প জেগে ওঠে। স্বনামখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম মেজর জিয়ার

স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন, 'মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে আমি নিজেও উৎসাহিত হয়েছি। গোটা জাতি উৎসাহিত হয়েছে।' মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ২৫ মার্চ রাত থেকেই সামরিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল চট্টগ্রামে। তিনি তার নিজ ব্যাটালিয়নের বাঙালি সৈন্যদলসহ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ান এবং পুলিশ ও ইপিআরে কর্মরত বাঙালিদের জড় করে এক দুর্ধষ বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তার গঠিত এই বাহিনীকেই মুক্তিবাহিনীর প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তার এই বাহিনীই চট্টগ্রামসহ এর আশপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এরই স্বীকৃতি হিসেবে পরবর্তী সময়ে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিলে তার ভাষণে বলেন, 'সর্বপ্রথম মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে এবং সেখান থেকেই মুক্ত অঞ্চলগুলো শাসিত হচ্ছে..।'

লক্ষণীয় যে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের মাটিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার আগেই ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল একজন মেজর জিয়ার ঘোষণার মাধ্যমে। বস্তুত তার স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল এই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম সনদ (Birth Certificate)। এই জন্ম সনদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতারা সংগঠিত হয়ে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় নানা আনুষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলেন। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় হানাদারমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই প্রতি বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। এই দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদিন এবং সে কারণে এই দিনটি বিশেষভাবে একজন মেজর জিয়ার। এই দিনে অবিরামভাবে বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে গমগম করে যেন বাজে তার সেই অনন্য ঘোষণাটুকু 'আমি মেজর জিয়া বলছি। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি..।'

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শীর্ষখবর

দ্বি তী য় প র্ব

সায়েক এম রহমান

উপদেষ্টা সম্পাদক

সূ চি প ত্র

দ্বি তী য় প র্ব : সায়েক এম রহমান

- মাতৃভুমি 'মা' তুমি জবান খুলো ॥ ৯৯
- রোহিঙ্গা ও বিশ্ব মানবতা ও শেখ হাসিনা ॥ ১০৩
- বেগম খালেদা জিয়ার ২০৩০-ই আজ এদেশের মানুষের মুক্তির ভিষণ ॥ ১০৮
- বসন্তের ফুল ফুটুক আর নাই-ই ফুটুক, আজ জেগেছে এই জনতা ॥ ১১৩
- পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য জন স্রোতে বেগম খালেদা জিয়া ॥ ১১৮
- প্রসঙ্গ : 'হাওয়া ভবন' ॥ ১২২
- দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হাজির ॥ ১২৭
- খেলার কার্ড এখন জনতার হাতে, আরেকটি পতনের অপেক্ষায় জাতি ॥ ১৩২
- রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ, ওরা-ই লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মা! ॥ ১৩৮
- হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের দেশ, 'আজকের বাংলাদেশ' ॥ ১৪২
- খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা মানে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা, খালেদা-ই গণতন্ত্রের প্রতীক ॥ ১৪৭
- এ কোন হিংস্রতা, বর্বরতা! এর শেষ কোথায়? ॥ ১৫১
- একজন গণতন্ত্রের প্রতীককে প্যারোলে মুক্তি নয়, জামিনে মুক্তি-ই তার অধিকার ॥ ১৫৭
- যদি হতে পার কবি নজরুলের মতো 'আমি সৈনিক' তবেই মুক্ত খালেদা জিয়া, তবেই মুক্ত এদেশের গণতন্ত্র ॥ ১৬১
- একজন প্রধানমন্ত্রী ও একটি ফোনালাপ, ইতিহাসের কালো পাতায় রক্ষিত থাকবে আজীবন ॥ ১৬৪
- একজন তারেক রহমান ও একটি অগ্নি ঝরা বক্তব্য ॥ ১৬৭
- মজলুম মাহমুদুর রহমান রক্তাক্ত হননি, রক্তাক্ত হয়েছে দেশ ও জাতির বিবেক ॥ ১৭১
- একজন মইনুল হোসেনকে আর কত? আওয়ামী ফ্যাসিজমের শেষই বা কোথায়? ॥ ১৭৪
- একটি "গণবিস্ফোরণ" এখন সময়ের ব্যাপার ॥ ১৭৭
- একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও কালো অধ্যায় ॥ ১৮০
- শুধু নিরাপদ সড়ক নয় নিরাপদ রাষ্ট্রও চাই ॥ ১৮৫
- আজ বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশ ॥ ১৮৯
- জিয়া তুমি স্বাধীনতা : জিয়া তুমি অম্লান ॥ ১৯১
- 'করোনা' হোক মানবজাতির এক মহান শিক্ষা ॥ ২০১
- "খেতাব সরানো যাবে, কবরও সরানো যাবে, কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা জিয়া কি সরানো যাবে" ॥ ২০৪

মাতৃভুমি ‘মা’ তুমি জবান খুলো

এক

হে ৫৬ হাজার বর্গ-মাইলের প্রিয় মাতৃভুমি ‘মা’! আজ তুমি এক মহা-ক্রান্তিকাল পার করে যাচ্ছ। নেই স্বাধীনতা, নেই সার্বভৌমত্ব, নেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। চলছে অন্যায়-অবিচার, খুন-গুম, ধর্ষণ, ডাকাতি ও ক্রস ফায়ার। বাতাসে ভাসছে মানুষের লাশের গন্ধ, কানে আসছে ক্রন্দনের সুর। একাত্তরে রাত দুপুরে কেহ দরজা ধাক্কা দিলে বা কড়া নাড়লে, ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করা হতো কে? ওপাশ থেকে উত্তর আসতো আমরা পাকিস্তানি মিলেটারি। আজ স্বাধীনতার ৪৭ বৎসর পর ২০১৮ তে রাত দুপুরে কেউ দরজা ধাক্কা দিলে বা কড়া নাড়লে, ঠিক তেমনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কে? ওপাশ থেকে উত্তর আসে আমরা ডিবি পুলিশ। অতপর পড়তে হয়...লা-হাওলা কুয়াতা...আলি-উল-আজিম। হে মাতৃভূমি ‘মা’, হে জন্মভূমি ‘মা’, তোমার কোলে জন্ম নেওয়া, তোমার বীর সন্তানেরা ৫৬ হাজার বর্গ-মাইলের মাতৃভূমির...স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে, শহীদ হয়েছে, বারংবার। তোমার বীর সন্তানদের রয়েছে গৌরবের ইতিহাস, সম্মানের ইতিহাস। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে, ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭০, ৭১ ও ৯০ এর ইতিহাস। এ-সবই গৌরবের ইতিহাস, সম্মানের ইতিহাস, কৃতিত্বের ইতিহাস। যার ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

শতকরা ৯০ জনের উপরে মুসলিম বাসযোগ্য দেশ। রাষ্ট ধর্ম ও ইসলাম। জনসংখ্যার দিক দিয়ে দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ, এই বাংলাদেশ। এত সব গৌরব, সন্মান ও কৃতিত্বের অধিকারী তুমি মাতৃভূমি ‘মা’। এ সব অর্জন প্রায় সত্তর বৎসরের অর্জন। এই সব অর্জন আজ গভীর ষড়যন্ত্রে নিমজ্জিত। আর নিশ্চুপ নয়, আর দেরী নয়, হে মাতৃভূমি ‘মা’ হে জন্মভূমি ‘মা’ তুমি জবান খুলো।

দুই

২৬ জুন, ২০১৮ রাজধানী যখন ঘুমিয়ে ছিল, গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায় মধ্য রাতের পর অনুমানিক রাত তিনটার দিকে, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজর (অবঃ) মিজানুর রহমান সাহেবের বাসায় প্রিয় মাতৃভূমির এক বীভৎস চেহারা ফুঠে উঠল সারা জাতির সামনে। সেই বাসার ভিতর থেকে কিছু মহিলার ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনা যাচ্ছিল। তারা সবাই ভয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে আর্তনাদ করছিলেন...আর দোয়া পড়া শুনা যাচ্ছিল...লা-হাওলা কুয়াতা...আলি-উল আজিম! মেজর (অবঃ) মিজান সাহেবের সৌভাগ্য তাঁহার মেয়ে রাসমিয়া অসীম সাহসী একজন কন্যা সন্তান। আমি তাঁহার এই ভয়ার্ত রাতের সাহসকে ধন্যবাদ জানাই। কেননা, রাসমিয়ার লাইভ ভিডিও টির সুবাদেই জাতি সম্পূর্ন ঘটনাটি জানতে পেরেছে। তিনি ডেইলী স্টার পত্রিকার একজন সাংবাদিকও বঠে। তাহার লাইভ ভিডিওটি দেখে ঐ রাতে আমি কিন্তু ঘুমাতে পারিনি। আমি সিওর অনেকই হয়তো আমার মতো ঘুমাতে পারেনি। দৃশ্যটি ছিল খুবই করুণ ও মর্মান্তিক।

দরজার অপর পাশ থেকে ডিবি পুলিশ নামধারীরা সিঁড়ির লাইট অফ করে দরজা ভাঙার জন্য আঘাতের পর আঘাত করছে, আর এ দিকে ঘরের ভিতর থেকে পিতার জীবন রক্ষার্তে, দরজায় চাপ রেখে চিৎকার করে মরণপণ ছেষ্টা চালিয়ে যাচ্চিল। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয় নাই। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে তাঁহার আব্বুকে তুলে নিয়ে যায়। রাসমিয়া বার বার চিৎকার করে বলছিলেন, “আমি ডেইলী স্টার পত্রিকার সাংবাদিক, আমার আব্বু একজন ওনেস্ট আর্মি অফিসার, ২৭ বৎসর সততার সাথে আর্মিতে সার্ভিস করেছেন। এত রাতে বাসার দরজা ভাঙছেন, সার্চ ওয়ারেন্ট দেখান। অপর পাশ থেকে ডিবি পুলিশ বলছে, “তাদের না কি কোন ওয়ারেন্ট এর প্রয়োজন নাই।” পাঠক, মেজর (অবঃ) মিজান সাহেবের মেয়ে ও ডেইলী স্টার পত্রিকার সাংবাদিক রাসমিয়া রহমান আমরিনের লাইভ ভিডিওর দরুণ সম্পূর্ন ঘটনাটি জাতি জানল। কিন্তু আরও কত শত শত ঘটনা এ ভাবে অহরহ ঘটছে, দেশ জাতি জানতে পারছে না। আমরা এখানে একজন রাসমিয়ার বাবার কথা জানছি, এ ভাবে শত শত হাজার হাজার রাসমিয়ার কান্নায় এ দেশটির আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে। হে মাতৃভূমি ‘মা’, হে জন্মভূমি ‘মা’, তুমি জবান খুলো।

তিন

দেশ এক আতঙ্কিত জনপদে পরিণত হয়েছে। মাদক অভিযানের নামে মাদকের মূল সম্রাটদেরকে জিয়ে রেখে পবিত্র রমজান মাসে বন্দুক যুদ্ধের নামে প্রায় এক শত জনকে হত্যা করা হয়েছে। কাউন্সিলার একরামুলের ক্রসফায়ারের অডিও ক্লিপে তাহার মেয়ে আর্তনাদ শুনে কার হৃদয় না শিহরিয়া উঠেছে। এ ভাবে প্রতিটি হত্যা ও ক্রস ফায়ারের ঘটনাই হৃদয় বিদারক। এই ভাবে মানুষ হত্যা করা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সোহানের মা বলছিলেন, "আমার ছেলেকে যদি মেরেই ফেলবে, তবে তার চোখ কেন তুলে নিলে? হাত কেন কেঠে ফেললে?" নয় বছরের লিজা দোকান থেকে রং-পেন্সিল কিনতে গিয়ে ধর্ষিত হয়ে লাশ পৌঁছে মায়ের কাছে। টাঙ্গাইলে দিগম্বর ছেলের সামনে মাকে ধর্ষণ। একজন বাবা তিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠের শিক্ষা গুরু হয়েও তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্র হত্যার বিচার চান নাই। কারণ তিনি বাঁচতে চান! হে মাতৃভূমি 'মা' তুমি জবান খুলো।

এদিকে গণতন্ত্রের প্রতীক, ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের আপসহীন নেত্রী, এই মুহূর্তে দেশের একমাত্র জনপ্রিয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে বন্দি করে রাখছে ফ্যাসিস্ট সরকার। স্যাঁতসেঁতে আলো বাতাস হীন ঘরে রেখে শারীরিকভাবে তাঁহাকে অসুস্থ করে ফেলা হয়েছে। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসা ও দেওয়া হচ্ছে না। এ যেন নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর মতন হীন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭৩ বছর

বয়স্ক নেতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। হে মাতৃভূমি, এ ছাড়া তোমার হাজার হাজার সন্তানদেরকে জেলবন্দি করে রাখছে এ ফ্যাসিস্ট। আজ হাজার হাজার জেলবন্দি সন্তানেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করছে, আর

বিভিন্ন মামলায় জর্জরিত হয়ে, ঘড় ছাড়া হাজার হাজার সন্তানেরা বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। আদালত তার হারানো স্বাধীনতার জন্য আফসোস করছে। হে মাতৃভুমি 'মা', হে জন্মভূমি 'মা', তোমার সন্তানেরা আজ কত ভাবে যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তোমার সন্তানদের আজ নেই কোন স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, নেই মানবিকতা ও ভোটের অধিকার। আর কত লাঞ্চিত, বঞ্চিত হবে? তার শেষই বা কোথায়? তোমার কোলে জন্ম নিয়ে কবি না বলে গেছেন...

"অসত্যের কাছে কভু, নত নাহি হবে শির, ভয়ে কাঁপে কা-পুরুষ, লড়ে যায় বীর।" হে মাতৃভূমি 'মা' জন্মভুমি 'মা', একাত্তরের মতন আবার গর্জে উঠো, একাত্তরের মতন আবার জবান খুলো। নইলে তোমার সন্তানেরা আবার পরাধীন হয়ে যাবে।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ২৮ জুন, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

রোহিঙ্গা ও বিশ্ব মানবতা ও শেখ হাসিনা

১. রোহিঙ্গা

রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি ১৪৩৩ সালে। ম্রোহং শব্দ থেকে। বেশিরভাগ ইতিহাস বিদদের মতে ম্রোহং হল, মুহাম্মদ সোলেমান শাহের শাসনকালের রামু বা টেকনাফের একশত মাইলের ভিতরে মুহাম্মদ সোলায়মান শাহের আমলের রাজধানীর নাম। এই ম্রোহং শব্দটি তখনকার মুসলমানরা লেখা ও পড়ায় রোহাং উচ্চারণ করতেন। এভাবেই রোহাং থেকে রোহিঙ্গা নামকরণ হয়।

রোহিঙ্গা আরাকানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাঙালি বসত স্থাপনকারী না। তারা হাজার বছর আগের আরাকানের স্থায়ী বাসিন্দা এখানে তা পরিষ্কার। আরও বলি, আরাকান বা আরাকানিরা বার্মার না এবং বার্মার কোন অংশও না। ইতিহাস বলে ১৭৮৪ সালে বার্মিজরা আরাকান দখল করে নেয়। যাহা আবার ১৮২৫সালে ইংরেজরা দখল করে নেয়। তাহলে এখানে হিসাবের খাতায় পরিষ্কার আরাকানে বার্মিজদের অবস্থান ৪৩ বৎসরের। এর আগে আরাকান ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। বিশেষ ভাষাভিত্তিক এই জন গোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইতিহাস আরও বলে সুলতানি আমলে কখনও কখনও আরাকান ছিল বাংলার আশ্রিত রাজ্য। আরাকানের রাজা বাদশাহরা মুসলিম নাম ব্যবহার করতেন এবং তাদের মুদ্রায়ও কালিমা অঙ্কিত ছিল। ভারতীয় ও বাঙালী ও অন্যান্যরা তখন থেকেই আরাকানে বসবাস করতে থাকে। আরাকানের রাজসভায় অনেক ভারতীয়রা স্থান পায়। যেমন মধ্য যুগীয় বাংলা কবি মাগণ ঠাকুর ও আলাওয়াল সহ অনেকেই ছিলেন।

আরাকান মুলতঃ বার্মার দখলকৃত একটি দেশ। বার্মিজরা আরাকানের ইসলামি সব পরিচিতি মুছে ফেলে দিচ্ছে। তারা রাজধানী আকিয়াবের নাম পরিবর্তন করে রেখেছে সিম্রোয়ে। ১৯৭৪ সালে রাজ্যের নাম আরাকান থেকে নাম রেখেছে রাখাইন। এই ভাবে আরও অনেক ঐতিহাসিক নাম বদল করে দিচ্ছে ১৯৮৪ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে আরাকান স্বাধীন হয় এবং ১৯৫৪ সালে বার্মিজ প্রধানমন্ত্রী উনো রোহিঙ্গাদের স্বদেশী হিসাবে ঘোষণা দেয়। অতঃপর ভোটধিকার পেয়ে ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আরাকানের ৭টি আসনে বিজয়ী হয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু ১৯৬২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর রোহিঙ্গাদের বহিরাগত হিসাবে ঘোষণা দেয় তৎকালীন সামরিক জান্তা। আর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার নাগরিকত্ব আইন করে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ভাষা না জানলে এবং আরও কিছু শর্ত লাগিয়ে দেয়, (যাহা পূরণ করতে সম্ভব না হয়) অর্থাৎ এই শর্তগুলা পূরণ করতে না পারলে রোহিঙ্গাদের অবাধ বিচরণ, রাজনৈতিক অধিকার এবং সম্পত্তি অর্জনের অধিকার বাতিল করা হয়। এই হল সংক্ষেপে মিয়ানমার সামরিক জান্তা সরকারের হাজার বছরের স্থায়ী বাসিন্দা রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করার ঘৃনিত পলিসি।

পাঠক, ওরা ভাষার পরিচয়ে বাঙালি হতে পারে কিন্তু তারা আরাকানের অবৈধ বসতি স্থাপনকারী না। রোহিঙ্গা হল হাজার বছরের আরাকানের স্থায়ী বাসিন্দা। বরং বার্মিজরাই অবৈধ। বার্মিজরাই অবৈধ দখলদার বাহিনী।

আজ হাজার বছরের রোহিঙ্গা শব্দটি একটি চিৎকার, একটি কম্পন! আজ রোহিঙ্গা মানেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ইতিহাস, গলা কেটে হত্যা, ধর্ষণের পর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা, হাতুড়ি দিয়ে পিষিয়ে হত্যা, স্বামী-স্ত্রীকে উলঙ্গ করে গাছে বেঁধে হত্যা। মানুষ মানুষকে যে হত্যা সিনেমায় দেখালো অসম্ভব, সে হত্যা মিয়ানমারের বর্বর সেনা বাহিনী ও মগদের ছারা দেখানো হয়েছে। বিশ্বের নিকৃষ্টতম মিয়ানমার

সেনা ও মগদের অত্যাচারে রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিয়েছে। রোহিঙ্গারা আজ হাজার বছরের ভিটে মাটি ধনসম্পদ সব কিছু ছেড়ে জীবন বাঁচাতে বেশির ভাগ ছুটে আসছে বাংলা দেশে।

২. বিশ্ব মানবতা

প্রশ্নগুলো কিন্তু মানবিকতার, শুধু ধর্মের নয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মানবিকতার নয়, ধর্মেরই বটে। আমেরিকায় যখন ৫১জন সমকামীকে হত্যা করা হল, তখন সাথে সাথে বিশ্ব একযোগে কালো কাপড় বেঁধে শোক প্রকাশ করল। ফ্রান্সে যখন সন্ত্রাসী হামলা হল। তাৎক্ষণিক বিশ্ব বিবেক জেগে উঠল। কিন্তু মিয়ানমারের যখন হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের হত্যা করা হয়, তখন বিশ্ব মোড়লদের ভূমিকা হয় ভিন্ন কায়দায় ● তখন বিষয়টা কি দাঁড়ায়? রোহিঙ্গারা মুসলিম তাইতো? (খুষ্টীয়ান পোপ তো বলেই গেলেন রোহিঙ্গারা মুসলিম হওয়ার হওয়াতেই রোহিঙ্গাদের উপর এমন বর্বর পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। যাহা মোটেই উচিত নয়) তাদের অপরাধ তারা মুসলিম। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে কোন ধর্মেই মানুষ মানুষকে হত্যার স্বীকৃতি দেয়নি। প্রতিটি ধর্মই মানব ও মানবতার গান গেয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় আজ ধর্মীয় মানবতা? কোথায় বিশ্বমানবতা? বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব বিবেক ও জাতিসংঘ কাদের জন্য তা এখানে পুরোপুরি পরিষ্কার।

৩. মুসলিম বিশ্ব

যখন রোহিঙ্গাদের ক্রন্দনে কাঁদছে আরাকানের আকাশ, বাতাস, কাঁদছে অসহায় শিশু ও নারী পুরুষের গগণ বিদারী আর্তনাদে সারা সারা মুসলিম জাহান, তখন সৌদি বাদশাহ সালমান ৮০ কোটি টাকার বিলাস বহুল সফর ও ভোগ বিলাসে মগ্ন মরকোতো। তখন ওআইসি সহ মুসলিম সংগঠন ও মুসলিম নেতাদের আগাইয়া আসতে দেখা যায়নি। তখন একমাত্র একজনই বিশ্বের রক্তচোষা সব দানব নেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে রোহিঙ্গাদের পাশে এসে মানবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এমিলি এরদোগান। অতঃপর রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের খবর সারা বিশ্ব মিডিয়ায় সয়লাভ হলেও এই জাতিগত নিধন ও বর্বোরোচিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনেক আগ থেকে অবগত ছিল বিশ্ব মোড়ল দেশ ও জাতি সংঘ। এখন দৃশ্যপট বলে পূর্বের ধারাবাহিকতায় রোহিঙ্গা ইস্যু ধামাচাপা দিতে ঘৃণ্য কৌশলে হাঁটছে মোড়ল দেশ ও জাতিসংঘ। এদিকে সম্প্রতি যোগ হয়েছে চীনের মুসলমানদেরকে পবিত্র কোরআন শরীফ ও জায়নামাজ পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ। অনথ্যায় তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

বিশ্ব মুসলিম নেতারা যখন নিশ্চুপ তখন সেনেগালের ফুটবল তারকা একজন ব্যাক্তি 'দেম্বাবা' নিদের্শনার প্রতি উত্তর টুইট করে তার ইমানি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। টুইটে তিনি বলেছেন যদি তারা জানত যে, মুসলিমরা মেঝেতে নামাজ পড়তে পারে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলিম কোরআন না খুলে মুখস্থ পড়তে পারে, তখন সম্ভবতঃ টীন কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের হৃদপিণ্ড তাদের কাছে খুলে দেওয়ার আদেশ দিত ●

কিন্তু এখন প্রশ্ন মুসলিম বিশ্বনেতা এবং মুসলিম বিশ্ব সংগঠন আজ কোথায়? কোথায় মুসলিম বিশ্ব বিবেক? এসব অপদার্থ নামধারী মুসলিম শাসক ও তাবেদার পাগড়িওয়ালাদেরকে ধিক জানাই, তাদেরকে মুসলিম জনরোষে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

৪. শেখ হাসিনা

যখনই এমিলি এরদোগান নির্যাতিত রোহিঙ্গাদেরকে দেখার জন্য পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসলেন আর তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশ ত্রাণ যাত্রা শুরু করল লক্ষ করে থাকবেন ঠিক তখনই হাসিনা সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুতে হঠাৎ গিয়ার চেইনজ করে রোহিঙ্গাকে পুঁজি বানিয়ে বিভিন্ন ফায়দা লুটার চেষ্টায় রত হলেন।

জাতি দেখেছে প্রথম দিকে আরাকানের অসহায় নারী পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুদের আর্তনাদে কাঁপছিল সারা জাহান তখন এ অসহায় মানুষরা মুসলিম দেশ জেনে পাগলের মতো ছুটে আসছি বাংলাদেশের দিকে একটু আশ্রয় চেয়েছিল শুধু বাঁচার জন্য। সারা জাতিও ছিল তাদের আশ্রয়ের পক্ষে কিন্তু হাসিনা সরকার তখন তাদের পুষব্যাক করেছিল। অনেক নৌকা পাড়ে না তোলায় মানুষ সহ ডুবে মরছিল। এখানেই ক্রান্ত নয় ভারত ও মিয়ানমারের মতো বাংলাদেশ থেকে তাদের উপর গুলি পর্যন্ত করা হয়েছিল। এমনকি সুঁচি ও মোদির সাথে সুর মিলিয়ে

রোহিঙ্গাদেরকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার আচরণ আবার দরদে ভরপুর এখন শেখ হাসিনা বড়ো গলায় বলছেন ষোল কোটি মানুষকে তিনি খাওয়াতে পারলে, দশ লাখ মানুষকে কেন খাওয়াতে পারব না। মানুষজন এখন বলছে সবই মতলব, এসবই ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতা পূর্ণ।

তাই আজ হাসিনা সরকার প্রায় পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় দিয়েও বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত না হয়ে হয়েছেন লজ্জিত। কারণ, প্রথমতঃ দ্বিচারিতা, অপকৌশল ও নতজানু পররাষ্ট্র নীতি।

দ্বিতীয়ত : আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তার সরকারের অগ্রহণ যোগ্যতা।

লক্ষণীয় শেখ হাসিনা সদ্য যুক্তরাষ্ট্র সফরে বিশ্ব নেতাদের কাছে হয়েছেন অপমানিত এবং যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশ ও বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে হয়েছেন লাঞ্ছিত।

পাঠক, হাসিনা সকারের দ্বিচারিতা, অপকৌশল ও নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে জাতি আতঙ্কিত। ষোল কোটি লোককে খাওয়াতে পারি আর দশ লাখ লোককে খাওয়াতে পারব না কেন? এটা ঠিক নয়। খাওয়ানো সমস্যা সমাধান নয়। সেইফ জোন ও সমস্যা সমাধান নয়।

সমস্যা সমাধান হলো, রোহিঙ্গাদের তাদের ভিটে মাটিতে দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে ফেরত পাঠানো। যেভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে দক্ষ কূটনীতিকতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও তাহার আমলে যেমনি রোহিঙ্গাদের পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন শেখ হাসিনা কি পারবেন বা পেড়েছেন?

প্রকাশকাল : ৩০ এপ্রিল ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

বেগম খালেদা জিয়ার ২০৩০-ই আজ এদেশের মানুষের মুক্তির ভিষণ

দরজা জানালা খোলা রেখে এসি চালালে কি লাভ? ঘর ঠাণ্ডা তো হবেই না। মাঝখান থেকে হু হু করে কারেন্টই পুড়বে। গরম থেকে রেহাই দুরস্ত। এমন খামখেয়ালি কাজ মানা যায় না।

বাংলাদেশের বানিজ্যে এমনটিই হচ্ছে। রপ্তানিতে যত আয়, তার চেয়ে ব্যায় বেশি। আয়ের ৮০ শতাংশ ছিদ্র পথে চলে যাচ্ছে। ঠেকাবে কে? সর্ষের মধ্যে যে ভূত! অভিযোগের আঙুল কাস্টমস আর ব্যাংক কর্মকর্তাদের দিকে। রপ্তানি সংস্থার মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে তারা অর্থ নির্গমনের পথ চড়া করছেন। টাকা বৈভবে আহলাদে আটকানা। প্রাপ্য রসদ থেকে বঞ্চিত হয়ে শীর্ণ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। দোষটা শুধু বাংলাদেশেরই নয়। যারা নিচ্ছে তাদেরও। কৃষ্ণবর্ণের অর্থের অনুপ্রবেশ দায়িত্ব তারা এড়ায় কি করে? অপরাধ ভারতেরও। সেখানে চাড় ফেলে পাচার হওয়া টাকা ঘড়ে তোলার অভাব নেই। সরকারি স্তরে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে ঠেকানো যাচ্ছে না কেন? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আসলে অর্থ স্রাবী আগ্নেয়গিরির লাভা শ্রোতের লোভ থেকে উত্তির্ন হওয়াটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এভাবে পাওয়া টাকাটা খারাপ টাকা। খারাপ টাকা ভালো কাজে নয়। খারাপ কাজেই লাগে। সন্ত্রাসীরাও এ টাকার প্রতিক্ষায় থাকে। যে দেশেই তারা থাকুক। তাদের প্রথম লক্ষ্য সে দেশের অর্থনীতির ভীত ভেঙ্গে চুরমার করে নিজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি এবং নাশকতায় সক্রিয় হওয়ার সহজ রাস্তা সেটাই। ভারত ছাড়া আরো ৩৬টি দেশ বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ভোগ করছে।

পাঠক, এই কথাগুলো আমার নয়। এই কথাগুলি ভারতের কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার, ৬ মে ২০১৬। শিরোনামটি ছিল, বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়ার অর্থ ভোগ করছে ভারত, আমেরিকাও।

পত্রিকাটি আরও লিখছিল, তাতে বুঝাই যাচ্ছে, টাকা পাচারের রেকর্ড নেহাত ছোটো নয়। এত বড় চক্র একদিনে গজায়নি। ধীরে ধীরে ডানা ছড়িয়েছে। এইসব দেশকে সাবধান করার দায়িত্ব বাংলাদেশের। অর্থনীতিক ক্ষতিটা তাদেরই বইতে হচ্ছে। রপ্তানি বানিজ্যে বাংলাদেশের সব চাইতে বেশি আয় পোষাক শিল্পে। রপ্তানীর ৮২ শতাংশ তারাই করে। পাচার চক্রে তারাই যুক্ত।

গত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৪৯ হাজার ১৩ কোটি ডলার। বাংলাদেশের ঊর্ধ্বমুখী অর্থনীতিকে টান মেরে নিচে নামানোর চেয়ে জগন্য কাজ আর কী হতে পারে? যাদের জেলখানার ভিতরে থাকার কথা, তারা বাইরে ঘুরে বেড়ায় কি করে!

পাঠক, এখানে সহজেই অনুমেয়, বাংলাদেশ আজ টাকা রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্বের শীর্ষ টাকা রপ্তানীর দেশ বাংলাদেশ। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত গত ১০ বছরে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা, জনগণের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। বড় বড় ব্যাংক যখন বলা শুরু করছে তারা পোকলা হয়ে গেছে। আর তখন সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের নেতা কর্মীদের বললেন, "আওয়ামীলীগ কে ক্ষমতায় না থাকলে, টাকা পয়সা নিয়ে পালাতে হবে।" এই বলে সারা দেশে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। পাঠক, ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকাটি বলছিল, "দরজা জানালা খোলা রেখে, এসি চালালে কি লাভ? ঘর ঠাণ্ডাতো হবেই না বরং মাঝখান থেকে হু হু করে শুধু কারেন্টই ঝলবে তারমানে আওয়ামীলীগ সরকার দেশকে আবারো বটমলেস বাস্কেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশটির ভাগ্যকাশে কালো মেঘ জমে আছে। আকাশে বাতাসে শুধু ক্রন্দন আর ক্রন্দন শুনা যাচ্ছে। খুন গুম জঙ্গি হামলায় সাধারন মানুষ বড় অসহায় হয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে শুধু মানুষের কান্না। হাওর পাড় থেকে শুরু করে গ্রাম গঞ্জ শহর তক। হাওর পাড়ের বাসিদের সারা বছরের রিজিক তলিয়ে যাওয়া এবং তাদের জীবন চলার প্রধান সম্ভল হাঁস, মাছ, মুরগি ও গবাদি পশু বিষক্রিয়ায় মরতে শুরু করায় কান্নাভরা কক্তে আকাশের প্রাণে তাকিয়ে মহান আল্লাহর কাছে আহাজারি করছে। শুধু বাঁচার জন্য।

যখন নিজ দেশের সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে সরকার বিশ্ব রেকর্ড করে বসে আছে। যখন, হাওর পাড়ের কোটি কোটি মানুষ তাদের সব কিছু হারিয়ে এক ক্রান্তিকাল পার করছে। ঠিক তখন নির্বাকভাবে

জাতি দেখলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কক্সবাজারের সমুদ্র ভ্রমন! খালি পায়ে সমুদ্র সৈকতে হাঁটা, সাথে হাঁটছে ইয়াবা সম্রাট বদি। সংবাদ মাধ্যমগুলো তেলে তেলে আবেগী ভাষায় লিখতে থাকলো আর পত্রিকার শিরোনামের প্রতিযোগীতায় নেচে উঠলো। সেদিনকার মজার ব্যাপার হলো, সেখানে দলীয় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন, "কক্সবাজারে একটা বদনাম আছে। এখান থেকে নাকি ইয়াবা পাচার হয়? ইয়াবা পাচার বন্ধ করুন। যারা ইয়াবা পাচারে জড়িত, তাদের চিহ্নিত করতে হবে। তারা যতবড় শক্তিশালী হোক, ছাড় দেওয়া হবে না। কারণ তারা দেশের জন্য অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি।"

কিন্তু এ কথাগুলো বলার কিছুক্ষণ পরেই প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইয়াবা ব্যবসায়ীকে, দেশের বড় বদনামী ব্যক্তিটাকে সাথে নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণ করেন। তখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের হাসির খোরাক হয়ে যান।

ঠিক একইভাবে তার সপ্তাহ দিন আগে যখন সুনামগঞ্জের বন্যা কবলিত মানুষদেরকে দেখতে গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তখন শাল্লার জনসভায় বলেছিলেন, বাঁদ নির্মাণে অনিয়মকারী ঠিকাদারদেরকে কোন ভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। তখনো কিন্তু অনিয়মকারী সিন্ডিকেড গুপের অনেকেই মঞ্চে ছিলেন। এবং সাধারণ মানুষের হাসির খোরাক যুগিয়েছিলেন। যদিও পরে বাধ নির্মাণের অভিযোগে ১১টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে তলব করেছে দুদক। এখন দেখার বিষয় দুদক ওয়াসিং মেশিন এর ভূমিকা পালন করে নাকি সত্যিকার ভাবে অপরাধকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করে।

ফ্যাসিবাদী সরকারের কবলে পড়ে দেশ যখন এক মহাক্লান্তিকাল পার করছে। আজ এক এক করে ১০টি বছরে দেশের মানুষ যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মহাসংকটের ভারে দিশেহারা ও শ্বাসরুদ্ধকর আর প্রধানমন্ত্রী যখন সমুদ্র ভ্রমণে ব্যস্ত ঠিক তখনই বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ২০৩০ ভিশন নিয়ে আসেন। রাজনীতিতে নতুন ধারা ও অর্থনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি সম্মিলিত একটি রূপকল্প তুলে ধরেন। ১০ মে ২০১৭, ৪টা ৫৫ মিনিটে রাজধানী হোটেল ওয়েস্টিন থেকে। চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ২০৩০ সাল পর্যন্ত দেশের জন্য ৩৬টি অধায়ে ২১১ টি পয়েন্টে, যে ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন, তাতে সবাই কে নিয়ে এক রেইনবো নেশন অর্থাৎ রঙধনু জাতি গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ভবিষ্যতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতামূলক নতুন ধারা রাজনীতি, সুনীতি, সুশাসন ও সুসরকারের প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

ভিশন ২০৩০ এর রূপকল্পে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, বিরোধী দল থেকে সংসদীয় কমিটির সভাপতি সহ ডেপুটি স্পিকার পদ। ২০৩০ সালে মধ্যে উচ্চ মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সহ মাথাপিছু আয় ৫০০০ মার্কিন ডলার করা। প্রবৃদ্ধি দুই অংকে নেওয়া। এছাড়া দেশীয় বিনিয়োগের নানা সুযোগ সুবিধা সহ প্রায় আড়াই শতাধিক দফা তুলে ধরেন।

এছাড়া বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ড ও বন্দি অবস্থায় অমানবিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো, উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের আইন, ন্যায়পাল গঠন। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে শঙ্খলা ফিরাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়ানো, বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধ, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফেরানো, পুলিশের এএসআই ও কনভেস্টলদের অভার টাইম ও রেশনের মাধ্যমে খাদ্য পুণ্য দেওয়ার পাশাপাশি সমমূল্যের অর্থ দেওয়া সহ সার্বিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়গুলো ভিশন ২০৩০তে রয়েছে। চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া আরো বলেন, "সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীয় মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য আনা হবে এবং সেই সঙ্গে গণভোট পুনশ্চপ্রবর্তন করা হবে বলে জানান।

এই ভিশনটি ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে সর্বমহলে যখন প্রশংসিত হলো, দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আর্ন্তজাতিক মহলেও প্রশংসা অর্জন করলো। তখন অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বললেন, এ যেন খালেদা জিয়ার বিনা যুদ্ধে, যুদ্ধ জয়। নেই কোন রাজপথ, নেই আন্দোলন, নেই শ্লোগান, নেই সভা সমাবেশ, শুধুমাত্র খালেদা জিয়ার ৩৬টি অধ্যায়ের ২১১টি পয়েন্টের ২০৩০ ভিশন ই অনির্বাচিত সরকারের সাড়ে আট বছরের শাক দিয়ে মাছ ডেকে যে ভাবমূর্তি গড়ে ছিল, তা বুঝি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো। অনির্বাচিত সরকার ও তাদের বড় নেতারা সেই ভাবমুর্তিটি রক্ষার জন্য উম্মাদের ভূমিকায় বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বেগম খালেদা জিয়ার গুলশান অফিস তছনছ সহ বিএনপির অফিসগুলোকে কড়া নজরে রাখা। এ যেন এক যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব! তাদের বড় নেতারা ভিশনটি পড়ে না পড়েই এ ভিশনকে

ভাঁওতাবাজি, ধাপ্পাবাজি, তামাশা ইত্যাদি বলা। বিজ্ঞমহল বলছেন দৃশ্যত এ ভিশন গণমাধ্যম এর চেয়ে আওয়ামী বড় নেতাদের দ্বারা ই বেশি প্রচার ও প্রসার পাচ্ছে। মুলত ভিশনই লাভবান হচ্ছে।

মানুষ আজ বলছে, দেশ পরিচালনায় সাড়ে আট বছরে ক্ষমতাশীল আওয়ামীলীগের দুই একটা সফলতা থাকলেও এইগুলোকে মোটেই সফলতা বলা যায় না, দৃশ্যমান কোন সফলতা নেই বললেই চলে। কারণ উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রজেক্ট হাতে নিয়ে একলক্ষ টাকার প্রজেক্টকে এক কোটি টাকার প্রজেক্ট বানিয়ে, জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে নিচ্ছেছ। তাদের রূপকল্প অনুযায়ী দশটাকার চাল, পঞ্চাশ টাকায়ও পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে চাকুরির কথা বললেও চাকুরি হয়েছে শুধু তাদের দলের নেতাকর্মীদের। তাও অনেক ঘুষের বিনিময়ে। এছাড়া দেশের মানুষের নেই জানমালের নিরাপত্তা। নারী ধর্ষণের খবর হয়েছে, সকাল বিকালের নাস্তার মতন। খুন, হত্যা, ঘুম, ও বিরোধী দলের নেতা নির্যাতন, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজিতো আছেই। ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও দফায় দফায় গ্যাস বিদ্যুতের মুল্য বৃদ্ধি এবং নতজানু পররাষ্ট্রনীতিতে বিভিন্নভাবে দেশকে পরাধীন বানিয়ে দেওয়া ইত্যাদিতে দেশ পরিচালনায় আওয়ামীলীগ সরকার সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

বিধায় আজকের খালেদা জিয়ার এ ভিশন গ্রাম, জেলা, উপজেলার চায়ের টেবিল থেকে শুরু করে, রাজধানীর পাঁচতারা হোটেল ও কূটনৈতিক পাড়া পর্যন্ত সরগরম হয়ে উঠছে। কূটনৈতিক পাড়ায় বলা হচ্ছেছ বিএনপি ২০৩০ ভিশনটি বাংলাদেশের এই ক্রান্তিলগ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগী ভিশন। যদি ও এই জাতীয় ভিশন আরো আগে নিয়ে আসার দরকার ছিল। তাই বলি, বেগম খালেদা জিয়ার এই ভিশন বা রূপকল্প এই মুহূর্তে জনতার ভিশন বা জনতার রূপকল্পে রূপ নিয়েছে। ভিশন ২০৩০ নতুন ধারার রাজনীতিতে সমৃদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিতে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য ও আরেকটি রূপকল্প এবং সাথে আন্দোলন সংগ্রাম অতীব প্রয়োজন।

রাজনীতিক গবেষকরা মনে করেন, আন্দোলন সংগ্রাম ব্যতীত অনির্বাচিত সরকারকে সঠিক নির্বাচনে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অতএব, আন্দোলন সংগ্রাম অতীব প্রয়োজন। এ ভিশন জনতার ভিশন, এ ভিশন ১৬ কোটি মানুষের মুক্তির ভিশন। তাই জনতার ইস্পাত কঠিন রাজপথের আন্দোলনেই সঠিক নির্বাচনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। জনতার বিজয় অবিশ্যই সুনিশ্চিত।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

বসন্তের ফুল ফুটুক আর নাই-ই ফুটুক, আজ জেগেছে এই জনতা

এক

ব্রিটিশের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে দুটি লাইন বলেছিলেন, আজকের দিনে সেই দুটি লাইন দিয়েই লেখাটি শুরু করলাম।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়! কিন্তু তবু হয়তো সে আমাকে শাস্তি দিবে, কেননা, সে সত্যের নয়, সে আইনের স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য!

পাঠক, গত কয়েক দিন ধরে এই ভাষার মাসটিতে দেশ এবং দেশের বাহিরে সর্বত্রই এখন শুধু একটি গল্প, একটি আলাপ, একটি শব্দ বেগম খালেদা জিয়া! ইলেকট্রনিক্স, প্রিন্ট, অন লাইন পোর্টাল এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেখানেই যান বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের জেলের গুঞ্জন। এমন কি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাটে, মাঠে, খামারে একই গঞ্জন। গ্রামের হাট-বাজারের চায়ের টেবিল থেকে শুরু করে রাজধানীর বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় এবং কূটনৈতিক পাড়ায় ও একই গুঞ্জন, একই উচ্চারণ বেগম খালেদা জিয়া। প্রত্যক্ষ করা গেছে, সাধারণ মানুষের চায়ের টেবিলের

প্রশ্ন...বেগম খালেদা জিয়ার দুই কোটি টাকার মামলায় ৫ বছরের সাজা হয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু মিডিয়া অবগত শেখ হাসিনার ১৩ টি মামলায় যে ১৫ হাজার কোটি টাকার মামলা। তা হলে সে মামলাগুলি কোথায়? আর এই দুই কোটি টাকার মামলায় যদি ৫ বছরের জেল হয়, তা-হলে ১৫ হাজার কোটি টাকার মামলায় কত বছরের জেল হতে পারে? পাঠক এ প্রশ্নগুলা আমার নয়, এ প্রশ্নগুলা সাধারণ মানুষের গুঞ্জন। সাধারন মানুষ আরো বলছে, বেগম খালেদা জিয়ার রায় হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্লজ্জের মতন বললেন, "খালেদা এখন কোথায়?" প্রথম আলোতে শিরোনাম হলো। সিরাজ সিকদারের বেলায় ও একই ভাবে শেখ মুজিব বলছিলেন, "সিরাজ সিকদার আজ কোথায়?" এখন স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে... শেখ হাসিনা এখন কোথায়? এ শিরোনাম আর কত দূর?"

দুই

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের কথিত দুর্নীতি মামলাটিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, নির্লজ্জের মতন এতিমের টাকা মেরে খেয়েছে বলে বলে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে বানোয়াট মামলার দ্বারা বিচারালয়কে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বানিয়ে, দুই শত বৎসর পুরানো পরিত্যক্ত একটি বিল্ডিংয়ে ১৮ ফুট উঁচু দেওয়ালের ভিতরে এক মাত্র বন্দি গণতন্ত্রের প্রতীক, তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি, বিশ্বসহ জাতি সে দিন অবাক দৃষ্টিতে দেখল, একদিকে যখন কথিত দুর্নীতি মামলার রায়ে বাংলাদেশের সব চাইতে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের জেল এবং তারেক রহমানসহ অন্যান্য দের ১০ বছরের জেল।

অপরদিকে তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশালের জনসভা থেকে বরিশাল বাসীর কাছে ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের জন্য নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং ভোট দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করান। ঐ সময় টিভির সামনে যারা ছিলেন রিমোটের বটম চেইঞ্জ করে ছিলেন এবং ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন।

ইতিহাস বলে...১/১১ সরকার যখন চাঁদাবাজি মামলায় আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এরেষ্ট করে আদালতে নিয়ে যায়, সেই দিন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া দুঃখ প্রকাশ করছিলেন এবং বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, শেখ হাসিনা একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নেতার কন্যা এবং দেশের একজন সন্মানিত নাগরিক, তাঁকে এই ভাবে হেনেস্তা করা ঠিক নয়। এমন কি যখন ১/১১ সরকার লন্ডন থেকে স্বদেশ ফিরতে বাধা প্রদান করেছিল সে দিন ও প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন।

আজ অবস্থা দৃষ্টিতে জনগণ ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, শেখ হাসিনা হেরে গেলেন খালেদা জিয়ার কাছে। আজ জনগনের কাছে হাসিনা খালেদা অনেক তফাৎ। কার্যত এখন খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে আটকাতে গিয়ে ক্ষমতাসীন দল নিজেই আটকে গেছে। বাস্তবতা হলো, বেগম খালেদা জিয়াকে বানোয়াট মামলায় জেলে নেওয়ায় এবং বিএনপি কৌশল অবলম্বন করে সুশৃঙ্খল ভাবে কর্মসূচি দেওয়ায় বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দল যে অঙ্ক কষে ছিল তা পুরো দমে বিপরীত হয়ে গেছে। তাই তারা আবুল তাবুল বলছেন। আপসহীন নেত্রী তাদের কূটকৌশল বুঝে ফেলছিলেন। যে জন্য একদিনের জন্য ও হরতালের পক্ষে ছিলেন না বেগম খালেদা জিয়া।

তিন

গত কয় দিনে বিশ্ব রাজনীতির বাজারে টপটেন এ নাম লিখে ফেলছেন বেগম খালেদা জিয়া। আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন ভাবে খালেদা জিয়ার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক বৃন্দ বন্দি বেগম খালেদা জিয়ার ঘটনাবলি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, "দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। কারণ সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ করে ফেলেছে যে মামলাটি শতভাগই রাজনীতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজ দেশের সর্বত্র কোটি কোটি মানুষের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে, আমার নেতা আমার মা, জেলে থাকতে দিবো না। আমার মা জেলে কেন, শেখ হাসিনা জবাব চাই।

চার

ইতিহাস বলে, আইয়ুবী কোর্ট কতৃক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ২ বৎসরের কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এ ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমান তখন ডাকাতি মামলায় ও জেল কেটেছেন।

অতএব আজ যারা বেগম খালেদা জিয়ার মিথ্যা মামলার রায়ে আনন্দ উৎসব করছেন। তারা একটু থামুন! এবং ভাবুন! কারণ সময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক! তাদের কাছে প্রশ্ন এই মামলার রায়টি যদি সঠিক বা সত্য বলে গ্রহণ করেন তা হলে আজকের শেখ হাসিনার কোর্টের রায় ও সত্য বলে ধরে নিতে পারি।

আর যদি আইয়ুবর্দীয় কোর্টের সেই মামলার রায়কে অসত্য মনে করেন।

তা হলে আজকের বেগম খালেদা জিয়ার মামলার রায় ও অসত্য ও বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ এখানে বিচারকরা ঠিকাদার ও বিচারালয়কে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। তাই আবার বলছি সময়ই শ্রেষ্ঠ বিচারক!

পাঁচ

পাঠক, আজ বিজ্ঞ মহল বলছেন, এ জাতীয় সাজার ফলে কোন ক্ষতি হবে না কারণ, বেগম খালেদা জিয়া একটি সামাজিক শক্তির নাম। অগণতান্ত্রিক সরকার চাইবে সামাজিক ও গণতান্ত্রীক শক্তি দমন করতে কিন্তু সামাজিক ও গণতান্ত্রিক শক্তি কখনও দমন করা যায় না। দমন পীড়নে সামাজিক ও গণতান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

এত নির্যাতন গ্রেপ্তার করেও সরকার থামাতে পারেনি শান্তিপূর্ণ গণজোয়ার। আজ সারা বাংলার মানুষে মুখে মুখে একটি শ্লোগান উচ্চরিত হচ্ছে, "আমার নেতা আমার মা, জেলে থাকতে দিবো না।" দেশমাতার মুক্তির দাবিতে লক্ষ কোটি একত্রে সামিল হচ্ছে। এই বাঁধ ভাঙা গণজোয়ারে যতো বাধা বিপত্তি আসবে, গণজোয়ার ততো বিশাল আকার ধারন করবে ঠিক কিন্তু

শুধু গণজোয়ার সৃষ্টি করলে হবে না। ঐ গণজোয়ারকে গণঅভ্যুত্থানের পরিণত করতে হবে। দেশ ও জাতি এ যাবৎ সব চাইতে কঠিন সময় অতিক্রম করছে। আমার ভাষায় বলব একাত্তরের চাইতে কঠিন সময়। এই মুহূর্তে দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য একমাত্র প্রয়োজন একটি গণঅভ্যুত্থান।

ব্রিটিশবিরোধী আনন্দোলনের সেই ঐতিহাসিক গানটির দুটি লাইন দিয়ে লেখাটি শেষ করতে ইচ্ছে করছে।

"বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা,

আজ জেগেছে এই জনতা"।

তাই বলছি, বসন্তের ফুল ফুটুক আর নাই-ই ফুটুক, আজ জেগেছে এই জনতা।

প্রকাশকাল : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য জন স্রোতে বেগম খালেদা জিয়া

১

১২ নভেম্বর ২০১৭। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বহুদিন পর অনুমোদন নিয়েই জনসভা করল বিএনপি।

অপর দিকে আওয়ামীলীগ সরকার রাজধানী ঢাকা অভিমুখে যানবাহন ও জনজীবন চলাচলে বাধা দিয়ে প্রমাণ করল, থালা বাটি দেবে কিন্তু ভাত দিবে না। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অঘোষিত পরিবহণ ধর্মঘট দিয়ে সারা দেশ থেকে রাজধানী ঢাকা শহরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সমাবেশগামী মানুষদেরকে আগের রাত থেকে বিভিন্নভাবে বাধা দিয়ে, গ্রেফতার আতঙ্ক চালিয়ে সমাবেশে জনস্রোত ঠেকাতে পারেনি। গণতন্ত্রকামী মানুষরা যে যার মতো করে হেঁটে হেঁটে, মিছিলে মিছিলে, যোগ দিয়ে জনসভাকে জনসমুদ্রে রূপান্তরিত করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত ওই জনসমুদ্র কোথায় শুরু কোথায় শেষ বলা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ। জনস্রোতে ভেসে যায় সব বাধা বিপত্তি ও সব ষড়যন্ত্র। লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী উজ্জীবিত হয়ে উঠে। মানুষ দেখতে পায়, "পূর্ব দিগন্তে লাল সূয্য ও জনস্রোতে বেগম খালেদা জিয়া"।

এই জনসমুদ্রের জনস্রোত থেকে বেগম খালেদা জিয়া বললেন, 'মানুষ আজ পরিবর্তন চায়'। হাসিনার অধীনে কোন নির্বাচন নয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই নির্বাচন। ইভিএম নয়, সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্টেসি ক্ষমতা দিতে হবে। আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি চাই না, দেশের উন্নয়নে বিএনপি

ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাজ করতে চায়। সাহস থাকলে একই স্থানে সমাবেশ করুন, দেখা যাবে কার সাথে কত জনগণ। আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী। প্রধান বিচারপতিকে জোর করে বাইরে পাঠানো হয়েছে। এজেন্সির লোক দিয়ে জোর করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের চাকরি যাবে না। দক্ষ ও যোগ্যদের মূল্যায়ন করা হবে। আরও বললেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রে মতো পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু দেশ ও জনগণের কল্যানে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে যথেষ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে কিন্তু তৃণমূল নেতাকর্মীরা চেয়েছিলেন তাঁহার বাক্য উচ্চারণ আরও আন্দোলনমুখী হবে। কারণ তাদের বিশ্বাস এই অবৈধ সরকারের কাছ থেকে আন্দোলন ব্যতীত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

২

প্রায় এক যুগ ক্ষমতার বাহিরে থাকা সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিনা ভোটের সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে রাখা, জনসম্মুখে না আসতে দেওয়া, ইট ও বালুর ট্রাকে বন্দি করে রাখা, বিধবা পুত্র বধূ ও নাতনীদেরকে নিয়ে যখন পুত্র হারানোর বেদনায় শোকহত, ঠিক তখন তাহার উপর মামলা দায়ের করা, এমনকি বিদ্যুৎ ইন্টারনেট লাইন পর্যন্ত কেটে দেওয়া, অনর্থক প্রতি সপ্তাহে দুই তিন বার করে কোর্টে লেফট রাইট করানো এবং মিছিল মিটিং সমাবেশ এমনকি মানব বন্ধন পর্যন্ত করতে না দেওয়া ইত্যাদিতে দেশ নেত্রীর জন্য জনগণের ভালোবাসার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ যেন এক অন্য রকম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে।

তারই সদ্য জলন্ত প্রমাণ সড়ক পথে ঢাকা থেকে কক্সবাজার ও উখিয়া গমনে পুরো রাস্তায় লক্ষ লক্ষ জনতা শত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, ভালোবাসা দেখিয়েছে, তাঁহার পুরো যাত্রা পথকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়েছেন। এ যেন স্বপ্নকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। লক্ষ কোটি জনতার জনস্রোতে মিশে গেছেন বেগম খালেদা জিয়া।

সেই দিন বেগম খালেদা জিয়ার বহরে হামলা হওয়ার কারণে সরকারি দল আওয়ামীলীগকে সারা জাতির কাছে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। মানুষজন বলছে, তারা খালেদা জিয়াকে লাঞ্ছিত করার জন্য যতই মরণ কামড় দেউক কিন্তু লাভ হবে না কারণ জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। জাতি আজ নিজ কাঁধে তোলে নিয়েছে বেগম জিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব। প্রতিটি মানুষ আজ গণতন্ত্রের রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়েছে।

আরেক প্রমাণ, চিকিৎসা শেষে তিন মাস পর লন্ডন থেকে ঢাকা আগমনে বেগম জিয়াকে স্বাগতম জানাতে বিমান বন্দর থেকে গুলশান পর্যন্ত তিল ধারণ করার মতো জায়গা ছিল না। শুধু মানুষ আর মানুষ। সেই দিন সরকার স্ট্রীট লাইট অফ করে দিয়েছিল কিন্তু তাতে কি? সেই দিন ঢাকার রাজপথে এক অভিনব দৃশ্য দৃশ্যায়িত হয়েছিল। দলের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী তাদের মোবাইলের আলো দ্বারা তাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আলোকিত করে গুলশানে পৌঁছে দিয়েছিল। সেদিন লক্ষ কোটি মানুষের ভালোবাসায় শিক্ত হয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। এসব যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

৩

সব মিলে আজ সারা বাংলার রাজপথে রাজপথে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গণ আন্দোলনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বঙ্গপোসাগরের তর্জন ও গর্জন। ক্রমেই দৃশ্যায়িত হচ্ছে উল্লাসিত জনতার সেই নব্বই এর স্বৈরাচার

বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। এই উত্তাল জনসমুদ্রের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐতিহাসিক জনস্রোতগুলো আর আটকাবে কে? অবৈধ সরকারের বর্বরতার ও নির্মমতার জবাব দিবে বাংলাদেশ। এখন প্রয়োজন শুধু নির্বাচনের রূপরেখা প্রদান করা। এবং নিরপেক্ষ একটি সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন আদায় করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা। বাংলাদেশ এখন পুরোদমে প্রস্তুত। তাই বলছি পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য আর জনস্রোতে বেগম খালেদা জিয়া।

প্রকাশকাল : ১৫ নভেম্বর ২০১৭

শীর্ষ খবর ডটকম

প্রসঙ্গ : 'হাওয়া ভবন'

এক

'হাওয়া ভবন' অবশ্যই অনেকেই অবগত। তারপরও জেনে নেই 'হাওয়া ভবন' কী? 'হাওয়া ভবন' হলো, বিএনপি চেয়ার পারর্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়। এই বহুল আলোচিত সমালোচিত 'হাওয়া ভবনের' মালিক সিলেটের বাসিন্দা, যুক্তরাজ্য প্রবাসী আশেক আহমদ আশুক। আশেক আহমদ আশুকের আরেকটি পরিচয় তিনি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনার খুবই ঘনিষ্টজন। যে কারণে শেখ হাসিনা নিজ উদ্যোগে ২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারির কাউন্সিলে আশেক আহমদকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কোষাদক্ষের পদে বসিয়েছেন। ২০১০ সালের পর আর কোন কাউন্সিল না হওয়াতে এখনও তিনি কোষাদক্ষের দায়িত্বে আছেন। যাক এ দিকে যাওয়ার আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে আসলো তাই লিখলাম। মূল বিষয়ে চলি। আশেক আহমদের স্ত্রীর নাম হলো, হাওয়ারুন বিবি। তাই ভবনটির নাম হয়েছে 'হাওয়া ভবন'।

দুই

এখন প্রশ্ন 'হাওয়া ভবন' ঘিরে কেন এত সব কুৎসা, ঘটনা, রটনা ও প্রোপাগান্ডা, সেই থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামীপন্থী সাংবাদিক ও মিডিয়াওলারা তসবিহর মতন জপ করে যাচ্ছেন? তার মূলে কী? রহস্য কী? পাঠক বিশ্লেষনে চলে আসে, দেশ নায়ক তারেক রহমানই তাদের একটি টার্গেট, একটি নিশানা। কারণ তিনি যখন ১৯৮৮সালে ২২ বৎসর বয়সে বগুড়া জেলা বিএনপির সদস্য পদের মাধ্যমে সরাসরি বিএনপির রাজনীতিতে আসেন।

অতপর তাহার বাবার আদর্শ এবং মায়ের কঠোর পরিশ্রমকে সামনে রেখে, তৃর্ণ-মূল নেতা-কর্মীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ও তাদের সুসংগঠিত করার জন্য ছুটে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, প্রান্ত থেকে প্রান্তর। এ ভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই ভিশনারী তরুণ নেতা মিশে যান তৃর্ণমূল নেতাকর্মী থেকে সাধারণ মানুষের সাথে। এ সব ভাবনা ও ছিন্তা চেতনার কর্মস্থলই ছিল 'হাওয়া ভবন'। এ ভবন থেকে সবই পর্যবেক্ষণ করতেন দেশনায়ক তারেক রহমান। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন তিনি নিজেই পরিচালনা করে এক অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৯৩টি আসন জয়লাভ করে ছিলেন। আর আওয়ামী লীগ পেয়েছিল মাত্র ৬২টি আসন। এই বিপুল বিজয়ের মূলে দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্ব ও স্ট্যাটেজি ছিল চোখে পড়ার মতন।

এখানেই শেষ নয়, ২০০৪ সালে হাওয়া ভবনে বসেই দেশ নায়ক এক এক করে বিশ্বের প্রায় ১৯ দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে অন-লাইনে তাঁহার বক্তব্য শুনিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কুশল কামনা করেছেন।

প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রবাসীদের মুখোমুখি হয়ে দেশ, দল ও সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়াছেন। "কবিতা ও গান ডটকম" নামে একটি অন-লাইন সংগঠন করেছিলেন। তাতে অন-লাইনিং মিটিং এর ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থাকে প্রথমেই দেশ-নায়ক তারেক রহমানই কাজে লাগিয়ে ছিলেন। এ সবই তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শীতা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বিভিন্ন কর্ম-কৌশলের বিশালতা প্রকাশ পেয়েছিল। তাতে তারা আর বুঝতে বাকি রহিল না। দেশ নায়ক তারেক রহমানই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যোগ্য সন্তান। দেশ-নায়ক তারেক রহমানই একবিংশ শতাব্দীর ভিশনারী সফল সংগঠক হিসাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নেতৃত্ব দিবে এবং বাংলাদেশকে নেতৃত্ব করবে।

তিন

অতঃপর ওয়ান এলিভেন! ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশি-বিদেশি চক্রান্তে ১/১১-এর কুশীলরা একটি জরুরি সরকার গঠন করে ২০০৭ সালের ৭ মার্চ তারেক রহমানকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করে ১৩টি মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য কোন মামলাই তিনি সরাসরি আসামী ছিলেন না। অন্যান্য আসামীদেরকে রিমান্ডের নামে নির্যাতন করেই তাহার নাম ঢুকানো হতো। আমাদের মানতে হবে ১/১১ এর সব চাইতে নির্যাতিত পরিবার নিঃসন্দেহে

জিয়া পরিবার। তার মধ্যে প্রথম টার্গেট-ই হলো তারেক রহমান। তারা জানতো, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে হলে, জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে। প্রথমেই ভিশনারী সফল সংগঠক দেশনায়ক তারেক রহমানের উপর আঘাত হানতে হবে। তাই তারা প্রথমেই টার্গেট মোতাবেক তারেক রহমানের উপর আঘাত হানছিল। কঠিনতম আঘাত! নিপীড়ন নির্যাতন ও বর্বতার যত প্রকার নমুনা ছিল, রিমান্ডের নামে সবই তারা প্রয়োগ করে ছিল ২০০৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সেই ভয়ংকর রাতটিতে। সেই রাতটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বর্বরতার রাত, একটি কালো অধ্যায়ের রাত। যদিও অনেকেই নতুন একটি বছরকে আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে স্বাগতম জানিয়ে ছিলেন। পাঠক, দেশ নায়ক তারেক রহমান নিজেই সেই ভয়াল রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "সেই রাতে আমার উপর পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নির্যাতন করা হয়ে ছিল। অনেকগুলো নির্যাতন।"

পাঠক, তিনি শুধু জানতেন...তিনি এই দেশটির স্বাধীনতার ঘোষক, এই দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও এই দেশটির তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান। পাঠক এই অংশটুকু লিখতে কার না শরীর শিহরিয়া উঠে, কার না অন্তর আত্মা থরথর করে কাঁপতে শুরু না করে...। যাক, রাখে আল্লাহ মারে কে? অতপর ২০০৮ সালের ৯ জুন অ্যাম্বুলেন্সে করে আদালতে যান এবং কোন ভাবে সেখানে হুইল চেয়ারে বসা ছিলেন। পরে ৩ সেপ্টেম্বর ১২ টি মামলার জামিন পান। অবশেষে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেন।

চার

সেই মঈন-ফখরুর ধারাবাহিকতায় বিনা ভোটের সরকার দেশ নায়কের উপর দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা, গ্রেনেড মামলা, চাঁদাবাজি মামলা এ ভাবে অগণিত মামলা চালিয়েও কোন মামলাই সত্যিকার অর্থে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নাই। এখানে উল্লেখ্য একটি মিথ্যা বানাউট মামলা নিম্ন আদালতে খালাস পাওয়ার পরও উচ্চ আদালতে স্বয়ং সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাটিয়ে দলীয় বিচারক এনায়েতুর রহিম কর্তৃক সাত বছরের কারা দণ্ড ও বিশ কোটি টাকা জরিমানা রায় ঘোষণা করে ২০১৬ সালের ২১ জুলাই। এ ধরনের ষড়যন্ত্র মূলক আরও ২/১ মামলা রায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাহা-ই নয়, দলের চেয়ার-পারর্সন বেগম খালেদা জিয়াকে-ও একই ভাবে হীন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কয়েকটি মামলা রায়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে ফ্যাসি সরকার। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, "এ সবের মূলে তাদের জনপ্রিয়তা। বেগম জিয়ার জনপ্রিয়তা, তারেক রহমানের জনপ্রিয়তা। পর্যবেক্ষকরা আরও

বলছেন, "এ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার যে ভাবেই হোক বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান কে লিডারশীপ থেকে দূরে রাখা, নির্বাচন থেকে দূরে রাখা।" এমন কি তারেক রহমানের বক্তব্য বিবৃতিকে কোন প্রকার খণ্ডন না করেই, হীন উদ্দেশ্যে তাহার বক্তব্য বিবৃতি কে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি।

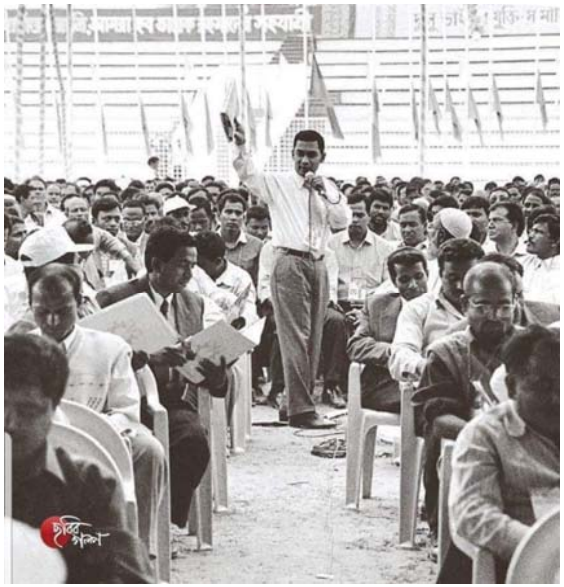

পাঁচ

এখন বলতে হয়, যেখানে জরুরি সরকার থেকে শুরু করে, বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার পর্যন্ত ১১ বৎসরে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ফ্যাসিবাদী সরকার হাওয়া ভবন বা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কোন তথ্যবহুল বা সুনির্দিষ্ট প্রমান হাজির করতে পারে নি। সেখানে অতি সম্প্রতি সেই হলুদ সাংবাদিক ও মিডিয়াওলারা হাওয়া ভবনকে ঘিরে, তারেক রহমানকে ঘিরে ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সম্মেলনকে ঘিরে পুঁতির মালার মতন কল্প-কাহিনী বানিয়ে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু মাত্র একবিংশ শতাব্দীর ভিশনারী সফল সংগঠক দেশ নায়ক তারেক রহমানকে কুলষিত করার জন্য।

কিন্তু এখানে হলুদ সাংবাদিক ও মিডিয়াওলাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তারা কী একটি বার তাকিয়ে দেখেন না?

১। ২০১০ সালে ২৯ জানুয়ারি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্পূর্ণ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কোন কাউন্সিল হচ্ছে না কেন?

২। যেখানে ৮ বৎসর যাবৎ সন্মেলন বিহীন মেয়াদ উত্তীর্ণ আওয়ামী লীগের পুরাতন কমিটি চলছে। সেখানে কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু যুক্তরাজ্য বিএনপি যেখানে ঐ ৮ বৎসরের ভিতরে দলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য তিনটি কাউন্সিল দিতে সক্ষম হয়েছে, তাতে হলুদ মিডিয়ারা নাক গলাতে কী একটুও লজ্জা বোধ করেন না?

৩। বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় সয়লাব।

ধানমন্ডির সিআরআই অফিসের মতন, লন্ডনের রিচমন্ডের অভিজাত এরিয়ায় গবেষনার নামে 'পাওয়ার ভবন' করে কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন বাণিজ্য চলছে। সে খবর কী রাখেন?

যাক, মূলে চলে আসি, একটি বার ভাবুনতো একজন তারেক রহমানেকে নিয়ে কত ভয় হলে আইন করে তাহার কণ্ঠরোধ করা হয়, কত আতঙ্ক হলে, ১/১১ এর কুশীলরা, ফ্যাসিস্টরা এখনও তাহার পিছনে লেগে থাকতে পারে।

বিশ্লেষণে এখানে পরিষ্কার যে, দেশ নায়ক তারেক রহমানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়েই বিভিন্ন হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে ১/১১ এর কুশীলরা। সাথে মদদ দিচ্ছে কিছু মহল তাদের সামান্যতম ব্যক্তি স্বার্থের জন্য তাতে ১/১১ এর কুশীলরা লোপে নিয়ে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডায় মেতে উঠছে। এ যেন পানিতে কূপ দেওয়ার শামিল। তাই জাতীয়তাবাদী সৈনিকদের বলব, এখন আর কালক্ষেপণের সময় নয়। দেশ ও জাতি মহা ক্রান্তিকাল পার করছে। নিজে জাগ্রত হোন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তরুণ প্রজন্মকে জাগ্রত করুন এবং ২০১৮ সালে গণতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করুন।

এ-দিকে কিন্তু দেশি বিদেশি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা এখন বলছেন, দেশ নায়ক তারেক রহমান তিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন, তিনি আসলে কোন অন্যায়, অনিয়ম বা কোন দুর্নীতির সাথে জড়িত নন। তিনি ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক নিপীড়িত নির্যাতিত হয়েও কঠিন থেকে কঠিনতম পথ অতিক্রম করে দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে গতিশীল নের্তৃত্বে ২০১৮ সালের বিজয় সুনিশ্চিতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলছেন।

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২৫, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হাজির

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিএনপি চেয়ার পারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায়ের তারিখ। রায়ের তারিখকে কেন্দ্র করে চলছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পাল্টাপাল্টি ডায়লগ। দেশ আজ উত্তপ্ত। দফায় দফায় চলছে সরকারি দলের ধড়-পাকড়ের হিড়িক। বড় নেতা থেকে ছোটো নেতা পর্যন্ত সাথে আছে রিমান্ড, নির্যাতন ও জেল হাজত। এ পর্যন্ত কয়েক শত নেতাকর্মী বন্দিখানায় চলে গেছেন। জনমনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। সরকার বলছে, "রায় নিয়ে রাজপথে কোন বিশৃঙ্খলা করলে, কঠোর হস্তে দমন করবে।" সাথে তাদের নেতাকর্মী দেরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

অপর দিকে...রাজপথের বিরোধী দল বিএনপি বলছে, শুধু বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনের বাহিরে রাখার জন্য, হীন উদ্দেশ্যে এসএসসি পরীক্ষা এর ভিতরে রেখে দ্রুত মামলার রায় ঘোষণার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নীতিবাচক রায় হলে রাজপথেই আন্দোলন। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এই আট তারিখকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা ট্রানিং পয়েন্ট হিসাবে দেখছেন।

এক

সরকারি হিসাব অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ৩৩ লাখের উপরে বিচারাধীন মামলা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পরে আছে আদালতের বাক্সে, কোন সূরাহা হচ্ছে না। হাজার হাজার মানুষ ঐ সমস্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য দিন

গুনতে গুনতে ইহজগত ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাদের ছেলে-নাতনীরাও এখন দৌড়াতে দৌড়াতে মামলার নাগাল পাচ্ছেন না। সেখানে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (এক সাথের মামলা থেকে) শুধু তাঁহার উপরের মামলাগুলো তুলে নিয়ে বড় নজর রাখছেন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মামলার উপর। আজ লক্ষ লক্ষ মামলা আদালতের ড্রয়ারে রেখে সম্পূর্ণ হীন উদ্দেশ্যে এ মামলার কার্যক্রম চলছে প্রতিদিন। কারণ যে কোন উপায়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে সাজা প্রদান করে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য। তা এখন দিনের মতন পরিষ্কার। জিয়া পরিবারকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে, আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করে যাচ্ছে। মনে হয় যেন বিচারকরা ঠিকাদার এবং বিচারালয়কে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়... বিচার ব্যবস্থা মৃতবৎ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

দুই

এ দিকে ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুরে রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেল থেকে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিঠির সভায় দলের চেয়ার পারসন বেগম খালেদা জিয়া বললেন, "আমি যেখানেই থাকি না কেন? আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমাকে কোন ভয়ভীতি দেখিয়ে দমাতে পারেনি, পারবেও না। আমি দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আছি, দেশের মানুষের সঙ্গে আছি। সাহস সঞ্চয় করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে।" আসুন সবাই মিলে এই দেশটাকে রক্ষা করি, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনি। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া এই কথাগুলি বলার সাথে সাথে লা-মেরিডিয়ান হোটেল প্রাঙ্গন শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত উঠলো, "আমার নেত্রী আমার মা, বন্দি হতে দেব না। আমার নেত্রী আমার মা, জেলে যেতে দেব না।"

অতঃপর আপসহীন নেত্রীর বক্তব্যের উল্লেখ যোগ্য বিষয়গুলি ছিল...১। কোন অপরাধ আমি করিনি, তারপরও তাদের গায়ের জোরে বিচার করতে চাইছে সরকার।

২। নিম্ন আদালত সরকারের কব্জায়, সঠিক রায় দেওয়ার ক্ষমতা এখন বিচারকদের নেই।

৩। যে কোন কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করবেন।

৪। তারেক রহমানের মামলায় সঠিক রায় দেওয়ায় এক বিচারককে দেশ ছাড়তে হয়েছে। আর সরকারের বিরুদ্ধে বলে, প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা কেও দেশ ছাড়তে হয়েছে।

৫। ভোট হতে হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এবং ভোটের আগে সংসদ ভাঙতে হবে। ৬। নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে, তারা মোবাইল ফোর্স হিসাবে কাজ করবে। ৭। নির্বাচনে জোন প্রকার ইভিএম-ভিভিএম ব্যবহার করা যাবে না। পরিশেষে বললেন, বিএনপির কোন ভয় নেই, বিএনপির সাথে প্রশাসন আছে, পুলিশ আছে, সশস্ত্র বাহিনী আছে, এ দেশের জনগণ আছে, দেশের বাহিরে যারা আছেন, তারাও আছেন। কাজেই বিএনপির কোন ভয় নেই। ভয়টা আওয়ামী লীগের-ই।

আর সিনিওর ভাইস চেয়ার-ম্যান নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তায় বললেন, "দেশ এক সঙ্কট কাল পার করছে। কারো নির্দেশের অপেক্ষা নয়, আপনি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করুণ। আপনার সামনের নেতাকে যদি গ্রেপ্তার করে, আপনি এবং আপনারা বসে নিজেরাই নেতৃত্ব নির্বাচিত করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। শহীদ জিয়ার সৈনিক হিসাবে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিন, দেশ ও মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একাত্তর সালে কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে যে ভাবে শহিদ জিয়া সিদ্ধান্ত নিয়া ছিলেন। শুধু মনে রাখবেন, গণতন্ত্র পুনঃউদ্ধারের এই লড়াইয়ে আমাদের সর্বাধিনায়ক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকুন। গণতন্ত্রের বিজয় সন্নিকটে। এ বছর-ই গণতন্ত্রের বিজয় দেখবে বাংলাদেশ। ইনশাআল্লাহ।"

তিন

আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঈন-ফখরুর সাথে আঁতাত করে দেশকে এক ধ্বংসলীলায় পরিণত করেছে। সগৌরবে মঈন-ফখরুর শাসন আমলকে বৈধতা দিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নীল-নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে একক ক্ষমতার মালিক হন শেখ হাসিনা। অতঃপর শুরু হয় এক এক করে পূর্ব পরিকল্পনার পালা–

১. প্রথমেই তারা ক্ষমতায় আসার তিন মাসের ভিতরেই পিলখানায় ৫৭ জন অফিসারকে হত্যা করে ঘটানো হলো পৃথিবীর নিকৃষ্টতম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড এবং দেশকে পিছিয়ে নূন্যতম অর্ধ শত বছরের জন্য।

২. সরকারের অধিকাংশ নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিবিধ তত্ত্বাবধারক সরকারের পক্ষে থাকা সত্বেও শুধু মাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধারকের বিপক্ষে থাকায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে বাতিল করা হয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা যদিও ঐ রায়ের ভিতরেই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা আরো ২/১ ট্রাম চালু রাখার ব্যবস্থা ছিল।

৩. অন্যায়ভাবে হীন উদ্দেশ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁহার ৩৮ বছরের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা।

৪. ৫ জানুয়ারির ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে ও বিরোধী মত ও পথকে বন্ধ করে দিয়ে, গৃহপালিত বিরোধী দল তৈয়ার করে এবং প্রায় সব কটি মিডিয়া কে হলুদ কাতারে নিয়ে আসা এবং সদ্য ৩২ ধারার মাধ্যমে মিডিয়ার একদম ১২টা বাজিয়ে দেওয়া।

৫. হেফাজতে ইসলামকেও রাতের আঁধারে স্ট্রিট লাইট বন্ধ করে শত শত আলেমকে হত্যা করে জায়গা মত বসিয়ে দেওয়া।

৬. বিরোধী মত ও পথের হেভিওয়েট নেতাদেরকে মানবধিকারের নামে সত্যিকার ভাবে যাচাই বাচাই না করেই একে একে ফাঁসিতে ঝুলানো।

৭. দেশনায়ক তারেক রহমানের একটি ষড়যন্ত্র মূলক মামলা নিম্ন আদালতে খালাস পাওয়ার পরও উপরের আদালতে নিয়ে, দলীয় বিচারক দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করে রায় ঘোষণা করা।

৮. এ ছাড়া জঙ্গি হামলার বিভিন্ন নাটক, খুন, গুম, ক্রসফায়ার, জেলজুলুম, অত্যাচার ও ধর্ষণ।

৯. ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হল মার্ক, ডেসটিনি, সোনালী, রুপালী, বেসিক ও জনতা ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা। এমন কি সুইফট কোর্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত লুট করা। এ ছাড়া শিক্ষা বিষয়কে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে আসা।

লিখতে হলে লিখা শেষ হবে না, এখানে দৃশ্যায়িত, লক্ষ কোটি শহিদের বিনিময় অর্জিত বাংলাদেশটির গণতন্ত্র আজ নসাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র অকেজো, মানবতা বিপন্ন, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বিভিন্ন ভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন। বাংলার আকাশ আজ অন্ধকার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশ এই মুহূর্তে এক ক্রান্তিকাল পার করছে।

চার

পাঠক, একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের, মহা সঙ্কট সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন ছিল দিশেহারা ঠিক তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটি ঘোষনাই জাতিকে সঠিক নির্দেশনা ও সঠিক পথ দেখিয়েছিল। সেই ফল শ্রুতিতে শহীদ জিয়ার হাত ধরেই স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে এনে ছিলেন। দেশের এই মহাক্রান্তি লগ্নে জাতি আজ (শহীদ জিয়ার হাতে গড়া দল) জাতীয়তাবাদী দলের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের দল বিএনপি, বিএনপি সঙ্কট উত্তরণের দল, ইতিহাসের পাতা বলে, বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে বিএনপিই দেশকে উদ্ধার করেছে বার বার।

আজ দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হাজির। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধটি হয়েছিল শহীদ জিয়ার ডাকে এবং তাঁহার হাত ধরে। আর আজ তাঁহারই সহধর্মীণী গণতন্ত্রের প্রতিক, আপসহীন নেত্রী, সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রী, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরেই যুদ্ধ চলছে। সাধারণ মানুষজন বলছেন, শুধু সাজা প্রদান করলে আন্দোলন, নইলে আন্দোলন নয়, এমন যেন না হয়। এ আন্দোলন হবে গণতন্ত্র পুনঃউদ্ধারের আন্দোলন, মানুষ বাঁচার আন্দোলন, পরবর্তীতে এক দফার আন্দোলন।

আর হ্যাঁ, আরেকটি বিষয় না লিখলে না হয়, বিএনপি ও বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের শত শত কমিটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সব গুলি কমিটি এই সময়ের আগে সম্পন্ন করা খুবই জরুরি ছিল। নিঃসন্দেহে তা দলের ব্যর্থতা। হাজার হাজার নেতাকর্মী পদশূন্য অবস্থায় আছেন। তাই বলছি, একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে, একাত্তরে কিন্তু কাহারও কোন পদ-পদবী ছিল না। সবাই দেশকে বাঁচানোর জন্য, জাতিকে বাঁচানোর জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আজ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও এখন দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ হাজির। এ যুদ্ধ হবে গণতন্ত্র পুনঃউদ্ধারের জন্য, মানব অধিকারের জন্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। তবে আমার বিশ্বাস পদ-পদবী ছাড়া যারা এ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন, দল তাদেরকে অবশ্যই মূল্যায়িত করবে তখন তাদেরকে মূল্যায়িত করাটাই হবে যুক্তিযুক্ত।

আর হ্যাঁ, এই সময়ে সবাই আওয়াজ তুলোন, "হে জাতীয়তাবাদ, হে ইসলামী মূল্যবোধ, হে গণতন্ত্র পুনঃউদ্ধারকারী, হে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী, সবাই জাগ্রত হও, মনোবল হারিও না, গ্রেপ্তারের তালিকা যতো বড় হবে, রাজপথের মিছিলও ততো বেশি লম্বা হবে। ইনশাআল্লাহ বিজয় নিশ্চিত।

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ৮, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

খেলার কার্ড এখন জনতার হাতে, আরেকটি পতনের অপেক্ষায় জাতি

এক

৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে, ১৮ কোটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনে আসীন বিনা ভোটের সংসদরা! সেখানে সমাসীন আছেন স্পীকার, ডিপুটি স্পীকার, সংসদ নেতা, এ সবই আছে কিন্তু নেই কোন বিরোধী দল, নেই বিরোধী কোন মত ও পথ! অধিকাংশ সময় টিভির পর্দায় দৃশ্যায়িত হয় তন্দ্রায় নিমজ্জিত সাংসদরা! মাঝে মধ্যে অভিনব কায়দায় পালা গান ও কবিতায় সংসদ হয়ে উঠে প্রাণ চঞ্চল এবং পালা গানের সুরে প্রধানমন্ত্রীর গুণগান প্রকাশ পায়। কি আশ্চর্য সংসদ! এ ছাড়া সংসদের প্রায় পুরো সময় জুড়ে বিএনপি, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে ঘিরে যতো সব বয়ান। শুধু সংসদে নয়...তাদের মিলাদ মাহফিল থেকে শুরু করে যত প্রকার সভা সেমিনার আছে, সব খানেই এ দলটিকে ঘিরে সব বয়ান। এমন কি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দল নেতারা বিশ্বের যেখানেই যান, সেখানেই এই একই বয়ান।

মজার ব্যাপার হলো, এই দল কিন্তু আবার সংসদে নেই, রাজপথেও নেই, কোন জনসভা সেমিনারেও নেই।

আবার কোন সভা সেমিনার করতে হলে, কোন অনুমতি ও মিলবে না, হাউ ফানি! একটি দল এবং দলের নেতার প্রতি কতো ভয় হলে এমন হতে পারে। তা কিন্তু মানুষ সহজেই অনুমেয়।

যদিও আমরা প্রায়সই রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের মজার ব্যাপার দেখে থাকি, এ বিষয়টা কিন্তু অনেকটা ভিন্ন...প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালী সফর থেকে ফিরে গণভবনে সংবাদ সন্মেলনে বললেন, "বিএনপিতে কি এমন কেউ নেই যে, যাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা যেত। একটা লোক কি খোঁজে পাওয়া গেল না? বিএনপির নেতৃত্বে কি এতই দৈন্যদশা?" এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁহার ও তাঁহার দলের শীর্ষ নেতাদের এত মাথা ব্যথা শুরু হলো, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়াইয়া পুনরায় এই কথাগুলো ব্যক্ত করলেন এবং বিএনপির গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলী পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। অন্য একটি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এরূপ বক্তব্যে অনেকের হাসি মুখে চাপা দিয়ে আটকিয়ে রাখতে কষ্ট হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর বিএনপির প্রতি এত দরদ দেখে, বিএনপির তৃর্ণমূলের সাধারন নেতাকর্মী বলছে, আপনাকে এভাবে আফসোস করে কোন লাভ হবে না, বিনাভোটের সংসদে বক্তৃতা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আপনার যখন এই দলের জন্য এতই দরদ ও ভালোবাসা, তা হলে বিএনপির একটি সদস্য ফরম পূরণ করে জমা দিন। মঞ্জুর হলেই আপনি অবজেকশন দিতে পারবেন এবং আপনার কথা মূল্যায়িত হবে এমন কি আপনি নিজেও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হতে পারেন। এ কথাগুলি আজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৃর্নমূল নেতাকর্মীরা বলছে।

দুই

বিএনপির চেয়ার পারসন, গণতন্ত্রের প্রতীক, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা বানোয়াট মামলায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বন্দি করে রাখে সরকার। আবার বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ প্রায় সবকটি কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা প্রদান করা।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুমতি চাহিলে অনুমতি না দেওয়ায়, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ নয়া পল্টনের অফিসের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শনের কর্মসূচি দিলে তা ও পণ্ড করে দেওয়া। ঐ দিন সকাল ১০ ঘটিকা থেকে নেতাকর্মী জমায়েত হতে না হতে ই নেক্কারজনক হামলা, লাটি চার্জ এবং জলকামান দিয়ে বিএনপি অফিসের মেইন গেইট পর্যন্ত গরম পানি স্প্রে করা, তাতে-ই শেষ নয় বিএনপির যুগ্ন মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে ডাকাত ধরার কায়দায় ৪/৫ জন মিলে সাপের মতন বেড়ি দিয়ে গ্রেপ্তার করা। উনি তো কোন ব্যাংক ডাকাত ছিলেন না। ব্যাংক ডাকাতরা তো সগৌরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উনি সম্মানীত একজন নাগরিক, মানষের অধিকারের কথা বলছেন। মানুষজন ধিক্কার জানিয়েছে। সৈয়দ আলাল সহ প্রায় দেড় শতাধিক নেতাকর্মী দের গ্রেপ্তার করা ও অসংখ্য মহিলা নেতাকর্মী সহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে নেক্কারজনক ভাবে আহত করা। আর পরক্ষণে সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা ওয়াবায়দুল কাদের বললেন, "ঘরে ও অফিসে বসে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে।" আবার ও বলতে হচ্ছে, হাউ ফানি! সে দিন জাতি প্রত্যক্ষ করেছে, এ ফ্যাসিস্ট সরকার আইয়ুব এহিয়ার বর্বরতাকে ও ক্রস করে ফেলেছে। এই দিন সর্ব স্তরের মানুষ ফ্যাসিস্ট সরকারকে ধিক্কার জানিয়েছে।

আজ অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বলছেন, "হাসিনা সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যাচার ও বানোয়াট মামলায় নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে জেলে দিয়ে এবং বিএনপির বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা প্রদান করে, বিশেষ করে দলের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে বর্বরোচিত ও ঘৃণিত হামলা করে কালো পতাকা প্রদর্শন করতে না দিয়ে এবং দলের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে সরকার প্রমান করলো, সরকার বিএনপি ও ২০ দলীয় জোটের সাথে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে না পেরে...এই ঘৃণিত বর্বরোচিত কাজগুলি করলো। অর্থাৎ তাদের হাতে খেলার আর কোন কার্ড নেই। সব কার্ড খেলা

হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সব কার্ড চলে গেছে জনতার হাতে। যার মাল তার হাতে চলে গেছে।"

তিন

আজ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সাগর নিয়ে সরকারি দলের নেতারা ইনসাফের কথা বলে বড় বড় বাণী প্রসব করছেন। সরকারি দলের যুগ্ন সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ কুষ্টিয়ার এক অনুষ্ঠানে বেগম জিয়াকে দুর্ণীতি পরায়ন হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, দেশের জনগণ বিএনপির এ সব দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী কে কারাগারে দেখতে চায়।

আর তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়ার অনুষ্টানে বললেন, "বিএনপির নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এতিমের টাকা আত্নসাৎ-এর দায়ে এখন জেল হাজতে, তিনি একজন চিহ্নিত অপরাধী। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন অপরাধী অংশ নিতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, তা হলে আগামী সংসদ নির্বাচনে কারা ফেরেস্তা হয়ে বসে আছেন তাদের একটু দেখে আসি।

১. শেখ হেলাল গত পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে ১০গুণ। ২/নূর-এ-আলম চৌধরী সম্পদ বেড়েছে পাঁচ বছরে ৬৭ গুণ। ৩/ মাহবুব-উল-আলম-হানিফ পাঁছ বছরে ৭০ একর জমি। ৪/ শেখ ফজলে নূর তাপস পাঁছ বছরে সম্পদ বেড়েছে ২৯ গুণ। ৫/ শেখ সেলিম সম্পদ বেড়েছে ২ গুণ। ৬/ কাজী জাফরুল পাঁছ বছরে ১০০ কোটি টাকার সম্পদ। ৭/ এডঃ কামরুল ইসলাম পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে ৮০গুণ। উল্লেখ্য, এখানে যারা আছেন বেশির ভাগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঘনিষ্ট আত্মীয়। এইগুলো সরকারি হিসাবে বিভিন্ন পত্রিকার রির্পোট। এই ভাবে শত শত নেতারা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। তা হলে ওদেরকে এখন কি বলবেন? অপরাধী না ফেরেস্তা? নিশ্চয় এই ফ্যাসিস্ট সরকারের ভাষায় ওরা ফেরেস্তা। আর বাকিরা সব অপরাধী?

ওরা-ই কি আগামী সংসদ নির্বাচনের বর?

চার

বাংলাদেশের অন্যতম সংবিদান প্রণেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এক সেমিনারে বললেন, "সংবিধান বলে জনগণেই এদেশের মালিক কিন্তু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি এখন বেদখল হয়ে গেছে।" আর সময়ের সাহসী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও দেশপ্রেমিক অধ্যাপক বদরুদ্দিন ওমর সম্প্রতি কলকাতায় সাংবাদিকদের সাথে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা একজন ক্রিমিনাল! She is a চোর! সে, তাঁর বেটা, ও তাঁর বোন দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে লোপাট করেছে, এখনও করছে। তাঁরা যেটা করছে, সেটা-ই আবার জনগণকে করতে মানা করছে।" সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে বললেন, "রাষ্ট-ই বড় সন্ত্রাসবাদী, তাঁরা গুম করছে, খুন করছে, জেলে মার্ডার করছে, ক্রস ফায়ারে মারছে!! We are all Bangladeshis are ruled by fassist and criminals."

পাঁচ

পাঠক এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ফ্যাসিস্ট এসেছে, তাদের রূপ, গন্ধ ও লক্ষ্য ছিল এক। তাদের মূল কাজ হলো, একনায়কত্ব প্রতিষ্টা করা এবং কলে বলে কৌশলে মিডিয়া আয়ত্ত করা এবং মতের বিরোধী প্রতিষ্ঠান, দল বল ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনদের জেলজুলুম, নির্যাতন, ফাঁসি ও গুম খুনের মাধ্যমে রাষ্ট পরিচালনা করা। পরিশেষে কিন্তু সব-ই ব্যর্থ হয়। দুনিয়াতে অনেক জাদরেল ফ্যাসিস্ট এসেছেন কিন্তু কেউ- টিকে থাকতে পারেন নাই। তারা সবাই-ই ইতিহাসে কালো পাতায় আটকা পড়ে গহীন গহ্বরে পতিত হয়েছেন। তার-ই জ্বলন্ত প্রমান...আজ থেকে আট বৎসর পূর্বে ২০১০ সালে ২৩ বছরের স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদীন বিন আলী বিদায় হলো তিউনিসিয়া থেকে। এই তো সে দিন ৩০ বছরের স্বৈরশাসক হোসনে মোবারক তাহরির স্কয়ারে মাত্র তিন সপ্তাহের গণ আন্দোলনের মুখে লজ্জাজনক বিদায় নিলো মিশর থেকে। এ ছাড়া 'লৌহ মানব' খ্যাত কর্ণেল গাদ্দাফির ৪২ বছর শাসনের করুণ পরিণতি হলো লিবিয়া থেকে। এদের অবিশ্বাস্য ভয়াবহ পরিণতি দেখেছে সারা বিশ্ব। আর বাংলাদেশ দেখেছে, আইয়ুব-এহিয়ার পতন, শেখ মুজিবের বাকশালীয়

পতন ও এরশাদ স্বৈরাচারের পতন। আপসহীন নেত্রী দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে-ই স্বৈরাচার এরশাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে পুনঃউদ্ধার করেছিলেন। বিধির খেলা বুঝা বড় কঠিন...আজ আবার-ও সেই গণতন্ত্রের জন্য দেশমাতা ৭২ বৎসর বয়সে লড়ে যাচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন, জেলে বন্দি যাপন করছেন! পাঠক, ৩রা ফেব্রুয়ারী জেলে যাওয়ার পূর্বে শেষ বক্তব্যে লা-মেরিডিয়ান থেকে দেশমাতা জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলছিলেন, "আমি যেখানে-ই থাকি না কেন? আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমাকে কোন ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমাতে পারেনি, পারবে-ও না। আমি দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আছি, দেশের মানুষের সঙ্গে আছি। সাহস সঞ্চয় করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। আসুন, সবাই মিলে এই দেশটাকে রক্ষা করি, গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনি। পাঠক স্বৈরাচার এরশাদের পতনের ২৮ বছর পর-আরেকটি পতনের দিকে তাকিয়ে আছে দেশ। তাই বলছি, জাগ্রত হোন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন, খেলার সব কার্ড কিন্তু এখন জনতার হাতে, আরেকটি পতনের অপেক্ষায় জাতি।"

প্রকাশকাল : মার্চ ৫, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ, ওরা-ই লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মা!

এক

একটি জাতি দুইশত বৎসর ব্রিটিশ জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকার পর, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তান (ইস্ট পাকিস্তান) নামে। অতঃপর পাক হানাদারদের অনাচার, অত্যাচার, শাসন ও শোষন যার ফলে...৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন। তারই পথ পরিক্রমায় একাত্তরের ২৫ ও ২৬ মার্চ সেই ভয়াল রাতে জাতি যখন মহা সংঙ্কট-সন্ধিক্ষণে দিক-নির্দেশনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল...।

তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাষায়...

"সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সবাই সর্ব সম্মতিক্রমে হৃষ্ট চিত্তে এ আদেশ মেনে নিল। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।"

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্তের আখরে বাঙালিদের হৃদয়ে লিখা একটা দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে, ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোন দিন ভুলবে না! কো-ন দি-ন- না।

পাঠক, আমি মেজর জিয়া বলছি, "সেই দৃঢ় ইস্পাত কঠিন উচ্চারণ জাতিকে দিয়েছে সাহস, নিশ্চয়তা ও গন্তব্যস্থান। স্বাধীনতাকামী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাক-হানাদারদের উপর। অতঃপর লক্ষ কোটি শহিদের রক্তের বিনিময় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মাধ্যমে লাল পতাকা খচিত একটি দেশ, তার নাম 'বাংলাদেশ'। সে দেশটি আজ পা পা করে স্বাধীনতার ৪৭ বৎসরে দাঁড়িয়ে ও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে এক চরম সঙ্কটকাল পার করছে। নসাৎ গণতন্ত্র, অকেজো রাষ্ট্রযন্ত্র, নেই বিচার, নেই মানবতা, চতুর্দিকে জেলজুলুম, অনাচার, অত্যাচার ও খুনগুম অহরহ চলছেই।"

দুই

এ ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন পূর্ব থেকেই চলে আসছে। কোথাও যেন থেমে নেই।

ইতিহাস বলে, "কোটি কোটি মানুষ হত্যা করে ইতিহাসের খল নায়ক লেলিন, স্ট্যালিনরা গড়ে তুলেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সন্ত্রাসী রাষ্ট ইসরাইল পৃথিবীর বুকে যার কোন পরিচয়ই ছিল না, বিশ্ব মোড়লদের সহযোগিতায় দখল করে নেয় ফিলিস্তিন। স্থানিয় ও জাতিগত একটা দেশকে লণ্ডভণ্ড করে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যাযাবর করে ফেলে। সম্প্রতি হাজার বছরের স্থায়ী বাসিন্দা রোহিঙ্গাদের কে মিয়ানমার সরকার তাদের নিজ দেশ থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। আজ লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসাবে দিন যাপন করছে। ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গারা আজ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে বিশ্ব বিবেকের সামনে।"

এ ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাস বিভিন্ন ভাবে এসেছে, যেমন এসেছে ইরাক লিবিয়া ও সিরিয়ায়।

পাঠক, এ সব ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসে ভারত কোন দিকে পিছিয়ে নেই, থেমে ও নেই। ইতিহাস-ই বলে দেয়, তারা কোন কৌশলে দখল করে নেয় হায়দারবাদ, সিকিম। বিশ্ব অবগত, লেন্দুপ দর্জির মাধ্যমে, ভারতের 'র' এজেন্টদের দ্বারা সিকিমকে বিভিন্ন ভাবে হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজ্যে পরিণত করে, নাটকীয়ভাবে ৭৫ সালে সিকিম দখল করে নেয় ভারত।

আজ স্বাধীনতার ৪৭ বৎসর পর তার প্রতিচ্ছবি বহুভাবে ফুঠে উঠছে বাংলাদেশের উপর। অনেক পর্যবেক্ষক বলছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই তাদের আলাদা একটা নজর বাংলাদেশের প্রতি। তাই চলে একের পর এক ষড়যন্ত্র দেশের মূল চালিকা শক্তি সেনাবাহিনী, গার্মেন্টস, অর্থনীতি, চিকিৎসা ও শিক্ষা ধ্বংসের জন্য লেগে থাকা। সীমান্তে পাখির মতন গুলি করে মানুষ মারা। ভারত ও আওয়ামী লীগের যৌথ প্রযোজনায় যুদ্ধাপরাধ, মানবতা বিরোধ ও জঙ্গি নামক শব্দকে ব্যবহার করে জাতিকে মেধা শূন্য করা। বিশেষ করে ভারতে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন নাটক চলে জঙ্গিবাদের নামে। আসলে বাংলাদেশে কোন আই এস বা জঙ্গী নেই। যা আছে ভারতের এজেন্ট আর এজেন্টই বা কারা তা ইতোমধ্যে বিভিন্ন জঙ্গি হামলার নাটকে বিশ্ব মিডিয়া সহ দেশবাসী উপলব্ধি করতে পেরেছে।

৭১ সালে পাক ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশের যে ক্ষতি করতে পারেনি, ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হাসিনা সরকারের আমলে ই দেশীবিদেশী চক্রান্তে পিলখানায় ৫৭ জন অফিসারদের মৃত্যু ঘটানো সম্বব হয়েছে। যে অপূরণীয় ক্ষতিটা করা হয়েছে। যা কোন দিনও পূরণ হওয়ার নয়। যে দেশে ধর্মীয় কারণে প্রায় প্রতিদিনই সংখ্যালঘুরা খুন হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, ধর্মের কারণে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে গরু জবাই এবং গরুর মাংস নিষিদ্ধ করছে। তারা-ই আবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের গল্প দিয়ে মিডিয়ায় ঝড় তুলে, বাংলাদেশকে নিন্দনীয় স্থানে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত অহরহ করে যাচ্ছে। আর এ সব চক্রান্তের মূলে তাদেরই আর্শীবাদে জন্ম নেওয়া ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিনা ভোটের সরকার। এখন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সব চাইতে জনপ্রিয় দলের, জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি রেখে, বিনা ভোটের সরকারের সিনিয়র নেতারা দলে দলে ভারত গেছেন, ভারতের পতাকা গলায় ঝুলিয়ে আরেকটি বিনা ভোটের সরকার গঠন করার আর্শীবাদ নেওয়ার অভিপ্রায়ে। এদিকে বিনা ভোটের সরকারের সাধারণ সম্পাদক বলে দিয়েছেন, নির্বাচনের জয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা নাই, শুধু আনুষ্টানিকতা বাকি। অর্থাৎ হাই কনফিডেন্স! আওয়ামী নেতারা ভারতের পতাকা গলায় ঝুলিয়ে ভারতের নেতাদের সাথে

সাক্ষাতের খবরগুলো ভারতেরই কয়েকটি পত্রিকা ফলো করে প্রচার করে। এ ছবি সম্বলিত খবরে বাংলাদেশের অন-লাইন পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। চেতনার সরকারকে জাতি ধিক্কার জানিয়েছে। লেন্দুপ দর্জির সাথে তুলনা করেছে। ভারতপন্থি বাংলা ট্রিবিউনের ফেসবুক পেজে অনেকজনই কড়া কমেন্ট করেছেন।

* শাহরিয়ার লিখেছেন, ... "ভারতের পতাকা কাদে না মাখিয়ে, ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে নেন। তাতে ভালো হয়, হায়রে সোনার বাংলা আর কি করলে হয় সারা।"
* কবির লিখেছেন...ছিঃ ছিঃ...মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির একি বেহাল দশা! ঠিক যেমন ছাগলের গলায় দড়ি আর আওয়ামী নেতাদের গলায় ভারতীয় পতাকার ওড়না। এ ভাবে অসংখ্য কমেন্টস পড়ে ও শেষ করা যাবে না, লিখে ও শেষ করা যাবে না।

তিন

পাঠক, এখন সাধারণ মানুষের প্রশ্ন-এর নাম কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তো এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল, শহিদ হয়েছিল। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানবতার জন্য। কারো কাছে আবারো কোন গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। আজ সারা জাতি দেখছে, লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লেবাস পড়ে জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছে।

উত্তাল মার্চ, স্বাধীনতার মাস, গৌরবের মাস, শেষ পর্যন্ত এই স্বাধীনতার মাসেই মুক্তিযুদ্ধেরর চেতনা নামদারী শেখ হাসিনা সরকারকে ইতিহাসের কালো পাতায় নাম লিখতে হলো 'স্বৈরশাসক' হিসাবে! স্বৈরশাসনের পতন এখন সময়ের ব্যাপার। এখন প্রয়োজন মূল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একাত্তরের মতো আবারও গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানবতার জন্য এ দেশের মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রকাশকাল : শনিবার, ২৪ মার্চ, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের দেশ, 'আজকের বাংলাদেশ'

১৬ কোটির মানুষের বাংলাদেশ। আজ একটি চরম বিপদগ্রস্ত দেশ! গণতন্ত্র নির্বাসিত, স্বৈরতন্ত্রের কবলে জাতি। নেই নূন্যতম মানবিকতা নেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, সর্বত্রই অন্যায় অবিচার। ফ্যাসিস্ট সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপে দেশ আজ হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্রের মন্ত্রীর দেশে পরিণত। শুধু মাত্র গত দুই সপ্তাহের উল্লেখ যোগ্য ঘটনাবলীতে সহজেই অনুমেয় এ যেন, হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্র মন্ত্রীদের দেশ, 'বাংলাদেশ'। পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিম্নে হবু চন্দ্র রাজা আর গবু চন্দ্র মন্ত্রীদের উল্লেখ, যোগ্য কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এক. কোটা আন্দোলনকারীদের নির্যাতনের অভিযোগে ছাত্রলীগ নেত্রী এশাকে প্রথমে বহিষ্কার ও জুতার মালা পরিয়ে তিরস্কার করা, পরক্ষণে আবার ফুলের মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা।

দুই. কোটা আন্দোলনকারী নির্যাতিত ছাত্র ছাত্রীদেরকে সুফিয়া কামাল হল থেকে বহিষ্কার করা ও বিশেষ করে তিনজন ছাত্রীকে রাতের আঁধারে ছাত্রীদের বাবার হাতে তুলে দেওয়া এবং পরের দিন আবার হলে গ্রহণ করা।

তিন. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবস্থা বেগতিক দেখে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে কোটা ব্যবস্থাকে একেবারে তুলে

দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া মানে মাথা ব্যথা দূর করতে গিয়ে সম্পূর্ণ মাথাটাকে কেটে ফেলার ঘোষণা দিলেন।

চার. পাঠক অবগত ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ সাত কলেজের অধিভুক্তির দাবিতে সাধারণ ছাত্রদের ব্যানারে এক গ্রুপ শিক্ষার্থীদের সাথে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ওই সংঘর্ষে ওই দিন ভাইরাল হয়েছিল কুয়েত মৈত্রী হল ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রাবনী শায়লা। যে শায়লাকে কোটি মানুষ দেখছিল ছাত্রীদের জামা কাপড় টেনেহিঁচড়ে ছিঁড়ে উলঙ্গ করতে, সেই ছাত্রী শায়লা তার পুরস্কার হিসাবে বাংলাদেশ থেকে একশ জন তরুণ প্রতিনিধির সমন্নয়ে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময়ের সুযোগ পায়। এতে কি প্রমাণিত হয়?

পাঁচ. র‍্যাবের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ফ্যাসিস্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও র‍্যাবের ডিজি বেনজীর আহমদকে কাঁধে নিয়ে মঞ্চে তুলে জাতিকে কি বুঝানো হলো? এর অর্থ কি এভাবেই জোর করে জাতির ঘাড়ে চেপে বসা আর রাষ্ট্রীয় খরচে জমিদারি প্রথার পুনরাবৃত্তি করা?

ছয়. বাংলাদেশে গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য বিবৃতি বিনা ভোটের সরকারের আদালতে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও শুধু মাত্র তারেক রহমানের একটা ফোন কলে সব নিষেধাজ্ঞা ও ১৪৪ ধারা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পর্যবেক্ষকরা বলছেন বিনা ভোটের সরকারের আদালতে তারেক রহমানের বক্তব্য বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রচারে আর কোন বাধা রহিল না। এখানে প্রতীয়মান হলো আদালতের নিষেধাজ্ঞার চাইতে তারেক রহমানের ফোনকলই অনেক অনেক শক্তিশালী।

সাত. মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে মঙ্গল শোভা যাত্রায় যাওয়ার জন্য এই প্রথম অফিসিয়াল নির্দেশ দিল বিনা ভোটের সরকারের, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। তাতে কিছু কিছু মাদ্রাসা মঙ্গল শোভা যাত্রায় অংশগ্রহণ ও করল। মানুষ এ কি দেখল?

আট. চট্রগ্রামে একটি কোচিং সেন্টারে ২০ লক্ষ টাকার জন্য মারধর করে চট্রগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি। ছবিসহ সারাদেশে খবরটি ভাইরাল হবার পর তাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিস্কার করা হয় কিন্তু পরের দিন থেকে অনেক পত্র পত্রিকায় দেখা যায়, অনেক মন্ত্রী এমপিরা তার বিভিন্ন গুণগান গেয়ে তাকে নির্দোষ বলে পুরুস্কৃত করার চেষ্টায় রত হন, অবস্থার দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হচ্ছে এশার ঘটনার পুনরাবৃত্বি হতে যাচ্ছে?

নয়. একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ভারত সফর করে এলেন। এ যেন করদ রাজ্য থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে এক ঝাঁক পেঙ্গুইন সেজে, ভৃত্য উপঢৌকন নিয়ে হাজিরা দিয়ে এলেন মহাধীরাজের দরবার থেকে।

যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা ও বন্দক দিয়ে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় তারা গদগদ। ঢাকায় ফিরে ভারতের এম্বাসেটারের ভূমিকায় খুশিতে গদগদ হয়ে জানালেন "আগামী নির্বাচনে ভারত আমাদের কোন ইন্টারফেয়ার করবে না। দেশবাসীর প্রশ্ন, কাদের সাহেব ভারতের এম্বেসেডারের দায়িত্ব পেয়ে গেলেন নাকি? তাই এ দেশের মানুষ আজকের মীরজাফর আর আজকের লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মাদের চিনতে আর কষ্ট হচ্ছে না মোটেই।

দশ. ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান লঙ্ঘন করে, তৎকালীন প্রধান বিচারপতিকে অনুপস্থিত রেখে, তড়িঘড়ি করে স্পিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। আজ আবার ৪৬ বছর পর সেই ৭২ সালের, সেই কলঙ্কিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন, মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদকে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতিকে দর্শক সারিতে রেখে, স্পিকার কর্তৃক শপথ গ্রহণের মাধ্যমে। এতে মুজিব কন্যা পুরোপুরি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন পিতার সেই বাকশালীয় পথে হাঁটছেন। ব্যবধান শুধু এখানে শেখ মুজিব ৭২ সালে তৎকালীন বিচারপতিকে অনুপস্থিত রেখে ছিলেন, আর মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা প্রধান বিচারপতিকে দর্শক সারিতে রেখেই কাজটি সমাধান করলেন। এখন দেখার বিষয় এই হাঁটা কত দূর? উল্লেখ্য ৭৫ এর ১৫ ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে আজীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণার সব আয়োজনই চূড়ান্ত ছিল কিন্তু ইতিহাস বলে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, ঘটে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত ১৫ই আগস্ট। কেমন করে যেন সে কাল আর এ কাল আজ আবার মিলে গেল। আজ আবার আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হানিফ সাহেব ঘোষণা দিলেন, শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে থাকবেন তত দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। অর্থাৎ সেই আজীবন!এখন দেশবাসীর প্রশ্ন, মুজিব কন্যা কি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই ভয়ংকর বাকশালীয় পথে হাঁটছেন?

এগার. এ দিকে নৌমন্ত্রী শাজাহান খান অতি সম্প্রতি এক জনসভায় ঘোষণা দিলেন "বাংলাদেশে বিএনপি জামাত ও শিবিরের নতুন প্রজন্মকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে না।" তা হলে কি আরেক ধাপ এগিয়ে বাকশালীয় হাঁটা শুরু করলেন?

বারো. সম্প্রতি লন্ডনে বাংলাদেশের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে চ্যানেল ফোর এর প্রতিনিধি এলেক্স থমসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে প্রশ্ন করলে, শেখ হাসিনা কোন উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ থাকেন। কিন্তু লন্ডনের দলীয় অনুষ্ঠানে বড়াই করে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, ব্রিটেনের সাথে তাহার কথা হয়েছে তারেক রহমানকে যে ভাবে হউক দেশে নিয়ে সাজা কার্যকর করবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন তথ্য নির্ভরশীল খবর ছাড়া এসব বেহুদা। অনেকে মনে করেন আসলে বিনা ভোটের প্রধানমন্ত্রীর এমন সব বক্তব্য ছিল, লন্ডনের বিভিন্ন থেরাপির জন্য উন্মাদ হয়ে এসব রাজনৈতিক স্টান্ডবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। তের. পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম তারেক রহমানের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে, ভুয়া অসত্য ও ভুলে ভরা ডকুমেন্ট প্রকাশ করে জাতির কাছে হাস্যরসে পরিণত হয়ে, শেষ পর্যন্ত তাহার ভেরিফাইড ফেইস

বুক আইডির টাইম লাইন থেকে তারেক রহমানের নাগরিকত্ব সম্পর্কীয় পোস্টটি নিজেই ডিলেট করে হবু চন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী সাজলেন বৈকি।

পাঠক, উপরোক্ত ঘটনাবলী এক মাস, দুই মাস বা ছয় মাসের নয়, এই ঘটনাগুলো অতিসম্প্রতির উল্ল্যেখযোগ্য ঘটনা। এ সমস্ত বিষয়গুলো একত্রিত করে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় দেশটি এখন হবু চন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের দেশ। সব মিলে বিনা ভোটের সরকারের হবু রাজা আর গবু মন্ত্রীদের লক্ষণ তেমন ভালো দেখাচ্ছে না। তাই তারা জীবন মরণ দৌড়ে আছে। এ কালের মীরজাফর আর লেন্দুপ দর্জির প্রেতাত্মাদের ভারতের পথে দৌড় দেখে, কেন যে অনেকেরই মনে শঙ্কা জাগছে। তবে আমি বলবো হারিকেনের কেরোসিন যখন একদম তলায় পড়ে যায় তখন কিন্তু হারিকেনের আগুন জ্বলে ধব ধব করে, আজ কেন যে আমার কাছে বিনা ভোটের সরকারকে এমনি মনে হচ্ছে। প্রয়োজন শুধু একটি বিপ্লব। সে বিপ্লব হতে হবে ইরানীয় বিপ্লব! তার জন্য নব্য প্রজন্ম তরুণ যুব সম্প্রদায়কে জাগ্রত হতে হবে।

এ ছাড়া ইতিহাস বলে, কারো ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। প্রকৃতির নিয়মে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে। তবে কেউ বিদায় নেয়, ইতিহাসের কালো পাতায় বন্দি হয়ে আর কেউ বিদায় নেয় ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত হয়ে।

প্রকাশকাল : এপ্রিল ৩০, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা মানে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা, খালেদা-ই গণতন্ত্রের প্রতীক

এক

নিপীড়ন, নির্যাতন, লাঞ্চনা, বঞ্চনার শেষ কোথায়? এত সব লাঞ্চনা বঞ্চনা কাকে? তা-ও সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে?

যিনি তাঁহার স্বামী শহিদ জিয়ার মৃত্যুর পর, শহিদ জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামান্য গৃহবধূ থেকে ৩৬ টি বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। যিনি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কে বুকে ধারন করে গণতন্ত্র কে পুনরুদ্ধার করেছেন। জাতির কাছে আপসহীন নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন। শাসক গোষ্ঠী যাকে বালুর ট্রাক দিয়েও আটকিয়ে রাখতে পারে নাই। অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় বাসার বিদ্যুৎ লাইন কেটে, সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েও তাঁহাকে স্তব্ধ করতে পারে নাই। তাঁকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে পরিকল্পিত সাজা দিয়ে জেলে রাখা হয়েছে সদ্য এক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল! বারবার গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কারাগারে বসবাস করছেন 'গণতন্ত্রের প্রতীক' হয়েছেন। সবাই-ই এক শ্বাসে বলতে পারি, তিনি আর কেহ নন, তিনি হলেন, "বাংলাদেশের সব চাইতে জনপ্রিয় নেত্রী, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া। যেই মানুষটি ১/১১ সময়ে কারান্তরীন জীবনে হারিয়েছেন তাঁহার মমতাময়ী মা এবং তাঁহার অতি আদরের প্রিয় ভাই ও বোনকে। অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় শাসক দলের ষ্টীম রোলারে প্রাণ দিতে হয়েছে, তাঁহার নাড়ি ছেঁড়া ধন,

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র আরাফাত রহমান কোকো-কে। বড় সন্তান তারেক রহমান কে পঙ্গুত্ব নিয়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বাহিরে থাকার পরও অন্যায় ভাবে সাজা দিয়ে দেশে আসার পথ বন্ধ করে রাখে।

ফ্যাসিস্ট সরকার তার নিজের নামের সব মামলা গুম করে ৭৪ বৎসর বয়স্ক আর্থাইটিস সহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় পরিকল্পিত সাজা দিয়ে জেলবন্ধী করে রাখে। কারাবাসে বছরের উপরে হয়ে গেল। এখানেও ক্লান্ত নয়...আরো অনেকগুলি মামলা। এই বয়সে জটিল রোগ নিয়েও হুইল চেয়ারে করে প্রায় প্রতি সপ্তাহে-ই হাজিরা দিতে হয় এবং ঘন্টার ঘন্টা অনর্থক বসে থাকতে হয় ক্যাঙ্গারু কোর্টে। এত সব নির্যাতন, ডাক্তারীর সময়ে ডাক্তার নাই তা-ও হাউ মাউ করে একদিন দেখানো হয় পরে আবার ডাক্তারের জন্য সেই হাউমাউ! সবই পরিকল্পিত নির্যাতন।

হায়রে নির্মমতা! হায়রে বর্বরতা! নির্মমতা ও বর্বরতার একটা সীমা থাকে। সবই যেন অতিক্রম হয়ে গেছে। একজন সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রীকে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, আর কত লাঞ্চনা ও বঞ্চনা পোহাতে হবে?

আজ ভাবতেই অবাক লাগে...যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তাঁহার স্ত্রী, একজন বীর উত্তমের স্ত্রী, বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, যিনি বটমলেস বাস্কেট থেকে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি এত সব লাঞ্চনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন কেন? কারণগুলো তা আজ জাতির সামনে পরিষ্কার। ১. অবৈধভাবে বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা ভোগ করা। ২. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা নিজের ইচ্ছে মতন করে নেওয়া। ৩. সেই বাকশাল ও সেই এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

বাধা শুধু...বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। কারণ...এই দলের নেতাই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এই দলের মাধ্যমে বারবার দেশ সংকট থেকে মুক্ত হয়েছে, গণতন্ত্র প্রবর্তন হয়েছে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে, এখনও গণতন্ত্রের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে হিসাব পরিষ্কার। তাই সে জন্য বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত হয়েই জিয়া পরিবার এবং জিয়ার দলকে চিরতরে শেষ করার একটা অভিপ্রায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে? ফ্যাসিস্টদের হীন চক্রান্ত কখনও সফল হয় না।

দুই

গত ৩০ ডিসেম্বরের ২০১৮ নির্বাচনটি শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছা মতই করে নিল। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী, গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি রেখে সাথে ৭০ হাজারের অধিক নেতাকর্মী দের জেলে রেখে, লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীর মাথায় গায়েবী মামলার হুলিয়া জারি করে, নির্বাচনী মাঠকে পাহাড় সম ব্যবধান করে, এবং নির্বাচন কমিশন সহ প্রশাসনের সব কটি ডিপার্টমেন্ট কে দলীয় সূত্রে ব্যবহার করে, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ পৃথিবীর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ভোটের আগের দিন রাতেই ৬৬% ভোটের বাক্স ভরে নির্বাচনটি সম্পূর্ণ করে। অতঃপর ভোট ডাকাতির নির্বাচন হিসাবে বিশ্ব মিডিয়া সহ বিশ্বময় সয়লাব হয়ে যায়।

এখানেই শেষ নয়...তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৭জন প্রার্থীকে কারাগারে থাকতে হয়েছে, ৫০ জনের মতো প্রার্থীকে পুলিশ ও সরকারের ক্যাডার বাহিনী দ্বারা মারাত্মক আহত হয়েছে, অনেকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। প্রায় ৪৬জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ভয়ভীতির মাধ্যমে মাঠেই নামতে দেওয়া হয় নাই এবং ৫৭জন প্রার্থীকে মামলা দিয়ে দৌড়ে রাখা হয়। এই ছিল নির্বাচনের পূর্ব মহুর্তগুলি। সব মিলে ফ্যাসিস্টরা ৩০ ডিসেম্বর একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে গেছে।

এখন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ১০/১২ বৎসর একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার বাহিরে থাকলে সাধারণত দেউলিয়া হয়েই যাওয়ার কথা। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের এত সব নিপীড়ন নির্যাতনের পর। কিন্তু আওয়ামী লীগ অবৈধ ক্ষমতা ভোগ করে, এ ধরনের একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন করে আসলে আওয়ামী লীগ নিজেই দেউলিয়া হয়ে গেছে।

এতদিন মানুষ জানত, মাঠের বিরোধী দল বিএনপি ও ২০ দলীয় জোট। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোট দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে, প্রমাণ করে ফেলেছে, জনগণ বিরোধী দল।

রাজনৈতিক আরো পর্যবেক্ষকরা বলছেন...এই ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ মূলত হেরে গেলেন এবং বেগম খালেদা জিয়াই জিতে গেলেন। কারণ বেগম খালেদা জিয়া জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কারাবাসে থেকে এত সব লাঞ্চনা বঞ্চনার পরও শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য, এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য, তাঁহার দৃঢ় চেতা মনোভাব জাতিকে প্রমাণ করতে আবারও সক্ষম হয়েছেন।

এখন দেশের প্রজন্ম তরুণ যুব সমাজ থেকে শুরু করে প্রতিটি সমাজ ও প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য দেশমাতা গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা। বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা মানে গণতন্ত্র কে মুক্ত করা। খালেদা-ই এ দেশের গণতন্ত্র, খালেদা-ই গণতন্ত্রের প্রতীক। আগামীর বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ খালেদা জিয়াই হবেন চতুর্থ বারের মতন প্রধানমন্ত্রী।

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২২, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

এ কোন হিংস্রতা, বর্বরতা! এর শেষ কোথায়?

এক

আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে, প্রেস ক্লাবের মত একটি স্পর্শ কাতর স্থানে কারাবন্দি দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে, শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে... ডি বি পুলিশের এ কোন হিংস্রতা বর্বরতা? একাত্তরের বর্বরতা হার মেনে গেছে, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর বর্বরতার প্রতিচ্ছবি ফুঠে উঠছে। এই ফুটেজগুলা দেখে বিশ্ব মানবতা আজ থর থর করে কাঁপছে। ৮ই মার্চ ২০১৮, একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচির মধ্য স্থান থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীর সামনে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সভাপতি মিজানুর রহমান রাজকে টেনেহিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ। দলটির মহাসচিব কে জড়িয়ে ধরে ও শেষ রক্ষা পায়নি রাজ! মহাসচিব সহ হাজার হাজার নেতাকর্মী অসহায় রোহিঙ্গাদের মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে রহিল এই নির্মম হৃদয়বিধারক ঘটনাটি। উল্লেখ্য এখানে কারাবন্দি দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়ার কঠোর নির্দেশ...সব কর্মসূচি যেন হয় শান্তিপূর্ণ, কাহার-ও ফাঁদে যেন পা না দেওয়া হয়। সম্ভবত সরকার চাচ্ছে দলকে সহিংস আন্দোলনে জড়াতে। কিন্তু না তারা হাই কমান্ডের সাথেই অনড়।

এখন প্রশ্ন... এ ভাবে ডি বি পুলিশের অত্যাচার নির্যাতন হিংস্র বর্বরতা ও নগ্নতা আর কত সহ্য করবে দলটি? এটা অনেকের-ই প্রশ্ন...। দলটি দেওয়াল চাপতে চাপতে দেওয়ালের ভিতর চলে গেছে। দেখা যাক, এখন সময়ই বলে দিবে কোন দিকে যাবে? এ দিকে ডি বি পুলিশ এখন আর ডি বি নয়, ওরা আর বি তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ রক্ষী বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কারণ সাধারন মানুষ এখন বলছে, আজকের ডিবির মধ্যে ৭৫ পূর্ব সেই রক্ষী বাহিনীর প্রতিচ্ছবি ফুঠে উঠছে। তাদের এই গত কয়দিনের হিংস্র বর্বরতায় জাতি এখন স্তম্ভিত! সাধারণ মানুষ রীতিমত হতবাক!

দুই

পাঠক, সর্ব স্তরের মানুষ জানে, প্রেস ক্লাব একটি নিরপেক্ষ ও স্পর্শকাতর স্থান। এখানে ডি বি পুলিশ অস্ত্র উঁচিয়ে ছোটাছুটি করে অভিযান পরিচালনার ঘটনা নজিরবিহীন! উল্লেখ্য সাদা পোষাকধারী পুলিশের অভিযান পরিচালনারর নামে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ সহ নানাবিধ অপরাধমূলক ঘটনা সংগঠনের অভিযোগ উঠায়, ইতোপূর্বে সাদা পোশাকে ডি বি পুলিশের অভিযান পরিচালনা ও ওয়ারেন্ট বিহীন গ্রেপ্তার করা, হাইকোর্ট কতৃর্ক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পরও সন্ত্রাস ও আতঙ্কজনক অবস্থা সৃষ্টি করে বিএনপি সিনিয়র নেতা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালকে (নয়া পল্টন অফিসের সামন থেকে) স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শফিউল বারী বাবু (দুই দিন আগে) ও ছাত্রদল নেতা মিজানুর রহমান রাজকে সশস্ত্র কমান্ড স্টাইলে চোর-ডাকাতের মতো টেনেহিঁচড়ে বিএনপি ও ২০ দলীয় জোটের সিনিয়র নেতাসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীর সামন থেকে ধরে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে সন্তান যে ভাবে একজন বাবাকে জড়িয়ে ধরে, সেই ভাবে জড়িয়ে ধরেও তাহার গ্রেপ্তার এড়াতে পারে নাই। টেনেহিঁচড়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে হাতে পা বেড়ি দিয়ে ডি বি পুলিশ নিয়ে যায়। সারা জাতি প্রত্যক্ষ করেছে এসব নির্মম দৃশ্য। এ সব কিসের আলামত বহন করে? আর কেন-ই বা তারা এত উৎসাহী হয়ে এমন করছে? জাতি উদ্বিগ্ন! এ কোন জাতীয় বর্বরতা নৃশংসতা ও নগ্নতা? এর শেষ কোথায়? এ সব প্রমান করে সত্যিই আজ দেশ বেদখল হয়ে গেছে।

একটি ৫ জানুয়ারির অবৈধ নির্বাচন দেশটিকে বেদখল করে গেছে। ধ্বংস করেছে মানবতা, মানুষের অধিকার, মানুষের স্বাধীনতা। নেই গণতন্ত্র, নেই বিচার। রাষ্টের প্রতিটি যন্ত্র কে করা হয়েছে মৃতবৎ।

এখন চলছে আরেকটি ৫ জানুয়ারির মত নির্বাচনের পায়তারা...যার জন্য এত সব! দেশের মানুষ অবশ্যই এ সব অবগত।

এই মুহূর্তে একটি দেশের সব চাইতে জনপ্রিয় দলের, জনপ্রিয় নেতাকে মিথ্যা বানোয়াট মামলায় জেলে রেখে, আর দলের নেতাকর্মীকে কোন সভা-সমাবেশ করতে না দিয়ে, এমন কি মানববন্ধনের মতন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করতে না দিয়ে, দলের অফিসের সামনে কালো পতাকা প্রদর্শনে বাধা দিয়ে, প্রেস ক্লাবের মতো স্পর্শ কাতর এরিয়ায় ডি বি নামধারী পুলিশরা হাত উঁচু করে অস্ত্র চালিয়ে, হাজার হাজার নেতাকর্মী মধ্য থেকে টেনেহিঁচড়ে শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেল ভর্ত্তি করবেন।

আর অপরদিকে...সরকারি দলের নেতারা ঢাকঢোল বাজিয়ে, স্কুল কলেজ অফিস আদালত বন্ধ করে দিয়ে বড় বড় সভা সমাবেশ করবেন সোরওয়ার্দী উদ্যানে এবং সরকারি খরছে হেলিকাপ্টারের পাখার সাথে নৌকাকে বেঁধে নিয়ে আকাশে উড়ে দেশময় নির্বাচনের জন্য ভোট চাইবেন। এ কোন গণতন্ত্র? এ কোন নির্বাচন? সাবাশ আওয়ামী লীগ! সাবাশ নির্বাচন কমিশনার! মানুষ এত বোকা নয়! জাতি এ সব মানবে না। আর ৫ জানুয়ারির মতো কোন নির্বাচন এদেশে করতে দিবে না। ২০১৪ সাল আর ২০১৮ সাল এক নয়। অতীতের ন্যায় মানষের অধিকার, মানুষের গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতা জনগণ ফিরে আনবেই আনবে।

তিন

আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ঢাকঢোল পিঠিয়ে পালন করলো সরওয়ার্দী উদ্যানে। সমাবেশ থেকে ফেরার পথে রাস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেক নারীর কাপড় খুলে আমোদ করলো যুবলীগ ছাত্রলীগ কর্মীরা। বাদ গেল না ছাত্রলীগের ছাত্রীরাও! সমাবেশ শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যায় ৬/৭ জন মেয়ে তাদের হ্যারাস মেন্টের কথাগুলু ফেসবুকে স্ট্যাটাসের মাধ্যমে তুলে ধরলো জাতির সামনে...রাতের ভিতরেই ভাইরাল হয়ে যায় সারা দেশে, সোনার ছেলেদের বর্বরতা ও নগ্নতা! দেশ আজ বহুবিধ হিংস্রতা বর্বরতা ও নগ্নতায় আক্রান্ত।

খুব ফুর্তি আমোদ করে সমাবশে যেতে আসতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় গ্রুপ বেঁধে বেঁধে মেয়েদের হ্যারাস করে রাজধানী কে তাদের জন্য এক আনন্দ উৎসবের নগরীতে পরিণত করেছিল।

এ সব দেখে এক মুরুব্বি দুঃখ করে বলছিলেন, ঠিক আছে, বের হইছো কেন বাসা থেকে, জানো না আজকে রাস্তায় বেশি ছেলে থাকবে? মেয়েটি বলছিল...” আল্লাহ কেন মেয়েদের মাত্র দুটি হাত দিলো? দুটি হাত থেকে বুক পেট বাঁচাবো না কি কোমর পিঠ বাঁচাবো? ওড়না ধরে রাখবো না কি তাদের হাতগুলি সরাবো?

আরেকজন মেয়ে বলছিলেন, একটা পুলিশ অফিসার এই মলেস্টিং চক্রে ঢুকে আমাকে বের করে এন্ড একটা বাস থামিয়ে বাসে তুলে দেয়। বাকিটা পথ সেইফলি আসছি। প্রচণ্ড শরীর ব্যথা ছাড়া আর কোন কাটা ছেড়া নাই। মেন্টালী ভয়াবহ বিপর্যস্ত বাট শাররীক ভাবে ভালো আছি। আমি এই শোয়ারদের দেশে থাকবো না। জয় বাংলা বলে যারা মেয়ে মলেস্ট করে, তাদের দেশে আমি থাকবো না, থাকবো না, থাকবো না। পাঠক, জাতি বহুবিধ বর্বরতা নগ্নতায় বিপর্যস্ত। এ হিংস্রতা ও বর্বরতায় দেশ ও জাতিকে বার বার উলঙ্গ করছে, শুধু অবৈধ ক্ষমতায়, এদের কাছে দেশ ও জাতি নিরাপদ নয়। সেদিন রাষ্টপতি বললেন, প্রশ্ন পত্র ফাঁস কারীদের ফায়ারিং স্কোয়াডে দেওয়ার জন্য। শুনে মানুষ খুশি হয়েছে। এ ধরনের অসভ্য বর্বরোচিত কাজ যে শুয়োরেরা করবে, তাদেরকে যদি রাষ্টপতি ফায়ার স্কোয়াডের জন্য আইন করতেন, জাতি চির কৃতজ্ঞ হতো।

চার. জনগনের নিরাপত্তার জন্য, জনগনের ট্যাকসের টাকায় পরিচালিত হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাবেশে আতঙ্কজনক অবস্থা তৈয়ার করা ডি বি পুলিশের কাজ হতে পারে না। এমনিতেই আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতা প্রবল। এ ধরনের ঘটনা সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নাগরীকের মানবধিকার ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্য করে...ডি বি পুলিশের এমন অভিযান বন্ধ হওয়া অতীব প্রয়োজন। আতঙ্ক সৃষ্টি নয়...গুম-অপহরণ, মানবধিকার ও আইন লঙ্ঘনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর

ব্যবস্থা গ্রহণ করাই মূল দায়িত্ব। একটা দেশের পুলিশ বাহিনী যতই রাজনৈতিক প্রভাবের ভিতর থাকুক না কেন? তবুও সে দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুলিশই শেষ ভরসা। তাদের মনকে প্রশ্ন করতে হবে...দেশ কোথায় যাচ্ছে? আমরা কোথাকার নাগরিক? আমরা তো ভুটান সিকিম হতে চাই না? তখন উত্তর পেয়ে যাবেন। আমরা এ দেশেরই নাগরীক। আমার আপনার সবার কাজ হবে, এ দেশের মানুষের ভালো মন্দ দেখা। আমরা কেউই একদিন থাকবো না, কিন্তু আমাদের সন্তানাদি থাকবে, বংশ বুনিয়াদ থাকবে, তারা যাতে একটি সুন্দর বাংলাদেশে থাকতে পারে সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশ এখন কঠিন সময় পার করছে। বিশেষ করে এই মহূর্ত্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা দেশ ও জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন।

প্রকাশকাল : ১০ মার্চ, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

একজন গণতন্ত্রের প্রতীককে প্যারোলে মুক্তি নয়, জামিনে মুক্তি-ই তার অধিকার

এক

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য, যে মানুষটি এ যাবৎ সব চেয়ে বেশি নিপীড়িত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া।

যিনি ৭৩ বৎসর বয়সে বিভিন্ন বার্ধক্য জনিত রোগে আক্রান্ত হয়েও, পরিবার পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও গণতন্ত্রের জন্য ফ্যাসিষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, আজ কারারুদ্ধ হয়েও অন্ধকার প্রকোষ্ট থেকে যুদ্ধ করছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, যে ত্যাগ তিতিক্ষার উদাহরণ দেখিয়েছেন এবং দেখিয়ে যাচ্ছেন গণতন্ত্রের প্রতীক বেগম খালেদা জিয়া। আজ তা শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বর্নাক্ষরে রক্ষিত থাকবেন।

সদ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি প্রসঙ্গে বলছেন, "বেগম খালেদা জিয়ার পরিবার থেকে যদি প্যারোলে মুক্তির কাগজপত্র দেওয়া হয়, তা-হলে আমরা বিবেচনা করব।" পাঠক, এ প্রসঙ্গটা লেখার জন্যই আসলে আজকে আমার এই লিখা।

এই প্রসঙ্গে মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, "দেশনেত্রীর মুক্তির জন্য আমরা প্যারোলের কথা বলিনি। আমরা জামিনে তাঁর নিঃশর্ত

মুক্তির কথা বলেছি।" আর বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু তাঁহার নিয়মিত অঙ্গ ভঙ্গিমায় সুন্দর করে বলেছেন, "আপনার সরকার যদি পদত্যাগ পত্র দেয়, আমরা ভেবে দেখব আপনাদের শাস্তি জেলের ভিতরে হবে না জেলের বাহিরে হবে।"

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। গত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের ঠিক দুই দিন আগে বিএনপির দুইজন নেতা (মধ্য মাপের) তারা কথা কাটাকাটি করছিলেন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়া। তাদের তর্কের বিষয় ছিল, এই নির্বাচনে বা নির্বাচনের নামে আন্দোলন যদি কোন ভালো রিজাল্ট না হয়। অর্থাৎ যদি আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় চলে যায়। তখন খালেদা জিয়ার কি হবে? একজন বলছিলেন খালেদা জিয়া আপোষে ডাক্তারির জন্য লন্ডন চলে যাবেন আর অপরজন তাহার যুক্তি তর্কে মোটামুটি একমত হয়েছিলেন। আমি কিন্ত তাদের পাশেই বসা সবই শুনছিলাম। পরিশেষে হেসে হেসে তাদেরকে বলছিলাম, " আপনারা খালেদা জিয়ার দল করেন ঠিক কিন্তু আপনারা আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে চেনেন নাই। তবে বেগম খালেদা জিয়াকে ভালো করে চেনে এদেশের তৃর্ণমূল নেতাকর্মী। যাক এদিকে আর যাচ্ছি না।

মূল বিষয়ে চলে আসি... পাঠক, ১/১১ এর সময়ে মঈন-ফখরু সরকার যখন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ পাঠানোর জন্য বিভিন্ন খেলায় মেতে উঠছিল এবং আপসহীন নেত্রীকে সেরা প্রলোভন দেখিয়েও ব্যর্থ হতে চলেছিল। আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কিন্তু সহজেই লন্ডন আমেরিকা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু সেইদিন সেনা সরকারের চাল বুঝেই দেশ না ছাড়ার পক্ষে অনড় ছিলেন। সেদিন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, "দেশের বাহিরে আমার কোন ঠিকানা নাই। যখন অনেকটা ফোর্স করে বিমানে তুলার চেষ্টা করছিল তখন তিনি বাংলার চির সবুজের মাটিকে আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, "আমি আমার মায়ের দেশেই থাকব, আমি আমার স্বামীর স্বপ্নের দেশেই থাকব, আমার দেশ আমি ছেড়ে চলে যাব না, আমি আমার ষোল কোটি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই, আমার দুই সন্তানকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম।" অতঃপর যখন সেনা সরকারের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চললো পরিশেষে আপসহীন নেত্রীকে শেষ প্রশ্ন করেছিল...মাডাম আপনার সন্তান বড় না দেশ বড়? আপসহীন নেত্রী কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। গণতন্ত্রের প্রতীক, আপসহীন নেত্রী সেই দিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'দেশ বড়'। তারপরই শুরু হয় তাঁহার সন্তানদ্বয়ের উপর পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নির্যাতন। এক সন্তান ফ্যাসিষ্টের নির্যাতনে অকালে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় আর আরেক সন্তান পঙ্গু হয়ে লন্ডনে

চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। সেই আপোসহীন নেত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ প্যারোলের বাণী শুনাচ্ছেন। আসলে অবাক লাগে! বেগম খালেদা জিয়া যে কত বড় মাপের নেতা ক্ষমতা লিপ্সুরা এখনও ভালো করে জানেও নাই বুঝেও নাই। তারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। তবে এদেশের মানুষ কিন্তু ভালো করেই জানে বেগম খালেদা জিয়াকে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের এক প্রাণ, বেগম খালেদা মানেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র। আজ হাটে মাঠে ঘাটে সাধারণ মানুষ বলছে, একজন গণতন্ত্রের প্রতীককে প্যারোলে মুক্তি নয়, জামিনে মুক্তি ই তার অধিকার। এছাড়া ও সেনা সরকারের সময়ে কারান্তরীন থাকা অবস্থায় হারিয়েছেন তাঁহার মমতাময়ী মা এবং তাঁহার প্রিয় ভাই ও বোনকে। হারাতে হয়েছে স্বামীর হাতের ৪০ বৎসরের তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি। আজ ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষটি তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দুই বারের সাবেকবিরোধী দলের নেত্রী, ৩৬টি বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য একাধারে লড়াই করে যাচ্ছেন এবং যিনি একজন স্বাধীনতা ঘোষকের স্ত্রী, একজন বীর উত্তমের স্ত্রী, বাংলাদেশের প্রথম প্রসিডেন্টের স্ত্রী হয়েও সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত মামলায় বন্দি রেখে, আজ নির্লজের মতন দখলদার সরকার প্যারোলের মুক্তির গান শুনাচ্ছে। কাকে শুনাচ্ছে? যার স্বামী শহিদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রবর্তন করে আওয়ামী লীগ নামক দলটি পূর্ণজন্মের সুযোগ করে দিয়ে ছিলেন, তাকে? যে নেত্রী নয় বৎসর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে বিশ্বজুড়ে আপসহীন নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন, তাকে? ক্ষমতা কারো চিরস্থায়ী নয়। কোন ফ্যাসিস্টদের হীন চক্রান্ত কখনও সফল হয় নাই।

দুই

পাঠক, আজ ইতিহাসের পিছনের পাতা একটু দেখে আসি। বিশেষ কারণে... আজ থেকে ২৬২ বৎসর আগের কথা! ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য, জাতীয়তাবাদের সূর্য! সেই দিন মীর জাফরদের বিশ্বাস ঘাতকতায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্য তছনছ হয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না। আজও কিন্তু সেই মীর জাফররা পিছন ছাড়ে নাই। অতএব সাবধান জগৎ শেঠ, ঘসেটি বেগম ও মীর জাফরদের পেতাত্মা এখনও জীবিত! ক্লাইভ তার আত্ম জীবনীতে লিখে গেছেন, "রাজধানী মুর্শিদাবাদে সব চেয়ে নিচের ধনী ব্যক্তির যে ধন সম্পদ রয়েছে, সেই পরিমান ধনসম্পদ লন্ডনের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিরও নাই।" পর্দার অন্তরালে কিন্তু কাজ করছিল রায়-রাম-চাঁদ- শেঠদের চক্রান্ত।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন হলো, এ জাতির জন্য মহা কলঙ্কের দিন, পাশাপাশি জাতির জন্য মহা একটি শিক্ষনীয় দিন। এখনই সময় পলাশীর ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সংগ্রাম এবং গণতন্ত্রের মুক্তির সংগ্রামের শপথ নিতে হবে। অন্যতায় আবারও বিপর্যস্ত হবে।

প্রকাশকাল : বুধবার, ১০ এপ্রিল, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

যদি হতে পার কবি নজরুলের মতো 'আমি সৈনিক' তবেই মুক্ত খালেদা জিয়া, তবেই মুক্ত এদেশের গণতন্ত্র

এক

কাজী নজরুল ইসলামের...অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, মরুভাস্কর, সাম্যবাদী, সঞ্চিতা, সন্ধ্যা, জিঞ্জির, প্রলয় শিখা, দোলন চাঁপা, সিন্ধু হিন্দোল, ছায়ানট, দুর্দিনের যাত্রী, ঝিঙে ফুল, চন্দ্রবিন্দু ও নতুন চাঁদ, এভাবে অগণিত কাব্যগ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, ও মহাকাব্য গুলি যাকে চির অমর করে রেখেছে, তিনি হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আজ ২৪ মে তাঁহার ১২০তম জন্মবার্ষিকী। লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় কবি, অমর কবি, বিদ্রোহী কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং সাথে বিনম্র শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালোবাসা জানিয়ে, তাঁহার ঐতিহাসিক "দুর্দিনের যাত্রী " "গ্রহের" আমি সৈনিক প্রবন্ধটি দিয়ে আজকের আমার রচনা শুরু করছি।

এখন দেশে সেই সেবকের দরকার, যে সেবক সৈনিক হতে পারবে। সেবার ভার নেবে নারী কিংবা সেই পুরুষ, যে পুরুষের মধ্যে নারীর করুণা প্রবল। নারীর ভালোবাসা আর পুরুষের ভালোবাসা বিভিন্ন রকমের। নারীর ভালোবাসায় মমতা আর চোখের জলের করুণাই বেশি। পুরুষের ভালোবাসায় আঘাত আর বিদ্রোহীই প্রধান। দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়তো "মহাপুরুষ"। কিন্তু দেশ এখন চায়...সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবাসে শুধু চোখের

জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে, আঘাত করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।

দুই

পাঠক...দেশের মানুষ কিন্তু সরকারের বিভিন্ন রকম অনাচার অত্যাচারের দরুন অতিষ্ঠ হয়ে গণবিপ্লব মূখী হয়ে আছে। কিন্তু হলে কি হবে? মাঠের বিরোধী দল আছে নিরামিষ রাজনীতি আর নিরামিষ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। তৃর্ণমূল নেতাকর্মীরা যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে না। দিন দিন বড় নেতাদের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস লোপ পাচ্ছে। কারণ চেয়ার পারসন বেগম খালেদা জিয়া আজ ১৫ মাসের উপরে হয়ে গেছে কারাগারে। বড় নেতাদের বক্তব্য শুনতে শুনতে নেতাকর্মীদের কান ব্যথা হয়ে গেছে। নেতাদের কাছ থেকে কোন কর্মসূচি আসে না। শুধু হলে হলে গিয়ে সান্ত্বনা বক্তব্য, বড়জোর মানব বন্ধন, নেতাকর্মীদের মাথায় হাত বুলানো, সভা সেমিনারে চোখের জল ফেলা, আর অসুস্থ বা জখম হলে হাসপাতালে রোগী দেখা। আমার প্রিয় কবির ভাষায়... এই মুহূর্তে সেই সেবকের দরকার নাই। এখন প্রয়োজন আমি সৈনিক সেবকের।

পাঠক... কবি কিন্তু এখানে আমি সৈনিক প্রবন্ধটির মাধ্যমে খুবই চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন দেশ সেবার দুটি পথ। একটি হলো স্নেহময়, প্রেম, ভালোবাসা আর অন্যটি হলো আঘাত, প্রতিঘাত ও বিদ্রোহ। কবি এখানে পরিষ্কার করে বলে গেছেন... যে নারীর করুণা স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি নিয়ে দেশকে ভালোবাসে সে পুরুষ নয়, হয়তো সে "মহাপুরুষ"। কিন্তু দেশতো আজ চায়... সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, হিংসা আছে, বিদ্রোহ আছে। যে পূজার নয়, ঘৃণার। যে দেবতার নয়, হিংসার।

কারণ... আজ এক এক করে দশ বৎসরের উপরে হতে চলছে, একটা ফ্যাসিবাদী সরকারের, একটি অবৈধ সরকারের, ষ্টিম রুলারে দেশের মানুষ হামলা, মামলা, হত্যা, খুন, গুম, ক্রসফায়ার, ব্যাংক ডাকাতি, ভোট ডাকাতি, ইত্যাদিতে গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মহা সঙ্কটের ভারে মানুষ দিশেহারা ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। শুধু তাই নয়, আজ একটি দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেত্রী, সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের প্রতীক, বেগম খালেদা জিয়াকে একটি ঠুনকো মামলায় সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে বিনা চিকিৎসায় ৭৩ বৎসর বয়সে জেলবন্দি করে রাখছে এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও অন্যায় ভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় রায় দিয়ে দেশান্তরে রাখছে।

অপরদিকে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁহার চোখের ছানি কাটানোর জন্য বিশাল বহর নিয়ে লন্ডনে গিয়ে কয়েক শত কোটি টাকা বাজেট করলেন।

এছাড়া তাহার ভাইরাল ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী সগৌরবেই বললেন, "বিএনপির তারেককে জানিয়ে দিয়েন, তারেক যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, তা হলে তার মা জীবনেও জেল থেকে বের হতে পারবে না।" এই হলো ফ্যাসিষ্টের অবস্থা!

আজ দেশটির ভাগ্য আকাশে কাল মেঘ জমা হয়ে আছে। বাংলাদেশ এযাবৎ সব চেয়ে কঠিন সময় পার করছে। এছাড়া হাওর পাড়ের কৃষক থেকে শুরু করে, গ্রামগঞ্জ শহরতক আকাশে বাতাসে সাধারণ মানুষের ক্রন্দন আর ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে।

তিন

এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতীক, আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড়ই প্রয়োজন। আজ এদেশের গণতন্ত্রকে উদ্ধার করতে হলে, বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্ধার করতে হবে। আর বেগম খালেদা জিয়াকে উদ্ধার করতে হলে...বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় প্রতিটি জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী মানুষকে "আমি সৈনিকের "ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাই কবি বলছেন, " দেশে এখন সেই সেবকের দরকার, যে সেবক সৈনিক হতে পারবে।

আজ লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণের কবি, বিদ্রোহী কবি, কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষকে "আমি সৈনিক " প্রবন্ধের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে, বলতে হবে..আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক।

আমি পূজার নই, আমি ঘৃণার। আমি অবহেলার, আমি অপমানের। আমি দেবতার নই, আমি হিংস্র, বন্য, পশু। আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি।

তবেই মুক্ত হবে বেগম খালেদা জিয়া, তবেই মুক্ত হবে এদেশের গণতন্ত্র।

প্রকাশকাল : শুক্রবার, ২৪ মে, ২০১৯

শীর্ষ খবর ডটকম

একজন প্রধানমন্ত্রী ও একটি ফোনালাপ, ইতিহাসের কালো পাতায় রক্ষিত থাকবে আজীবন

এক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের লন্ডন সফরটি অক্ষমাৎ ইমারজেন্সি ও সম্পূর্ণ গোপনে আয়োজন! তারই বড় প্রমাণ ভয়ংকর "ফণী" কে একদম চুঁইচুঁই রেখে, আঠারো কোটি মানুষের বিপদকে পরোয়া না করে লন্ডনের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়া। বিজ্ঞ মহলের মতামত, চোখের চিকিৎসার জন্য একজন রাষ্ট্র প্রধানের এ সময়ে এত তাড়াহুড়ার কোন দরকার ছিল না। বিভিন্ন বিশ্লেষণে এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, এটা চোখের চিকিৎসা নয়, কি যেন একটা নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলছে। আসলে এই খেলাটা কী? যদিও বলা হচ্ছে অফিসিয়েল সফর! কিন্তু দৃশ্যত অফিসিয়েল কিছুই নেই। ইন্টরেস্টেড ব্যাপার দলীয় নেতাকর্মীদের কেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

মূলত এটি একান্ত প্রাইভেট সফর। অফিসিয়াল বা সরকারি হলে রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে কেউ না কেউ এয়ারপোর্ট যেত। তা-ও দেখা যায় নাই। তার মানে এখানে পরিষ্কার এই সফর একান্ত প্রাইভেট ও লুকোচুরিপূর্ণ! এছাড়া অনেক ডিগবাজির পর শেষ পর্যন্ত "তাজ হোটেলে" শেখ হাসিনা উঠেছেন, সেই হোটেলে কিন্তু ভারতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন, "প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বাংলাদেশের, তা-হলে পতাকা ভারতীয় কেন? আবার বলা হচ্ছে এই হোটেলের পিছনে একটি ভাড়াকরা বাড়িতে আছেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে এই ধরনের লুকোচরিতায় অনেক প্রশ্নেরই জন্ম দিয়েছে। আসলে লন্ডনে কি হচ্ছে এবং কি ঘটছে?

দুই

পাঠক, পয়লা মে, বুধবার ২০১৯, লন্ডন সময় ৪-৫৫ মিনিটের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছে, হোটেলে যাওয়ার পথে যুক্তরাজ্য বিএনপির ডিমোস্টেশনের তোপের মুখে পড়েন। তখন শেখ হাসিনাকে বহন করা গাড়িটি ট্রাফিক সিগনালে আটকা পড়লে, ডিমোস্টেটাররা দুই মিনিটের সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ইচ্ছে মতন একদম নিকট থেকে ডিম ছুঁড়তে থাকে, সে সময় খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, কিলার কিলার, শেখ হাসিনা শেখ, হাসিনা বলে ঐ এলাকা মুখরিত করে তুলছিল তারা। কেউ কেউ খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই পোস্টার শেখ হাসিনার একদম চোখের সামনে গাড়ির গ্লাসে চাপ দিয়ে ধরে রাখছিল। শেষে পুলিশের সহযোগিতায় গাড়িটি গন্তব্য স্থানে চলতে শুরু করে।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষোভে ফেটে নিজ থেকেই যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কাছে ফোন করেন, তাজ হোটেলের সামনে অবস্থানরত নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সে জন্য আমি পরে কথা বলব! যখন আমি আমার চোখের অপারেশন পর...যখন আমি সুস্থ হবো তখন সবার সাথে দেখা করব। অহেতুক যেন হোটেলে ভিড় না করা হয়! এমনিই কোন হোটেলে বুকিং নিতে চায় না। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর দেশে গেলে তো দেখা হয়ই। আমি আমার সময় মতো দেখা করে যাব। থ্যাংক ইউ কষ্ট করে আসলেন। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে বললেন," ঐ বিএনপিরে জানাই দিয়েন যে, তারেক জিয়া যদি আমার সাথে বেশি বাড়াবাড়ি করে, তার মা আর জীবনেও জেল থেকে বের হবে না।"

পাঠক, আমার আজকের নিবন্ধটি একজন প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ! যে ফোনালাপটি ইতিহাসের কালো পাতায় রক্ষিত থাকবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে। আজ বলতে আমার দ্বিধা নেই, ঐ ফোনালাপটি প্রমাণ করে...১।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কে কন্ট্রোল করেন? ২। গত দশ বৎসরের খুন, গুম, হত্যা, জেল-জুলুম এ সব কার হুকুমে? ৩। হলমার্ক, ডেসটিনি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিসহ বিভিন্ন ব্যাংক লুট কার ইশারায়?

প্রমাণ হয়ে গেল...আজকের আদালতকে শেখ হাসিনা সরকার একটি প্রতিষ্টানে পরিণত করে বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায় ভাবে জেলে বন্দি করে এবং সাথে তাঁহার হাজার হাজার নেতাকর্মীদের বন্দি রেখে, শুধু তাই নয় লক্ষাধিক নেতাকর্মীর মাথায় গায়েবি মামলার নজরদারি রেখে...একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন করে আবার ক্ষমতা দখল! যে নেত্রী আজ ৩৭ বৎসর যাবৎ গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করে করে আপসহীন নেত্রী, দেশমাতা, গণতন্ত্রের প্রতীকে ভূষিত হয়েছেন, তিন তিন বার এদেশটির প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, দুই দুই বার বিরোধী দলের নেত্রী হয়েছেন। সেই নেত্রীকে আজ ৭৪ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণহীন উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে জেল কাটাচ্ছেন। আজ তা এখানে পরিষ্কার! প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ফোনালাপের মাধ্যমে দাম্ভিকতার সাথে পরিষ্কার করে দিলেন, তিনিই বেগম খালেদা জিয়াকে জেল কাটাচ্ছেন।

তিন

এখন প্রশ্ন...কোথায় আজ প্রিন্ট মিডিয়া কোথায় আজ ইলেকট্রনিকস মিডিয়া? কোথায় সুশীল সমাজবিদরা ও টক শো ওয়ালারা? সবই নিশ্চুপ! আজ যখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ফোনালাপটি বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়ে ভাসছে তখন কিন্তু বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিম গণমাধ্যম গুলো হরতাল করে বসে আছে! এর নামই কি মুক্ত গণমাধ্যম? অতীতে দেখেছি ফোনালাপ একটু আধটু ফাঁস হলেই কত যে উৎসাহ নিয়ে টক শো, বক শোর আয়োজন করে টেলিভিশন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীর ফোনালাপ ফাঁস নিয়ে টু শব্দটাই পর্যন্ত করছেন না, শুধু সম্মানের সাথে নিরবতা মাধ্যমে মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন করে যাচ্ছেন, আমি এসব মিডিয়াওলাদের ধিক্কার জানানোর ভাষা আমার নেই।

এখন কোটি জনতার প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনালাপটি যে তাঁহার নয়, তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন? যা জানি এখন পর্যন্ত অস্বীকার মূলক কোন কথা শুনা যায় নাই। তা-হলে কি একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেন নাই? এবং তাঁহার হুকুমেই যে বেগম খালেদা জিয়ার জেল হয়েছে, তা কি অস্বীকার করতে পারবেন? জানি পারবেন না। তা- হলে কি এই ফোনালাপটি আদালতে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়?

প্রকাশকাল : সোমবার, ৬ মে, ২০১৯

শীর্ষ খবর ডটকম

একজন তারেক রহমান ও একটি অগ্নি ঝরা বক্তব্য

১

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, লন্ডন রয়েল রিজেন্সি হলে বিএনপির ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের এই মহাক্রান্তি লগ্নে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের বক্তব্যটি ছিল, এক অগ্নি ঝরা বক্তব্য! অন্য সব দিনের মতন নয়! সম্পূর্ণ ই আলাদা। তাঁহার এই দিনের বক্তব্যে ছিল এক ভিন্ন কণ্ঠ, ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন এক তারেক রহমান, তাহার চোখ, মুখ, হাত পা সব কিছু যেন কথা বলছিল। হল ভর্তি নেতাকর্মী শ্লোগানে শ্লোগানে বার বার মুখরিত করে তুলেছিল।

যদিও পহেলা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে ঢাকা নয়া পল্টনে লাখো লাখো মানুষ জন সমুদ্রে যোগ দিয়ে এক বিশাল ম্যাসেজ দিয়েছিল কিন্তু সেদিন আশানুরূপ কোন প্রকার নির্দেশনা না পেয়ে অনেকটা হতাশা নিয়ে মানুষ বাড়ি ফিরে ছিল। কিন্তু ঐ দিন জনাব তারেক রহমানের সময়পোযোগী ও ভবিষ্যৎ নির্দেশনা মূলক বক্তব্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁহার জ্বালাময়ী ও অগ্নি ঝরা বক্তব্যে লক্ষ কোটি নেতাকর্মী প্রাণের সঞ্চার পেয়েছে ও উজ্জীবিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষ পেয়েছে প্রাণের সঞ্চার। আজ রাজনৈতিক অনেক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, "হয়তবা তারেক রহমান নিজেই জানেন না, তাঁহার অজান্তেই, দেশের সংকটময় মুহূর্তে তাঁহার এই সময়পোযোগী বক্তব্যটি একটি ইতিহাস হয়ে গেল।"

তারেক রহমান তাঁহার অগ্নি ঝরা বক্তব্যে দেশ ও জাতি সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন...

ক। তিনি বলেন, এই অবৈধ সরকারের সময়ে আমাদের ইলিয়াস আলী ও চৌধুরী আলমসহ দিনারের মতন শত শত নেতাদের গুম করা হয়েছে, শত শত নেতাদের লাশ পানিতে ভেসে উঠছে, বিএনপি নেতা সালাউদ্দীউন কে ভারতের সীমান্তে ফেলে আসা হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, "বিএনপি বহুবার ক্ষমতায় ছিল, বলুন... আওয়ামী লীগের এই মাপের কোন নেতাকে বিএনপির শাসন আমলে গুম করা হয়েছে? এই ভাবে খালে বিলে লাশ ভেসে উঠেছে? না করেনি, ভেসে উঠেনি। এই হচ্ছে বিএনপি আর আওয়ামী লীগের পার্থক্য।"

খ। "সীমান্তে ফেলানির হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখেছেন? এ ভাবে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে।" প্রশ্ন রেখে বলেন, "বিএনপির আমলে ফেলানির মতন কোন দৃশ্য কি জাতি দেখেছেন? সীমান্তে এত হত্যা দেখেছেন? না, এত সব ছিল না। এখানেই আমাদের পার্থক্য।

গ। সাংবাদিকদের উদ্যেশ্যে বললেন, "সাংবাদিক বন্ধুরা, সরকারের বিপক্ষে একটি নিউজ যাওয়ায় আপনাদের সহকর্মীর বাসায় ঢুকে স্বামী স্ত্রী...দুইজনকে মেরে ফেলল। প্রধানমন্ত্রী বললেন রুম পাহারা দিতে পারবেন না। কত নাটক করা হল। আপরারা সাগর রুনীর বিচার পেয়েছেন? তাদের ছেলে মেঘ এখন বড় হয়েছে, তার কাছে কি জবাব দিবেন? আপনারা না সাংবাদিক? বলুন... বিএনপি সরকারের আমলে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে? এ ভাবে সাংবাদিক নির্যাতন, হত্যা হয়েছে? আমাদের ব্যবধান এখানেই!"

ঘ। "বিএনপির চেয়ার পার্সন বেগম খালেদা জিয়া কে অন্যায় ভাবে মিথ্যা বানোয়াট মামলায় অসৎ উদ্দেশ্যে জেলে পুড়াচ্ছে, নির্যাতন করছে শুধু তাই নয় হাজার হাজার নেতাকর্মীদেরকে ও জেলে পুড়াচ্ছে, নির্যাতন করছে, গুম খুনের

মাধ্যমে খালে বিলে লাশ ভাসিয়ে দিচ্ছে।" আপনারা দেখেছেন, "এমনকি আমাদের কোমলমতি ছেলে মেয়েদের ও কোটা সংস্কারকারী ছাত্রছাত্রীদের কে ও রেহাই দেয় নাই। তাদের ন্যায্য দাবি না মেনে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করে, হাতুড়ি দিয়ে পিঠিয়ে, হেমলেট বাহিনী ব্যবহার করে, জেলে পুরে, বিভিন্ন ভাবে রিমান্ড দিয়ে সায়েস্তা করা হয়েছে।

এখন আপনারা ই বলুন, "বিএনপি এদেশের ক্ষমতায় অধিকবার ছিল, কখনও এমন হয়েছে? সমস্বরে হল ভর্তি মানুষ বলে উঠলেন...না, না, না, এমন কখনও হয় নাই। এই হলো, আওয়ামী লীগ বিএনপির পার্থক্য।"

ঙ। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শহীদুল আলমের কথা বলতে গিয়ে বললেন, "মিডিয়ায় সত্য কথা বলাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে, জেলে পুড়াচ্ছে। শুধু বেগম খালেদা জিয়া নয়...যে মানুষই অপশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, গুম, খুন না হয় জেলে পুড়াবে। তারা বিভিন্ন পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে, মানুষের জবান বন্ধ করে রেখেছে। প্রধান বিচারপতি দুই একটা সত্য কথা বলায়, দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়েছে। সাংবাদিকদের আবারও বলেন, "বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী যদি মানুষের জন্য লড়তে পারে, আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের হাত বাঁধা তাইতো? লিখতে পারছেন না। কিন্তু কয় দিন পর যে আপনাদের হাত থেকে ওরা কলম কেড়ে নিবে, তখন কি করবেন? তাই বলছি, এখনও সোচ্চার হোন। এটা আওয়ামী লীগ শাসন আমল! এটা বিএনপি নয়!

চ। "বাংলাদেশ ব্যাংক এর ৮০০ শত কোটি টাকা ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে গায়েব। ছয় লক্ষ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা। বেসিক ব্যাংকসহ প্রায় সবকটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক লুট করে নেওয়া। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের রাখা সোনা তামা হয়ে গেছে, কয়লা নাই হয়ে গেছে, পাথর গায়েব হয়ে গেছে, এদেশ টাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে! আর কয় দিন পর দেশের মাটি খুঁড়ে নিয়ে যাবে।" দেশ ও জাতিকে বলেন, "বিএনপি সরকারের আমলে এমন কিছু কি কোন পত্রিকায় দেখেছেন বা শুনেছেন?" সমস্বরে হল ভর্তি মানুষ বলে উঠলেন, না, না, না। তা হলে এই হলো..আওয়ামী সরকারের শাসন আমল আর বিএনপি সরকারের শাসন আমলের পার্থক্য। এই হলো, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য।"

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাঁহার অগ্নি ঝরা বক্তব্যে এভাবেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য তুলে ধরে বলেন... না, না, না,! অ-নে-ক হয়েছে। আজ এখানেই রুখে দিতে হবে। জনগণের দেশ, জনগনের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। এ জন্য দরকার ঐক্য। যে ঐক্য হলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের ঐক্য। সে ঐক্য হবে বৃহৎ জাতীয় ঐক্য।

আর নেতাকর্মীদের উদ্যেশ্যে বললেন, "বাংলাদেশের প্রতিটি কোনায় কোনায়, প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে, প্রতি ওয়ার্ডে, প্রতিটি থানায়, জেলায়, পৌরসভায়, প্রতিটি বিভাগে আমাদের লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী আছে। আপনারা স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রস্তুতি নিন। ডাক দেবার সময় এসে গেছে, ডাক আসা মাত্র দেশের সর্বস্তরের মানুষদেরকে সাথে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ...সময় মত ডাক আসবে। আপনাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।"

২

তারেক রহমান নেতাকর্মী দের হুশিয়ার করে বলেন, "সরকার ভীতি, প্ররোচনা কিংবা কোন প্রকারের ফাঁদে পা না দিতে সবাইকে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মনে রাখবেন, দেশের মানুষের ঐক্য নষ্ট করার জন্য অবৈধ সরকার, ডাকাত সরকার, সব ধরনের চেষ্টা করবে। তারা গুম খুন নিখোঁজ করার মাধ্যমে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে, মানুষকে ধুম্রজালে ফেলার জন্য। কাজেই সব কিছুতেই সজাগ থাকতে হবে।

আরো বলেন, "আমাদের লক্ষ কিন্তু একটি, আন্দোলনের মাধ্যমে একটি জনগণের সরকার। যে সরকার বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা সঠিক ভাবে নির্বাচিত হবে। যে সরকার হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।"

আর বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শিশু কিশোরদের নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, মনে প্রাণে নিরাপদ সড়ক চাই, আমি ব্যক্তিগত ভাবে চাই, আমার দল ও চায়। কোটা সংস্কার ও একটি ন্যায্য দাবি। সেটাও আমি মনে প্রাণে চাই, আমার দল ও চায়। নিরাপদ সড়ক আমাদের থাকবে। আজ নিরাপদ সড়কের সাথে তাল মিলিয়ে বলতে চাই নিরাপদ একটি বাংলাদেশ ও চাই।

পাঠক, দেশের এই মহা সংকট মুহূর্তে, বাস্তবকে উপলব্ধি করে, বাস্তবমুখী চিন্তা চেতনার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী ভিশনারি সংগঠক তারেক রহমানের সময়পোযোগী এ অগ্নি ঝরা নির্দেশনা মূলক বক্তব্যটি আগামী দিনে দেশ এ জাতিকে সঠিক স্থানে নিয়ে যাবে বলে দেশের বড় অংশের ধারনা। লিখনীর পরিশেষে বলতে চাই, "ভিশনারি সংগঠক জনাব তারেক রহমান হয়ত বা তিনি নিজেই জানেন না, তাঁহার এ বক্তব্য তাঁহার অজান্তেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ইতিহাস হয়ে গেল।"

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

মজলুম মাহমুদুর রহমান রক্তাক্ত হননি, রক্তাক্ত হয়েছে দেশ ও জাতির বিবেক

১

একজন কলম সৈনিক, মজলুম সম্পাদক, সত্যের প্রতীক জনাব মাহমুদুর রহমানকে আর কত ভাবে নির্যাতিত হতে হবে? এ নির্যাতনের শেষই বা কোথায়? আজ সকল বর্বরতা, নগ্নতা, নির্লজ্জতা ও নৃশংসতার সীমানা অতিক্রম হয়ে গেছে। বাংলাদেশ তুমি কোথায়? সময় অতি অল্প... হে দেশ জাতি ও প্রজন্ম তোমরা জাগো!

পাঠক, ২২ জুলাই রবিবার, মজলুম সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান কুষ্টিয়ার আদালতে ৫০০ধারার মান-হানির মামলার হাজিরা দিতে গিয়ে জামিন পেলেন ঠিক কিন্তু যুবলীগ ছাত্রলীগ কর্মীরা শ্লোগান সহকারে জনাব মাহমুদুর রহমানকে আদালত চত্বরে দুই ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। অবস্থা বুঝে জনাব মাহমুদুর রহমান সিনিওর ম্যাজিস্টেইট এম এম মোর্শেদের অনুমতি নিয়ে তাঁর আদালতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং হামলার পূর্বে আদালতের কক্ষ থেকে ফেইসবুক লাইভে নিজের নিরাপত্তার দাবি জানান ও সেখানকার ওসির কাছে ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতা চান। কিন্তু কোন কাজ হয়নি, কেহই আগাইয়া আসেনি, এমন কি আদালত ও তাঁহার নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এ সময় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় মারাত্মক ভাবে আহত হন। যদিও ওই সময় পাশে ছিলেন কুষ্টিয়া বারের সিনিয়র আইনজীবি আমিরুল ইসলাম,

বিএফইউজে মহাসচিব এম আব্দুল্লাহ ও কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী আহমেদ রুমী ও আরো অনেকে...। আদালত পাড়ার প্রত্যক্ষ দর্শীরা বলেন, "জনাব মাহমুদুর রহমান বিকেল সাড়ে চারটায় আদালত থকে বের হলেই আদালত চত্বরেই পুলিশের সহযোগিতায় মার মার বলে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। প্রত্যক্ষ দর্শীরা আরো বলেন, বিশেষ করে গাড়িতে করে চলে যাওয়ার সময় গাড়ির উপর ইট, পাথর ও লাটি সোটা মার মার বলে নিক্ষেপ করতে থাকে। এতেই জনাব মাহমুদুর রহমান মারাত্মক আহত হন। মাথা ফেটে রক্ত ঝড়তে থাকলে সাংঘাতিক ভাবে রক্তাক্ত হন। লেখাটি যখন লিখছিলাম, তখন তিনি কুষ্টিয়া থেকে অ্যাম্বুলেন্স যোগে যশোর পৌঁছান এবং সেখান থেকে বিমান যোগে ঢাকায় ফিরে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা ইউনাইটেড হসপিটালে ভর্তি হন।

পাঠক, এই লেখাটি লিখতে গিয়ে, লিখার ভাষা আজ হারিয়ে ফেলেছি! কি বলব? কি লিখব? আমার কাছে যেন কোন ভাষা নেই! সরকারের সন্ত্রাস বাহিনীরা একটি দেশের আদালত চত্বরে পুলিশ প্রহরায় মহড়া দিয়ে ৬৫ বৎসর বয়স্ক একজন মজলুম কলম সৈনিককে আদালতের সামনেই লাটি সেটা ইট পাথর দিয়ে রক্তাক্ত করলো। হায়রে বর্বরতা, হায়রে নগ্নতা! এমন বর্বরতা, নগ্নতা ও নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা জানানোর ভাষা আমার নেই। এই বর্বরতা ও নগ্নতাই প্রমাণ করে একজন মজলুম সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের প্রতি তাবেদার ফ্যাসিস্ট সরকারের কি পরিমাণ ভয় ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। সত্যিই একজন মজলুম মাহমুদুর রহমান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড।

২

আজ এ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হতে চলেছে পাশ্ববর্তী একটি দেশের হুকুম ব্যথিত এ সরকারের করার কিছু নেই। কারণ..., তারা অবৈধ ভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য দাসত্বে পরিণত হয়েছে। মাহমুদুর রহমান কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে পাশ্ববর্তী দেশের কোন আধিপত্য কে মানতে রাজি নয়। এটাই তাঁহার মূল অপরাধ। যে কারণে প্রায় দেড় শতের উপরে তাঁহার উপর মামলা রয়েছে। এ ছাড়া পাঠকদের সুবিধাত্বে আরো ২/১ টি অপরাধ তুলে ধরার চেষ্টা করছি...পাঠক অবশ্য অবগত তার পরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, অকুতোভয় মজলুম সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ২০১১ সালের পয়লা অক্টোবর সিলেট টু জাফলং লংমার্চে লাখো লাখো মানুষের নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলন, জান দিবো তবু ভারতকে জমি দিবো না। সম্বত ২০১৬ সালে একজন কলম সৈনিক হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের দুর্নীতির খতিয়ান এবং শাহবাগীদের মুখোশ উম্মোচন করেছিলেন। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর গণজাগরন মঞ্চের অন্যতম নেতা বাপ্পাদিপ্ত বসু শেখ হাসিনার লগি বৈটা আন্দোলনে যে চার জনকে হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য করেছিল, সেই সময় সেই লাশের উপর নৃত্যের ছবি আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই ছবিটিই বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সব নিখুঁত দেশ প্রেম অসাধারণ সাহসই হলো একজন মাহমুদুর রহমানের অপরাধ ও রোষানলে পড়া এবং রক্তাত্ব হওয়ার কারণ।

এখানে মজলুম সম্পাদক মাহমুদুর রহমান রক্তাক্ত হননি, রক্তাক্ত হয়েছে বাংলাদেশ! রক্তাক্ত হয়েছে দেশ ও জাতির বিবেক! কোথায় আজ জাতির বিবেকরা? কোথায় উজ্জ্বল তরুণ যুব সমাজ? কোথায় সুশীল সমাজ? আজ দেশ, জাতির বিবেক ও প্রজন্ম তরুণ যুব সম্প্রদায়কে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যে দেশটির জন্য লক্ষ লক্ষ শহিদেরা একসাগর রক্ত দিয়ে পাক হানাদারদের কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করেছে একটি সোনার বাংলা তৈরির প্রত্যয় নিয়ে। আজ সেই দেশটির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব মানবিকতা ও ন্যায় বিচার নির্বাসিত। ফ্যাসিবাদরা ক্ষমতার লালসে ন্যায় অন্যায় সব কিছু ভুলে গিয়ে জেল জুলুম, খুন গুম, দেশলুট, ব্যাংকলুট, ডাকাতি, রাহাজানি ও ধর্ষণ সব কিছুতেই জড়িয়ে পড়েছে। দেশ এখন ধ্বংসের দ্বারস্থ। গভীর ষড়যন্ত্রে নিপেতিত! বাংলাদেশ তুমি কোথায়? দেশ ও জাতির বিবেক তোমরা জাগো।

প্রকাশকাল : সোমবার, ২৩ জুলাই, ২০১৮

শীর্ষ খবর ডটকম

একজন মইনুল হোসেনকে আর কত? আওয়ামী ফ্যাসিজমের শেষই বা কোথায়?

১

আজ দেশের এই মহাক্রান্তি লগ্নে দেশকে বাঁচানোর জন্য, মানুষকে বাঁচানোর জন্য, যে সব সিনিয়র সিটিজেন বা বিশিষ্ট জনরা আরেকটি গৌরবময় ইতিহাসে ভূমিকা দিচ্ছেন ও ভূমিকা নিচ্ছেন, সরকার তাহাদেরকে বিভিন্নভাবে হেনেস্থা করে, অপমান করে, পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা দিয়ে নির্যাতন করছে। তাতে দেশ ও জাতি লজ্জিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে।

মজলুম সাংবাদিক মাহমুদুর রহমান কে কুষ্টিয়ার আদালতে আওয়ামী যুবলীগ, ছাত্রলীগ কর্তৃক পুলিশ প্রহরায় রক্তাক্ত ও লাঞ্চিত হওয়ার তিন মাস পর আবার একই কায়দায় আওয়ামী যুবলীগ, ছাত্রলীগ কর্তৃক গত ৪ নভেম্বর রংপুর চিপ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেইট আদালতের সামনে লাঞ্চিত হলেন, নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। পাঠক অবশ্য অবগত, একাত্তর টিভির একটি টকশতে মাসুদা বাট্টির কথাকে কেন্দ্র করে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনকে আজকের এই হামলায়, মামলায় লাঞ্চিত করা। এখানে শুধু হামলা মামলা লাঞ্চিত বললে ভুল হবে। আদালতের সামনে বন্দি মইনুল হোসেনকে পুলিশ প্রহরায় শারীরিকভাবে নির্যাতন, রীতিমত কিল ঘুসি মারা এবং জুতা ও ডিম নিক্ষেপ করা হয়। মজার ব্যাপার হল, পুলিশ প্রহরায় আদালতের সামনে যুবলীগ ছাত্রলীগ কর্তৃক লাঞ্চিত হলেন মইনুল

হোসেন আর পুলিশ ও লীগ বাহিনী উল্টো মামলা দিল প্রায় দুইশত বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে। ওই দিন রাতেই প্রায় দশজন বিএনপি নেতাকর্মী কে গ্রেপ্তারও করা হল। কি আজব কারবার! কি আজব দেশ!

মানুষজন এ সব দেখে অবশ্য আর স্তম্ভিত, আতঙ্কিত বা আশ্চর্যম্ভিত হয় নাই কারণ দেশের সিনিয়র সিটিজেন ও সম্মানিত নাগরিকদের উপর এ ধরনের লাঞ্চনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন এ সবই এ সরকারের খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। মানুষ শুধু ঘৃণা ভরে ধিক্কার জানাচ্ছে আর বলছে, "একজন মইনুল হোসেনকে আর কত? আওয়ামী ফ্যাসিজমের শেষই বা কোথায়? ২। রাষ্ট্রের শীর্ষ স্থান থেকে বলা হলো, "মামলা করেন, আমরা দেখব"। মামলার হিড়িক পড়ল। ১৮টির মতন মতন মামলা হলো। একই মামলা সর্বত্র! যদিও আইনে আছে এক মামলা অন্য আদালতে হওয়ার নিয়ম নাই। সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন," ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনকে যে মামলায় পাঠানো হয়েছে, সেটা জামিন যোগ্য তারপরও তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এখানেও শেষ নয় তাঁকে সাধারণ কয়েদীর সাথেও থাকতে হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সিনিয়র আইনজীবীরা আরো বলছেন," মানহানীর মামলায় আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র তার নাগরিককে গ্রেপ্তার করতে পারে না। এ ধরনের মামলায় আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে, বড় জোর তাহার উপর জরিমানাই করা হয়। জেল এর প্রশ্নই আসে না। তারপরও সবই হচ্ছে। এখন প্রশ্ন একজন মইনুল হোসেনের উপর এমন কেন? এছাড়া শীর্ষ স্থান থেকে তাঁকে ব্যাক্তিগত ভাবে এর্টাকও করা হয়েছে! কেন তাঁকে এত নিপীড়ন, নির্যাতন ও হেনেস্থা আর কে ইবা এই মইনুল হোসেন একটু দেখে আসা জরুরি মনে করছি...পাঠক, মইনুল হোসেনের বাবা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন সেই সময়ের নামকরা কলম যোদ্ধা এবং জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন যাদুকর। তিনি ছিলেন হোসেন সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সহযোগী কিন্তু আওয়ামী লীগে যোগ দেন নাই ও কোন রাজনৈতিক দলের পদপদবি ও গ্রহণ করেন নাই। উল্লেখ্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। তিনি তাতেও রাজি হননি। সেই পিতার পুত্র ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন।

এখানেই শেষ নয়...সাংবাদিক হিসাবে মানিক মিয়ার আরেকটি নাম ছিল, "মোসাফির"। "রাজনৈতিক মঞ্চ" নামে তাঁহার একটি কলাম তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সেই কলামের লেখকের নাম হল, "মোসাফির"। সেই ক্ষুরধার কলম সৈনিকই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন " দৈনিক ইত্তেফাক "এবং ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সাধারণ নির্বাচনে ঐ "দৈনিক ইত্তেফাক"

ই সব চেয়ে ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বিভাগের ভিত গড়ার পিছনেও রয়েছে মানিক মিয়ার বিশাল অবদান। নেপোলিয়ান বোনা পার্টের মতে...এক লাখ সৈনিকের চেয়ে আমি তিনটি সংবাদ পত্রকে ভয় করি, আর সংবাদ পত্রের সম্পাদক যদি হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মতন ক্ষুরধার কলম সৈনিক। সেই ক্ষুরধার কলম সৈনিকের রক্তে প্রবাহিত এ সময়ের সাহসী সন্তান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। যিনি ষাট দশকে লন্ডন থেকে বার এট "ল" করে আইনি পেশায় নিয়োজিত, আর যখন ৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করেন, তখন এমএজি কর্নেল ওসমানি প্রথম ওই সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তার সাথে সাথে আজকের এই মইনুল হোসেনই আওয়ামী লীগের সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এবং বাকশালবিরোধী জোটে অংশগ্রহণ করে গণতন্ত্রের পক্ষে জনতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই আজ এই মইনুল হোসেন কে জামিন যোগ্য মামলায় জামিন না দিয়ে বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, লাঞ্চিত করা হচ্ছে।

আজ সর্ব মহলে একই প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সিনিয়র সিটিজেন ও প্রথিযশা ব্যক্তি বর্গের উপর আওয়ামী ফ্যাসিজম আর কত? পরিশেষে বলতে চাই, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনের মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের ভূমিকা দৃশ্যমান হওয়া জরুরি।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ৮ নভেম্বর, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

একটি "গণবিস্ফোরণ" এখন সময়ের ব্যাপার

১

যখন একটি রাষ্ট্রে নেই কোন গণতন্ত্র, নেই মানবাধিকার, নেই স্বাধীনতা! চলছে...সংবিধান লুট, আদালত লুট, মানুষ লুট, মালিকানা লুট, ভোট লুট, ব্যাংক লুট, সোনা লুট, কয়লা লুট, আর নির্বিচারে হত্যা, অনাচার, অত্যাচার ও ধর্ষণ! যেখানে নির্বাচন শব্দটা হয়ে গেছে আয়লা সিডরের চাইতে ভয়ঙ্কর। চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তিন তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রি সহ হাজার হাজার নেতাকর্মী বন্দি যাপন করছেন, দেশময় গায়েবি মামলায় নির্যাতিত হয়ে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করছে, হাজারো নেতাকর্মীর মা-বাবার কান্নায় আজ আদালত পাড়ার বাতাস ভারী হয়ে আছে। এ-ছাড়া ঘর ছাড়া, বাড়ি ছাড়া লাখো নেতাকর্মী তাদের বাড়ি ফেরার জন্যে আফসোস করছে। আদালত তার হারানো স্বাধীনতার জন্যে ক্রন্দন করছে। অবৈধ সরকারের ষ্টিম রুলারে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে যখন চতুদিকে আওয়াজ তুলছে...সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, একটি সঠিক নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠিক তখন (৩ অক্টোবর ২০১৮) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের যোগদান শেষ করে গণভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, "প্রায় দশ বছরের মতন ক্ষমতায় আছি। এমন কোন অন্যায় কাজ করিনি, যে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। বন্দি শালায় থাকাকালীন সময়ে দেশের

উন্নয়ন অগ্রযাত্রা নিয়ে পরিকল্পনা করেছি। এটি এখন বাস্তবায়ন করছি। উন্নয়ন হচ্ছে, মানুষ এখন শান্তিতে আছে।"

পাঠক, এ কথাগুলো বলার পর তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তৈলা সাংবাদিক বৃন্দ করতালি দিয়ে গণভবন প্রাঙ্গনকে মুখরিত করে তুললেন। আর অপর দিকে টিভির সামনে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের হাসি আটকিয়ে রাখতে পারছিলেন না। ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

২

এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় কারণ ইতিহাসই বলে গেছে, পৃথিবীতে যত ফ্যাসিস্ট এসেছে, তাদের সবারই রূপ, গন্ধ ও লক্ষ্য ছিল একই। সেই উন্নয়ন! উন্নয়ন! উন্নয়ন! উন্নয়নের দশ বছরের গান ঠিক এ ভাবেই আইয়ুবরা ও গেয়ে গেছেন। তাদের পরিণামও সবার জানা। আগেও কোন এক লেখাতে বলেছি, আজ ও বলতে হচ্ছে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁন কালবার্ট ব্রিজ ও বিভিন্ন কল-কারখানা নির্মাণ করে উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসিয়ে ছিলেন এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে ডেকেড অব ডেভেলপমেন্ট অথাৎ উন্নয়নের দশ বছর পালন করে ছিলেন। ভাবছিলেন তাঁহার সিংহাসন আর কেহ নড়াতে পারবে না। মানুষ বোকা-সুকা, কিছু বুঝে -সুজে না, নেতা যা বলে তা-ই ঠিক। কিন্তু না, মানুষ কিন্তু সবই বুঝে ছিল। খাইবার পাস থেকে বান্দরবন পর্যন্ত মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। উন্নয়নের দশ বছরের ফুর্তি পালনের কয়েক মাস পরই আইয়ুবশাহীর পতন হয়েছিল। আজ কিন্তু তার কোন ব্যতিক্রম নয়। সেই আইয়ুব খাঁনের ডায়লগই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে! কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে৮ও বেশি। সেই উন্নয়ন! সেই দশ বছরের গান আপনিও গেয়ে যাচ্ছেন। আইয়ুব যে ঢাকঢোল পিটিয়েছিল, সেই ঢাকঢোল আপনিও পিটাচ্ছেন!

আইয়ুব, এহিয়া ও এরশাদ কে যারা হটিয়েছিল, তাদের বংশধররাই আজকের প্রজন্ম তরুণ যুব সমাজ। ওরা সবই বুঝে, খুব ভালো করেই বুঝে। কারণ ওরা একবিংশ শতাব্দীর যুব সমাজ। আমি নিশ্চিত, তার কিছুটা পরিচয় ইতোমধ্যে পেয়েছেন...নিরাপদ সড়ক চাই কোমলমতি সন্তানদের এবং কোটা সংস্কারকারী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে।

৩

বিএনপির চেয়ার পারর্সন বেগম খালেদা জিয়া ৩ রা ফেব্রুয়ারি লা- মেরিডিয়ান হোটেল থেকে কারাগারে যাওয়ার আগে তাঁহার শেষ বক্তব্যে বলেছিলেন, "আমি যেখানে ই থাকি না কেন, আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। দেশের মানুষের সঙ্গে আছি। আমাকে কোন ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমাতে পারেনি, পারবেও না। আমি

দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আছি। দেশের মানুষের সঙ্গে আছি। সাহস সঞ্চয় করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। আসুন সবাই মিলে, সব শ্রেণী মিলে, জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে দেশটাকে রক্ষা করি। গণতন্ত্র ফিরে আনি।

এ লেখাটি লিখা পর্যন্ত... আজ তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম মিলে একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রায় হয়ে গেছে।

পাঠক, খাইবার পাশ থেকে বান্দরবন পর্যন্ত যে ভাবে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। আজ কিন্তু বান্দরবন থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ানোর সময় অতি সন্নিকটে। দৃশ্যপট বলছে, একটি গণ-বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলছি, এই মহুর্তে অবৈধ সরকারকে উচিত... বেগম খালেদা জিয়া সহ সব রাজনৈক বন্দি এবং কোটা আন্দোলন কারী বন্দিদের মুক্তি দিয়ে, সংসদ ভেঙে, প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচন কালীন একটি নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে সকল দলের অংশ গ্রহনে একটি সুষ্ট নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্তা করে জনগনের পাশে দাঁড়ানো।

নইলে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, স্বৈরাচার আইয়ুব এহিয়া ও এরশাদের চাইতে ভয়াবহ পরিণতি হবে। কারণ ইতিহাস বলে, কোন রাষ্ট্র যখন ফ্যাসিষ্টের কবলে পতিত হয়, আর মানুষের ধৈর্য্যের বান যখন ভেঙ্গে যায় তখন বিভিন্ন ডিজিটাল আইন সহ যত ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসুক না কেন, তখন আর কোন প্রকার বাধা বিপত্তি মানুষকে আটকিয়ে রাখতে পারে না। তখন পতন হবেই হবে।

উল্লেখ্য ২৮ সেপ্টেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ভেরীপাইড আইডি থেকে যদিও আমি কবি নই, তারপরও কবিতার আকারে কিছু লাইনদ্বয় লিখে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। সেই লাইনগুলি প্রকাশ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই আমার ফেইসবুক আইডিটি নাই হয়ে যায়। যাক। আজ ইচ্ছে করছে আমার লেখা সেই লাইনদ্বয় গুলি লিখে আজকের লেখাটি শেষ করি...।

বাংলাদেশ এখন রুখে দাঁড়িয়েছে হে বিশ্বখ্যাত স্বৈরাচার, তোমার পতন এখন অবশ্যম্ভাবী পথ খোঁজ পালাবার, চতুদিকে চেয়ে দেখ জনতার ক্রোধ ধার 'গণ-বিস্ফোরণ' এখন সময়ের ব্যাপার।

প্রকাশকাল : বুধবার, ১০ অক্টোবর, ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও কালো অধ্যায়

এক

গণতন্ত্রের প্রতীক, ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের আপসহীন নেত্রী, সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ার পার্সন বেগম খালেদা জিয়া সহ প্রায় ৭০ হাজারের অধিক নেতাকর্মীদের পরিকল্পিত জেলে রেখে এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকেও পরিকল্পিত সাজা দিয়েও লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীর মাথায় গায়েবি মামলার হুলিয়া জারি রেখে, বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টের ৭ টি দফার একটি দফা না মেনে, নির্বাচনী মাঠকে পাহাড় সম ব্যবধান রেখেই, শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ পৃথিবীর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে, পার্লামেন্ট বহাল রেখে, পুরো একটি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, সিভিল প্রশাসন, একদল নির্বাচন কমিশনার সহ লক্ষাধিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে, সর্ব ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে, সরকারি সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশে একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে গেলেন।

শুধু তাই নয়, যেখানে গত ১০ বৎসরে বিএনপির নেতাকর্মীদের জেল জুলুম, খুন, গুম, ক্রসফায়ার ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের মাধ্যমে নিহত হয়েছেন ১, ৫১২ জন। জেলবন্দি আছেন ৭০ হাজারেরও অধিক। ৯০ হাজার মামলায় আসামি আছেন প্রায় ২৬ লক্ষ। তফসিল ঘোষণার পর থেকেই বিরতিহীন ভাবে চলছিল আওয়ামী লীগ ও ইসির সহযোগিতায় বিভিন্ন আইন

শৃঙ্খলা বাহিনীর সন্ত্রাস, হামলা, গ্রেপ্তার ও জুলুম। শুধু তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন দিন পর্যন্ত প্রায় ২১ হাজার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার।

এছাড়া অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ১৭ জন প্রার্থীকে কারাগারে রেখে, ৫০ জনের মতন প্রার্থীকে বিভিন্নভাবে হামলার মাধ্যমে জখম, আরও ৪৬ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ভয়ভীতির মাধ্যমে এক মুহূর্তের জন্য মাঠে নামতে না দিয়ে এবং ৫৭ জন প্রার্থীকে মামলা দিয়ে দৌড়ে রেখে এবং ধানের শীষের কোন পোস্টার লাগানো মাত্র ছিঁড়ে ফেলা ও অনেক স্থানে পোষ্টারিং করতে না দেওয়া। এত সব করেও ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট আগের রাতেই সিল মেরে বাক্সে ভরে রেখে নির্বাচন সম্পূর্ণ করা।

হায়রে তামাশার নির্বাচন! হায়রে ভোট ডাকাতির নির্বাচন! দেশের অনেক সত্তরর্ধ ও আশির্ধ সিনিয়র সিটিজেনরা বলছেন, ৫৪ সালের নির্বাচন থেকে ভোট দিয়ে আসছি কিন্তু এ ধরনের ভোট ডাকাতির নির্বাচন কোন দিন দেখিও নাই, দেই ও নাই, জীবনে কোন দিন শুনিও নাই। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্বসহ জাতির কাছে ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ একদম উলঙ্গ হয়ে গেছে। পাঠক লেখাটি যখন লিখছি তখন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "উলঙ্গ রাজা" কবিতাটির প্রতিটি লাইন মনে হচ্ছিল আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল, "হে রাজা, তোর কাপড় কোথায়?"

দুই

এছাড়া নির্বাচনের দিন এবং আগের দিন রাতে কি পরিমান অনিয়ম এবং নির্বাচনের নামে নামে প্রহসন করে কি ভাবে ভোট ডাকাতি হয়েছে, কিছুটা চিত্র নীচে তুলে ধরা চেষ্টা করছি।

১। ইকোনমিস্ট পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ, ঢাকা ১৫ আসনে মনিপুর হাইস্কুল কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন দেখা গেছে, হাজার হাজার ক্ষুব্ধ নারী পুরুষ ঘন্টার পর ঘন্টা স্কুলের বাহিরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদেরকে ভোট না দিয়েই বাড়িতে ফেরত যেতে হয়েছে। কারণ পুলিশ ও লীগের কর্মীরা খুবই সামান্য ভোটারকে একটি দরজা দিয়া ভিতরে যেতে দিচ্ছিলেন। অথচ ৩৬টি ব্যালট বাক্স ছিল। দুপুরের মধ্যেই দেখা গেল একটি কক্ষে মাত্র ৪১ জন ভোটার ভোট দিতে পেরেছিলেন। অথচ এখানে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত ছিলেন এক হাজার ভোটার!

২। ঢাকা ৮ ও ৯ আসনের প্রায় সবগুলি কেন্দ্র থেকে ঐক্যফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের মারধর করে বের দিয়েছে পুলিশের সহায়তায় লীগ কর্মীরা, যা সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে আছে। ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে হাজার হাজার ক্ষুব্ধ ভোটাররা চিৎকার করে বলছেন, "এই দেখেন আমাদের আইডি কার্ড। আমরা ভোট দিতে পারি নাই কেন? আমরা কি এই দেশের নাগরিক নয়?"

৩। নরসিংদী ৪ আসনে কাস্তে মার্কা নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সিপিবির কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন, "আমার এলাকার একটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনের আগের দিন আমার কাছে স্বীকার করেন যে, তার কাছে প্রশাসনের নির্দেশ ৩৫ শতাংশ ভোটের মিল যেন নির্বাচনের আগের রাতেই দেওয়া হয়। পরিশেষে আওয়ামী লীগের চাপে তা ৪৫ শতাংশ হয়ে যায়।"

৪। আর গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ঢাকা ১২ আসনের প্রার্থী। ১২ জানুয়ারি তিনি গণ শুনানিতে বলেন, "নির্বাচনের আগের দিন রাতেই কেন্দ্র ভেদে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ভরে ফেলা হয়েছে। আমরা যারা প্রার্থী ভোট দিতে গিয়েছিলাম, দেখেছি, একটা ভোট কেন্দ্রে ভোটারের তেমন কোন ভিড় নেই অথচ ৯টা বা সাড়ে ৯টার মধ্যেই ব্যালট বাস্কগুলি ভরে গেছে। তাঁহার প্রশ্ন এই বাক্সগুলি কেমন করে পূর্ণ হল?

৫। এছাড়া ঢাকা ৮ আসনের প্রার্থী শম্পা বসু মই মার্কা নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। তিনি অভিযোগ করেন, সকালে সেগুন বাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে গিয়ে দেখি, কেন্দ্রে কোন ভোটার নাই। অথচ ব্যালট বাক্স ভোটে ভর্তি রয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, এ পর্যন্ত মাত্র ১০০ টি ভোট পড়েছে। তা হলে বাক্স ভর্তি এত ভোট কোথায় থেকে এলো?

পাঠক, এ ভাবে আর কত লিখব? লিখতে হলে লিখা শেষ হবে না কারণ প্রায় ৪০ হাজার কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের অবস্থা প্রায়ই এ রকম। অনেক কেন্দ্রে কিন্তু ভোটের তালিকার সংখ্যার চাইতে কাষ্টিং অনেক বেশি ও হয়েছে। এসব জবাব কি নির্বাচন কমিশন দিবে?

৬। এদিকে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ৩০ ডিসেম্বরের ভোটে ব্যাপক অনিয়মের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ত্রুটি পূর্ণ বলে মন্তব্য করল ১৫ জানুয়ারি। প্রতিষ্ঠানটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের পক্ষে মত দিয়েছে। ৩০০ আসন থেকে লটারির মাধ্যমে ৫০ টি আসনকে বেচে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করা হয়। জরিপে দেখা যায়, ৫০ টির মধ্যে ৪৭ টি আসনেই অনিয়ম হয়েছে। এবং ঐ ৫০ টি আসনের মধ্যে ৪১ টিতে জাল ভোট পড়েছে এবং নির্বাচনের আগের রাতে সিল মারা হয়েছে ৩৩ টি আসনে।

৭। ৩ জানুয়ারি জার্মানির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান নরবার্ট রজেন এ নির্বাচনকে নিয়ে এক টুইট বার্তায় লিখেছেন, "বাংলাদেশের নির্বাচনী কারচুপির মাত্রা দেখে আমি বিস্মিত! এতে দেশটিতে কার্যকর ভাবে এক দলীয় সরকারের শাসন চালু হয়েছে।"

৮। ৩ জানুয়ারি বিশ্বখ্যাত দ্যা ইকোনমিস্ট পত্রিকার প্রতিবেদন ছিল, "একছত্র ক্ষমতাই আওয়ামী লীগের জন্য কাল হতে পারে"।

এ প্রতিবেদনটিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরেছিল। তারই অংশ বিশেষ আমি তুলে ধরছি, প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "২৯৯ আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয়ের অর্থ কি দাঁড়ায়? আওয়ামী লীগ সব চেয়ে জনপ্রিয় দলে পরিণত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি জানার আর কোন উপায় নেই। নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, এ নির্বাচনের মাঠ এতটাই অসমতল ছিল, ভোটাভুটি এতটাই ত্রুটিপূর্ণ ও ভোট গণনা এতই অস্বচ্ছ ছিল যে, খোদ আওয়ামী লীগের অনেক সমর্থকও এই ফলাফল নিয়ে সন্দিহান। এভাবেই ইকোনমিস্ট মন্তব্য করল।

৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং থিংক ট্যাংক উইলিয়াম বি মাইলাম এ নির্বাচনের উপর সদ্য যে বক্তব্য বা পর্যালোচনা দিয়াছেন তা লিখেই আমার লেখাটি শেষ করব।

মিঃ মাইলাম বললেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশে। যেখানে ভোট চুরির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়ে শেখ হাসিনা ৯৭, ৬৬% আসন নিজের পক্ষে রাখতে সফল হয়েছেন।

তাছাড়া বাংলাদেশের ভাগ্যে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা ইঙ্গিত করে বললেন, "৯০ দশকে যে সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের পক্ষে সুনাম কুড়িয়েছিল, তারা এবার স্বৈরাচার ঠিকানোর দায়িত্ব নিয়ে, যে ন্যাক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে, তাতে এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক...যে সেনাবাহিনী নিজ দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠান সঠিক ভাবে করতে সক্ষম নয়, সেখানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষীবাহিনীতে

যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন। পাঠক, আমার এই ক্ষুদ্র বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান...আজ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বের সব শ্রেণির মানুষ এবং সংস্থা এ নির্বাচনকে একটি ভোট ডাকাতির নির্বাচন ও প্রহসনের নির্বাচন হিসাবে আখ্যায়িত করছে। নির্বাচনের নামে এ সরকার বার বার প্রহসন করছে, জাতিকে বৃদ্ধা অঙুলি প্রদর্শন করছে! একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সব কটি প্রতিষ্ঠানকে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করে, সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিল এবং জনগণের নির্বাচন সম্পর্কীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থানে ভয়ের পাহাড় তৈরি করল। তবে ইতিহাস বলে, ভোট ডাকাত ও ফ্যাসিস্টদের শেষ পরিণতি খুবই করুণ হয়। বিশ্বের ইতিহাসে মানুষ বার বার দেখেছে। বাংলাদেশও বিশ্বের মানচিত্রের ভিতরেই একটি দেশ।

অতএব এই ধরণের ভোট ডাকাত ও ফ্যাসিস্ট সরকারের জন্য একটি করুন পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

প্রকাশকাল : বুধবার, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯
শীর্ষ খবর ডটকম

শুধু নিরাপদ সড়ক নয় নিরাপদ রাষ্ট্রও চাই

১

কোমলমতি বাচ্চাদের নয় দিনের আন্দোলন শুধু দেখেছি, কিছুই লিখিনি তবে প্রতিদিন মনে মনে লিখেছি। আজ ঠিকই খাতায় লিখছি কিন্তু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে...।

রক্তে রঞ্জিত ক্ষত-বিক্ষত কোমলমতি বাচ্চাদের মুখ আজ যায় না চেনা! তাদের উপর দিয়ে চলেছে পাষণ্ডদের গুলি, বারুদ, টিয়ার সেল, জেল, জুলুম, নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানি। আইয়ুবী হায়েনাদেরকে ও হার মানিয়ে দিয়েছে। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে গণ ধিকৃত বর্বর হায়েনারা। তারা আজ বাকরুদ্ধ!

"কিশোর আন্দোলন ২০১৮" নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে একটি যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে টিন-এইজ ছাত্রদের নেতৃত্বে পুরো বাংলাদেশ কে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ৪৭ বৎসরের আবর্জনা তারা দেখিয়ে দিয়েছে! দাম্ভিকতা-পূর্ণ দাপুটে মন্ত্রী, এমপি, সচিব, বিচারপতি, পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও মিডিয়া সহ প্রায় অনেক-ই কোমলমতিদের কাছে ধরা খেয়েছেন, লজ্জিত হয়েছেন চরম ভাবে। যা কখনও কল্পনা করা যায় নাই। অসম্ভবকে তারা করেছে সম্ভব। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছে রাষ্ট্র যন্ত্র। আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও সব কয়টি সোস্যাল মিডিয়া ফলাও করে প্রচার করেছে যদিও দেশিয় মিডিয়া ছিল অনেকটা নিরব ভূমিকায় আর কিছু মিডিয়া ছিল বেগুন চাষে ব্যস্ত!

২

পাঠক, বাংলাদেশের নিরাপদ সড়কের দাবিতে সব ক্ষোভ একত্রে করে, কিশোর আন্দোলনকে আরব বসন্তের ন্যায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো... আজকের শিশু-কিশোর দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎরা। তারাই আগামীর বাংলাদেশ, তারাই দেশের মালিক। তাই তারা হয়েছিল উদ্যমী। ওরাই দেশের বীর, ওরা চঞ্চল, ওরা প্রতিবাদী, ওরা আমাদের গৌরব। ওরা দেখিয়ে দিয়েছে ছাত্র আন্দোলন কত সুশৃঙ্খল হয়। তাদেরকে শত সহস্র বার স্যালুট জানাই। একটা নিশ্বাস ফেলেছি! নতুন প্রজন্ম আমাদের কনফির্ডেন্সকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশ আর ভুটান সিকিম হবে না, এটা জাতি বুঝে গেছে। ওরাই পারবে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে বায়ান্নর ছাত্র আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি, তারা দেখিয়ে দিয়েছে তিলত্তমা ঢাকা নগরী কে জানজট মুক্ত করতে কত সময় লাগবে, তারা দেখিয়ে দিয়েছে মন্ত্রী, এমপি, সচিব, এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ ক্ষমতাশালীদের বিভিন্ন অনিয়ম।

অপর দিকে... যে দলটির জন্ম হয়েছিল, শাসক শোসক ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যয় নিয়ে, যে দলটি জন্মেছিল গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মানবিকতার জন্য, যে দলটি ঐতিহাসিক ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭০ ও ৭১ এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারাই আজ বিপরীত অবস্থানে। তারাই আজ শাসক, শোসক ও স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিশ্বে আজ ফ্যাসিস্ট হিসাবে পরিচিত। তার-ই জ্বলন্ত উদাহরণ... কিশোর-ছাত্র আন্দোলনের অষ্টম ও নবম দিনে সরকারের এবং সরকারের হেমলেট বাহিনীর মারমুখী আক্রমণে টিয়ার সেল, গুলি

ও বারুদের ধুঁয়ায় ঢাকার আকাশ ছিল অন্ধকারছন্ন! রাজধানী ঢাকায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়ার আলেপ্পো নগরী, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগান ও আরাকানের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল এটা রাজধানী ঢাকা।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত শিশু-কিশোরদের আন্দোলনকে বিভিন্ন কৌশলে দমাতে না পেরে পাষাণ্ডতা ও বর্বরতার রক্তাক্ত পথই বেচে নিল সরকার। প্রথিতযশা ফটো সাংবাদিক শহিদুল আলমকে তুলে নিয়ে অমানবিক ভাবে নির্যাতন করছে। বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে নির্যাতনে বিশ্ব মিডিয়া সয়লাব। এ যেন ভয়ংকর সাংবাদিক দমননীতিরই অংশ। কিশোরদের অভূতপূর্ব আন্দোলনকে দমনের জন্যই এই সব কৌশল। বসুন্ধরায় ব্লক রেইড করা, বিভিন্ন বাসা বাড়িতে ছাত্রদের খোঁজা-খোঁজি করা। ২২ জন ছাত্রকে কোমরে রশি বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নেওয়া, বিভিন্ন স্কুলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বহিস্কারের চাপ দেওয়া এবং কারা কারা আন্দোলনে ছিল তাদের সনাক্ত করার চেষ্টা ইত্যাদি। এ যেন আইয়ুবশাহীর স্টাইলে ছাত্র দমননীতি।

৩

সরকার শুধু ক্ষমতার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমানা অতিক্রম করতে করতে এমন একটি স্থানে পৌঁছছে যে... তারা খুব ভালো করেই জানে যদি একটি বার ক্ষমতা হারায়, তা-হলে তাদের সব শেষ। ইতিহাস বলে, "ভয়ংকর অপরাধীদের সাইকোলজি এমনি হয়। তা আমরা আরব বসন্ত থেকেও দেখে এসেছি।" এ ছাড়া সাধারণ মানুষ আজ এ সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখে অহরহই বলছে, "আওয়ামী লীগ সরকার এত বেশি অন্যায়, অনিয়ম ও অবিচার করেছে, তাদের পরিণাম তারা জানে। তাই তারা ক্ষমতা ছাড়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। সে জন্যই তারা এত বেপরোয়া। সে জন্যই তারা ফ্যাসিস্ট। তাই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, লাইসেন্স বিহীন ড্রাইভার যদি বিপদজনক হয়, লাইসেন্স বিহীন সরকার তো এমনি হবে!

৪

পাঠক, আজকের ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর বড় বড় শহর থেকে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে, এ সরকারকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং তারা আওয়াজ তুলছে, এখন শুধু নিরাপদ সড়ক নয়, নিরাপদ রাষ্ট্রও চাই। দেশ ও জাতি আজ বড়-ই অনিরাপদ। নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ রাষ্ট্র আজ গণমানুষের দাবি।

প্রকাশকাল : রবিবার, ১২ আগস্ট, ২০১৮

শীর্ষ খবর ডটকম

আজ বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশ

১/১১ এর সময়ে মঈন-ফখরুল সরকার যখন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ পাঠানোর জন্য বিভিন্ন খেলায় মেতে উঠছিল এবং আপোসহীন নেত্রীকে সেরা প্রলোভন দেখিয়েও তারা ব্যর্থ হতে চলেছিল। তখন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কিন্তু সহজেই লন্ডন আমেরিকা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু সেইদিন সেনা সরকারের চাল বুঝেই দেশ না ছাড়ার পক্ষেই অনড় ছিলেন। সেদিন কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, "দেশের বাহিরে আমার কোন ঠিকানা নাই। যখন অনেকটা ফোর্স করে বিমানে তুলার চেষ্টা করছিল তখন তিনি বাংলার চির সবুজের মাটিকে আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, "আমি আমার মায়ের দেশেই থাকব, আমি আমার স্বামীর স্বপ্নের দেশেই থাকব, আমার দেশ আমি ছেড়ে চলে যাব না, আমি আমার ষোল কোটি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই, আমার দুই সন্তানকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম। অতঃপর যখন সেনা সরকারের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চললো পরিশেষে আপসহীন নেত্রীকে শেষ প্রশ্ন করেছিল... মাডাম আপনার সন্তান বড় না দেশ বড়? আপোসহীন নেত্রী কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। গণতন্ত্রের প্রতীক, আপোসহীন নেত্রী সেই দিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'দেশ বড়'। তারপরই শুরু হয় তাঁহার সন্তানদ্বয়ের উপর পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নির্যাতন। এক সন্তান ফ্যাসিষ্টের নির্যাতনে অকালে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয় আর আরেক সন্তান পঙ্গু হয়ে লন্ডনে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। সেই আপসহীন নেত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গং আজ প্যারোলের বাণী শুনাচ্ছেন। আসলে ভাবতে অবাক লাগে! বেগম খালেদা জিয়া যে কত বড় মাপের নেতা, ক্ষমতালিপ্সুরা এখনও ভালো করে বুঝেও নাই। তারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। তবে এদেশের

মানুষ কিন্তু ভালো করেই জানে এবং চিনে, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের এক প্রাণ, বেগম খালেদা মানেই বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বেগম খালেদা মানে বাংলাদেশ। আজ হাটে মাঠে ঘাটে সাধারণ মানুষ বলছে, "একজন গণতন্ত্রের প্রতীককে প্যারোলে মুক্তি নয়, জামিনে মুক্তিই তার অধিকার। এছাড়া ও সেনা সরকারের সময়ে কারান্তরীন থাকা অবস্থায় হারিয়েছেন তাঁহার মমতাময়ী মা এবং তাঁহার প্রিয় ভাই ও বোনকে। হারাতে হয়েছে স্বামীর হাতের ৪০ বৎসরের তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি। আজ ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষটি তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দুই বারের সাবেক বিরোধী দলের নেত্রী, ৩৭টি বৎসর যাবৎ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য একাধারে লড়াই করে যাচ্ছেন এবং যিনি একজন স্বাধীনতা ঘোষকের স্ত্রী, একজন বীর উত্তমের স্ত্রী, বাংলাদেশের প্রথম প্রসিডেন্টের স্ত্রী হয়েও সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত মামলায় বন্দি রেখে, আজ নির্লজ্জের মতন দখলদার সরকার প্যারোলের মুক্তির গান শুনাচ্ছে। কাকে শুনাচ্ছে? যার স্বামী শহিদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের গণতন্ত্রকে পূনঃ প্রবর্তন করে আওয়ামী লীগ নামক দলটি পুনঃজন্মের সুযোগ করে দিয়ে ছিলেন...তাকে? যে নেত্রী নয় বৎসর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ত্যাগ তিতিক্ষার ফলে বিশ্বজুড়ে আপসহীন নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন... তাকে? ক্ষমতা কারো চিরস্থায়ী নয়। কোন ফ্যাসিস্টদের হীন চক্রান্ত কখনও সফল হয় নাই।

পাঠক, আজ ইতিহাসের পিছনের পাতা একটু দেখে আসি। বিশেষ কারণে... আজ থেকে ২৬২ বৎসর আগের কথা! ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে অস্তমিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য, জাতীয়তাবাদের সূর্য! সেই দিন মীর জাফরদের বিশ্বাস ঘাতকতায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাগ্য তছনছ হয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না। আজও কিন্তু সেই মীর জাফররা পিছন ছাড়ে নাই। অতএব সাবধান জগৎ শেঠ, ঘসেটি বেগম ও মীর জাফরদের পেতাত্মা এখনও জীবিত! ক্লাইভ তার আত্ম জীবনীতে লিখে গেছেন, "রাজধানী মুর্শিদাবাদে সব চেয়ে নিছের ধনী ব্যক্তির যে ধন সম্পদ রয়েছে, সেই পরিমাণ ধনসম্পদ লন্ডনের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিরও নাই।" পর্দার অন্তরালে কিন্তু কাজ করছিল রায়-রাম-চাঁদ- শেঠদের চক্রান্ত।

১৭৫৭ সালের ২৩জুন হলো, এ জাতির জন্য মহা কলঙ্কের দিন, পাশাপাশি জাতির জন্য মহা একটি শিক্ষনীয় দিন। এখনই সময় পলাশীর ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সংগ্রাম এবং গণতন্ত্রের মুক্তির সংগ্রামের শপথ নিতে হবে। অন্যতায় আবারও বিপর্যস্ত হবে।

প্রকাশকাল : বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

শীর্ষ খবর ডটকম

জিয়া তুমি স্বাধীনতা : জিয়া তুমি অম্লান

বাংলাদেশে আত্মজাগতির ইতিহাসে এক অনন্য নাম, 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান'। ১৯৩৬ সালে ১৯শে জানুয়ারি বগুড়ার বাগবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম ছিল 'কমল'। তাহার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে মরহুম মনসুর রহমান ও জাহানারা খাতুন।

প্রাথমিক লেখাপড়া করেন কলকাতা হেয়ার স্কুলে এবং মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক করেন করাচীতে। ১৯৫৩ সালে সামরিক বাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং উচ্চতর শিক্ষা পিএস সি করেন কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে।

১৯৬৫ সালে কোম্পানি কমান্ডার হন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, খেমরান সেক্টর। ১৯৬৬ সালে ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হন সামরিক একাডেমি, কোয়েটা। ১৯৬৯ সালে অফিসার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, জয়দেবপুর ঢাকা। ১৯৭০ সালে ব্যাটালিয়ান কমান্ডার, অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং একজন সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ "বীরউত্তম" উপাধী লাভ করেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব ষ্টাফের দায়িত্ব নেন।

১৯৭৫ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান-উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৭৬ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন। ১৯৭৮ সালে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন, দলের চেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং বাংলাদেশে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং এই সালেই যোগ দিয়েছিলেন কমনওয়েলথের শীর্ষ সম্মেলনে, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে ও ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালে আল-কুদ্দুস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ইরাক ইরানের যুদ্ধাবসানে চেষ্টা চালিয়ে যান অতপর ৩০মে সেনাবাহিনীর কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে শাহাদতবরণ করেন। সেই দিন তাহার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় এশিয়ার সর্ববৃহৎ জানাজাটি তাহার ভাগ্যেই জুটেছিল।

পাঠক, এই বর্ণাঢ্য সৈনিক ও রাজনৈতিকের ৭১ এর ভয়াল মার্চ মাসের ঘটনাবলীর কিছুটা অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের তাহার নিজের লেখা একটি জাতির জন্ম" বই এর অংশবিশেষ হুবহু তুলে ধরলাম।

১৯৭১ সাল ২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে গেলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তান বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ "সোয়াত" থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো ওদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে আহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালি।

সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে।

আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিন জন লোক যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটালিয়নের একজন অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে, সে যাবে আমাকে গার্ড দিতে।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শর্বরীর মতো প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরদিনের মতোই স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময় সেখানে এলো মেজর খালিকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে এল। কানে কানে বললো, 'ওরা ক্যান্টেনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে'।

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্তগ্রহণের গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, 'আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে, আমি আসছি।

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে এলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেশে, আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম।

পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে তাকেই বললাম, 'হাত তুলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম'। সে আমার কথা মানলো। নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। পর মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর

অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার আসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুবে পড়লাম এবং গলা শুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আমার দরজা খলে কর্ণেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম 'বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো'। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটালিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্ণেল শওকতকে ডাকলাম। জানালাম 'আমরা বিদ্রোহ করেছি'। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

ব্যাটালিয়নে ফিরে দেখলাম সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট এম আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম। ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ট, কমিশনার, ডিআইডি

ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকে পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নর্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্তের আখরে বাঙালিদের হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের নগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে, ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনদিনও ভুলবে না। কো-ন-দি-ন-না।

পাঠক, এখানে প্রতিয়মান ৭১এ মুক্তিযুদ্ধের মহাসঙ্কট সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নের্তৃত্ব যখন দিশেহারা। পরবর্তী করনীয় বা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রকার দিক নির্দেশনা দিতে যখন ব্যর্থ হতে চলেছিল ঠিক তখনই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষনাই যথার্থভাবে জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছিল। তাই আমি বলি "জিয়া মানে স্বাধীনতা, জিয়া মানেই অম্লান"।

তাহার সুকৌশল নেতৃত্বেই বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় সময় অতিক্রম করেছে জাতি। ৭১ থেকে ৮১ পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনায় সহজেই দৃশ্যমান হয়, বিভিন্ন জাতীয় সঙ্কট সন্ধিকালে শহীদ জিয়ার নেতৃত্ব ও তাহার কর্তৃত্ব জাতিকে দিয়েছে সঠিক পথ নির্দেশনা।

অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে সুসংগঠিত করেছিলেন এবং তাহার নেতৃত্বেই সাড়ে ৭ কোটি মানুষ স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

ঐতিহাসিক ৭মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের মুখে স্বাধীনতা ঘোষণার অধিক আগ্রহে ছিল জাতি। কিন্তু ইতিহাস বলে, দূর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন স্বাধীনতা ঘোষনার সবকিছু প্রস্তুত থাকার পরও স্বাধীনতার ঘোষনা থেকে বিরত থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান।

যার ফলশ্রুতিতে ৭ ই মার্চ থেকে ২৬ শে মার্চ পর্যন্ত বাংলার মানুষ ছিল রাখাল বিহীন। ২৬মার্চ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সমগ্র জাতি বাংলার রাখালকে খুঁজে পায় এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

জাতির জন্য যারা পর্বত ঘেরা পাহাড় কেটে কুসুমাস্থীর্ণ পথ বাহির করেছেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহে তাদের শীর্ষ একজন।

পাঠক, এখানে শহীদ জিয়া পাকিস্তান থাকাকালীন সময়ে স্কুল জীবনের এবং ১৯৫৪ সালের যুক্ত ফ্রন্টের এই দুইটি ঘটনা না বললে আমার কথাগুলো অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই আবারও তাহার লিখা "একটি জাতির জন্ম" থেকে আরও কিছু অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে হুবহু তুলে ধরলাম।

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অসংগ্নতা আমার মনকে পীড়া দিত। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনে বহুদিন শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা।

তাদের অভিবাবকরা বাড়িতে যা বলতো, তাই তারা স্কুল প্রাঙ্গনে রোমন্থর করতো। আমি শুনতাম, মাঝে মাঝেই শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশকে শোষন করার বিষয়ক। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শিখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে।

বাঙালিদের বিরুদ্ধে স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো। স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের, বাঙালিকে নিকৃষ্টতম জাতি হিসেবে বিবেচনা করতে। অনেক সময় আমি থাকতাম নিরব স্রতা। আবার মাঝে মাঝে প্রত্যাঘাতও হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটি আকাঙ্খা লালিত হতো, যদি কখনও দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানীবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো।

সযন্তে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো, জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অশ্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মধ্যে।

উদগ্র আকাঙ্খা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তি ভুমিটাকেও তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই অপেক্ষাকে।

৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার পিষে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালিদের আশা আকাঙ্খার মুর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়।

আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আমরা সবাই পর্বতঘেরা এ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আনন্দে উদ্বেলিত হলাম। আমরা বাঙালী ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গমালা।

একাডেমী ক্যাফেটেরিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলাভাষার জয়। এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়। এ ছিল আমাদের আশা আকাংখার জয়।

এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য। এই সময়ই একদিন কতিপয় পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। তাদের আখ্যায়িত করলো বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলোনা। ঠিক হলো, এর ফয়সালা হবে, মুষ্টিযুদ্ধের দন্দ্বে।

বাঙালিদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আমি বক্সিং গ্লাভস হাতে তুলে নিলাম। পাকিস্তানি গোয়ার্তুমীর মান বাচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানী ক্যাডেট। তার নাম লতিফ (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন (১৯৭২) সে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল)।

লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে, যাতে আর কথা বলতে না পারি, সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর।

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী আমার প্রতিপক্ষ ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মিমাংসার জন্যে। এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল।

পাঠক এতে প্রমাণিত হয়, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাল্যকাল থেকেই পাকিস্তানিদের কার্যকলাপে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে বড় হয়েছিলেন। খুবই নিকট থেকেই তাদেরকে চেনাজানার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই তখন থেকেই তাহার জন্মেছিল ঘৃণা ও আক্রোশ।

সেই থেকেই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বে আঘাত হানার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন, সযত্নে রেখেছিলেন ভাবনগুলো, আকাঙ্ক্ষা জাগছিল পাকিস্তানবাদকে তছনছ করে দিতে, কিন্তু উপযুক্ত সময় ও স্থানের অপেক্ষা করছিলেন। বিধাতা তাহাকেই সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন, ৭১'র ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

পাকিস্তানীবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার এবং একজন সাহসী সেক্টর কমান্ডার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে পাকিস্তানীবাদের অস্তিত্বকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। তাহার সৈনিক জীবন ও স্বাধীনতার ঘোষণা স্বার্থক হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মাধ্যমে।

পাঠক শুধু এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৫ আগষ্টের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মাধ্যমে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিকতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র চালু করেন।

তিনি ব্যক্তিগত মন ও মানসে ছিলেন গণতান্ত্রিক। যার ফলে ৭৯ সালে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সাধারণ নির্বাচন দিয়ে বাকশাল কর্তৃক গলা টিপে হত্যা করা গণতন্ত্রকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে পূণঃজীবিত করেছিলেন।

তখন তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠণ করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অল্প দিনে পৌছেছিলেন জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে।

এদিকে বাকশাল আমলে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বদরবারে বটমলেস বাস্কেট (তলাবিহীন ঝুড়ি) হিসাবে পরিচিত। কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সামান্য দিনের রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশকে খাদ্যে স্বয়সম্পূর্ণ করে বিদেশেও খাদ্য রপ্তানী করা শুরু করেছিলেন।

বাংলার খালেবিলে সৃষ্টি করেছিলেন স্রোত। দিনেরাতে কলকারখানা চালু হয়েছিল। কৃষিতে মানুষ মনোনিবেশ করেছিল। জনশক্তি রপ্তানি তাহার আমলেই শুরু হয়েছিল এবং আজকের সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক ছিলেন তিনিই।

তাহার মাত্র ৪/৫ বৎসর রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশকে করেছিলেন উন্নয়নমুখী। বাংলাদেশ আর বটমলেস বাস্কেট থাকে নাই। বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছিলেন।

পাঠক, ইতিহাস বলে একজন সামরিক শাসক যখন ধ্বংস হয় বা মৃত্যুবরণ করে তখন কিন্তু সেই ব্যক্তি বা দল বা গুষ্ঠি সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছিল। সেইদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কলাকানন কে মিথ্যা প্রমাণ করে মৃত্যুর পর তিনি হয়ে উঠেছেন আরও আগুয়ান আরও অপ্রতিরুদ্ধ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সত্যি জিয়ার মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ জিয়ার জন্ম হয়েছে। জিয়ার রচিত তাহার প্রতিটি আদর্শ ও কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে আরও দ্রুতগামী ও গতিশীল। আজ তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রাণপ্রিয় সংগঠন বিএনপি হয়ে উঠেছে জনগণের আর্শিবাদ ও সনামধন্য বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সংগঠন। তাইতো বলি, জিয়া তুমি স্বাধীনতা, জিয়া তুমি অম্লান।

প্রকাশকাল : বুধবার, ২০ জানুয়ারি ২০১৮
শীর্ষ খবর ডটকম

‘করোনা’ হোক মানবজাতির এক মহান শিক্ষা

এক

‘কোভিড-১৯’ আজ থমকে গেছে পৃথিবী! থমকে গেছে মানুষ! নিস্তব্ধ দুনিয়া! স্তব্ধ হলিউড বলিউডের অর্ধ নগ্ন পূর্ণ স্টার। স্তব্ধ হার্ট থ্রপ কাঁপানো নাইট ক্লাবগুলো। স্তব্ধ এই বিশ্বের নয়নাভিরাম হলিউডে স্পষ্ট। বিশ্বের মেগা সিটিগুলি ভুঁতুড়ে নগরীতে পরিণত। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! দুনিয়ার উপাসনালয় মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, বন্ধ! এ সবই বন্ধ। শুধুই খোলা আছে দুনিয়ার সব হাসপাতালয়, ঔষধালয়! শুধু লাশ আর লাশ। দিকে দিকে লাশ! গণকবরে লাশ দাফন করতে হচ্ছে। এই লিখাটি লেখা পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রায় দুই লক্ষ মানুষ এবং আক্রান্ত আছেন প্রায় পঁচিশ লক্ষের উপরে। এ সবই হচ্ছে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা ক্ষুদ্র একটি ভাইরাসের জন্য! আজ বিশ্ব করোনা ভাইরাসের কাছে পরাজিত। বিশ্বের ক্ষমতাধর যে সব রাষ্ট্রের হুংকারে দুনিয়া কেঁপে উঠতো, যারা চাহিবা মাত্র কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা কোন ব্যপার না। তারাই আজ ছোট্ট করোনার কাছে বড় অসহায়। তারা থরথর করে কাঁপছেন, হিমশিম খাচ্ছেন। আজ যেন সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে।

আজ কোথায় বিশ্বের ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রের তাদের বাজেটের বড় অংকের মানুষ মারার যন্ত্রগুলো? চুপচাপ বসে আছে! বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, অত্যাধুনিক ফাইটার্স, রকেট, নিউক্লিয়ার কোন কিছুই তো আজ কাজে আসছে না। আজ সবই যেন অনর্থক!

আজ এই সামান্য ভাইরাসের কাছে দিশেহারা ও বিপর্যস্ত মানবজাতি। বিপর্যস্ত মানবজাতির দৈনন্দিন কর্মশালা ও আজ লণ্ডভণ্ড। লণ্ডভণ্ড আজ পৃথিবীর সব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এত বড় ক্ষতির মুখে পৃথিবী আর পড়েনি। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধেও হয়তো এত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতো না এ পৃথিবী। আজ কেহই বলতে পারছে না কোন অজানা পথে পৃথিবী হাঁটছে।

দুই

পাঠক লেখাটি যখন লিখছি বার বার মনে হচ্ছিলো সিরিয়ানদের নির্মম হত্যার ট্র্যাজেডি, গাজাবাসীদের হত্যার ট্র্যাজেডি, ইয়ামানবাসীদে হত্যার ট্র্যাজেডি ও ইরাকীদের হত্যার ট্র্যাজেডি। পুরো বিশ্ব এ সব হত্যা ও জুলুমের ব্যপারে নিরব ভূমিকা পালন করছে ও পালন করে চলছে। অনেকের হয়তো মনে আছে, সিরিয়া একটি ছোট্ট শিশু শহিদ হওয়ার আগে অত্যাচার ও জুলুম সহ্য করতে না পেরে বলেছিল, “আমি আমার ঈশ্বর কে সব কিছু বলে দিব”। আজ এ বিশ্বের দিকে তাকান। ছোট্ট একটি ভাইরাসের জন্য কম্পমান সারা দুনিয়া।

আজ একমাসের উপরে হয়ে গেছে সারা বিশ্ব লকডাউনে আছে। বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে এখন টের পাচ্ছে। লকডাউন কী? যেন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। আজ সহজেই অননুমেয় যখন একাধারে সাতটি মাস সারা কাশ্মীর ছিল লকডাউনে তখন তারা কেমন ছিল? তখন ৮/৯ লক্ষ সেনা বেষ্টিত ছিল। ল্যান্ডফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এ সব বন্ধ ছিল। বাড়ি বাড়িতে ছিল গ্রেপ্তারের হুলিয়া। ছোটো বড় সব নেতারা ছিল বন্দি। তাদের খানাপিনা কি ভাবে চলছিল, শুধু সৃষ্টি কর্তাই জানতেন। মহিলা এবং বাচ্চারা দিনে রাতে আতঙ্কিত অবস্থায় বাড়িতে থাকত। কখন কি হয়ে যায়। সেই দিন গোটা দুনিয়া তামাশা দেখছিল। বিশ্ব মানবতা সজাগ ঘুমিয়ে ছিল। পাঠক লেখাটি মোটেই এত লম্বা করার ইচ্ছে ছিল না, তারপরও প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক কিছু চলে আসে। এখন প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়...যখন কাশ্মীর ছিল দীর্ঘ সাত মাস লকডাউনে তখন বিশ্ব মিডিয়া ছিল জাগ্রত ঘুমে। জাগ্রত ঘুমের ঘুরে কিছু কিছু মিডিয়ায় যখন কথা উঠছিল তাদের লকডাউন নিয়ে, তার প্রেক্ষিতে ইউরোপিও ইউনিয়নের কয়েকজন সাংসদ কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। সে সময় পরিদর্শক দলের সাথে থাকার জন্য ভারতের অথাৎ তাদের পছন্দমত কয়েকজন সাংবাদিক দিয়েছিল ভারত সরকার। যাতে কাশ্মীর সর্ম্পকীয় সংবাদটি তাদের অনুকূলে থাকে। ওই সময় একজন সাংবাদিক ছিলেন ইকোনমিকস টাইমসের ‘অরবিন্দু মিশ্র’।

এই তো সদ্য সাংবাদিক অরবিন্দু মিশ্র নাফিসা উমর নামে কাশ্মীরের একটি মেয়েকে নিয়ে কাশ্মীর অভিজ্ঞতার উপর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি

পোস্ট করেছিলেন, যে পোস্টটি বিশ্ব জুড়ে ভাইরাল হয়েছিল। পোস্টটির অংশ বিশেষ তুলে ধরছি। কাশ্মীরের শ্রীনগরের একটি বাড়ির জানালা থেকে নাফিসা উমর বলছিলেন, "অরবিন্দু ভাইয়া, আপনি দেখে নিবেন, আমার প্রার্থনা খুব শীঘ্রই কবুল হবে।" অরবিন্দু বলছিলেন, "তুমি কি প্রার্থনা করেছ? এবং কেন?" (এখানে বলা বাহুল্য নাফিসা আগেই সাংবাদিক অরবিন্দু কে জানতেন। নাফিসা উমরের ফুফুত ভাই বিলালের বন্ধু সাংবাদিক অরবিন্দু।)

সাংবাদিক অরবিন্দু বললেন, "তখন নাফিসা উমর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে যা বলছিলেন। আমার কানে অনেক দিনই তা বেজেছে। এখন চোখের সামনেই তা দেখতেছি। আজ আমরা সবাই যে ঘরে বন্দি, আমার কানে নাফিসার সেই কথাগুলি বার বার বাজছে।"

নিম্নে নাফিসার হুবহু তার প্রার্থনাটি তুলে ধরছি...

ইয়া আল্লাহ! যা কিছু আমাদের উপর হচ্ছে, তা যেন অন্য কারোর উপর না হয়। শুধু তুমি এমন একটা কিছু করে দাও, যাতে গোটা পৃথিবী কিছু দিনের জন্য নিজেদের ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। সব কিছু যেন বন্ধ হয়ে যায়। তা-হলে হয়তো দুনিয়া অনুভব করতে পারবে যে, আমরা কি ভাবে বেঁচে আছি? কেমন করে বেঁচে আছি? পাঠক আর বেশি লিখব না...সবাই অনুভব করুন। বিশ্বের দিকে তাকাই। বিশ্ব মানবতা অনুভব করুক। করোনা হোক বিশ্ব মানবতার এক মহান শিক্ষা।

প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

"খেতাব সরানো যাবে, কবরও সরানো যাবে, কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা জিয়া কি সরানো যাবে"

এক

আজ লিখছি বাংলাদেশের ইতিহাসে দু-টি অক্ষরের একটি কালজয়ী নামের কথা! যে নামটি হলো "জিয়া"! যার মাত্র চার, সাড়ে চার বছরের শাসন আমলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। যার নাম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত সহস্রাধিক স্থাপনায় লিখে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে ধারণ করে আছে জিয়াকে।

যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, জেড ফোর্সের অধিনায়ক, বীর উত্তম, গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্টাতা ও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপতি।

পাঠক ইতিহাস বলে দেয়, ৭৫ এর ১৫ আগষ্টের বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মাধ্যমে দেশে সামরিক তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রবল ভাবে ইতিহাস সাক্ষী তখন খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সামরিক তন্ত্র চালু

হলেও, প্রসিডেন্ট জিয়া সেই দিন সামরিক তন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র-ই চালু করে ছিলেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, কারণ জিয়া ব্যক্তিগত মন মানসে ছিলেন গণতান্ত্রিক। যে কারণে ৭৯ সালে সবদলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে নির্বাচন দিয়ে, বাকশাল কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়া গনতন্ত্রকে, বঙ্গোপসাগর থেকে টেনে উদ্ধার করে বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়।

দুই

পাঠক, বলতে হচ্ছে ১৯৭৭ সালে বাদশাহ ফাহাদের আমন্ত্রনে সৌদিতে যান বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং উপহার হিসাবে সাথে নিয়ে যান কিছু নিম গাছের চারা। নিম চারা গুলো উপহার দেওয়ার সময় জিয়া বলছিলেন," গরিব মানুষের দেশের, গরিব রাষ্টপতির পক্ষ থেকে আপনার জন্য এই সামান্য উপহার।

উল্লেখ্য সৌদি বাদশাহ বহু দেশ থেকে বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী তৎকালীন সময় থেকে এখন পর্যন্ত পেয়ে আসছেন কিন্তু বাদশাহের ভাষায় এমন মূল্যবান উপহার বাদশাহ ফাহাদ আর পান নি! বাদশাহ আবেগ আপ্লুত হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানকে।

জিয়াউর রহমানের দেওয়া সেই নিমের চারাগুলি আজ মক্কা থেকে সমস্ত সৌদিজুড়ে।

আজ বাংলাদেশের স্মৃতি পবিত্র সৌদির মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন থেকেই এই গাছগুলোর নামকরণ হয় জিয়া ট্রি,আরবিতে বলা হয় জিয়া সাজারা। তবে "জিয়া ট্রি" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

আজ কোটি কোটি হাজীরা আরাফাতের ময়দানে এই জিয়া ট্রির সুশীতল ছায়াতলে বসে, বিশ্বের কালজয়ী এই নেতার জন্য দোয়া করছেন অবিরত।

এছাড়াও আংকারা ও বাহরাইনে সুপ্রশস্থ রাস্তায় শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষকের নাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এদিকে ২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একটি বড় রাস্তার নামকরণ হয়েছে "অনারারি জিয়াউর রহমান ওয়ে"।

এসব যেন নিঃসন্দেহে এই মহান কালজয়ী নেতার প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগনের এক বিনম্র শ্রদ্ধার স্মারক! এতসব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছে।

শহীদ জিয়া বিশ্বজুড়ে এতসব কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জনের পরও তারা মুছে দিতে পারে নিজ দেশের এয়ারপোর্টের জিয়া নাম, মুছে দিতে পারে বিভিন্ন স্থাপনার নাম, তারা উচ্ছেদ করতে পারে তিন তিন বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত আটত্রিশ বছরের বাড়ি থেকে। ৭৪ বছর বয়স্ক তিন বারের প্রধানমন্ত্রীকে টুনকো একটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত মামলায় তিন বৎসর যাবৎ জেলে আটকিয়ে রাখছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলায় সাজা দিয়ে দেশে আসার পথ বন্ধ করে রাখছে।

এসবের দরুন আশ্চর্য বা হতবাক মোটেই হই না কারন যেহেতু মাফিয়া তন্ত্র চলছে।

তারপরও কিছুটা হতবাক হই যখন দেখি যে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা পদকের প্রবর্তন করলেন। ২০০৩ সালে বেগম খালেদা জিয়া তাঁর শাসন আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক প্রদান করলেন। নির্লজ্জের শেষ কোথায়,, আজ তাদেরই প্রবর্তন ও প্রদান করা পদক কেড়ে নিল মাফিয়া সরকার। এ বর্বরতার শেষ কোথায়।

তিন

আজ যখন বিশ্ব নন্দিত মিডিয়া আল-জাজিরা কর্তৃক বাংলাদেশকে নিয়ে "অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান" নামে একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করল এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বজুড়ে সেইম, সেইম আলোড়ন সৃষ্টি করল, ঠিক সেই সময়ে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় খেতাব বীর উত্তম বাতিল করে জাতীয় মুক্তি যোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে জিয়ার কবর স্থানান্তরের জন্য এভাবে একটা ঘৃণিত খেলা শুরু করেছিল। আজ গ্রাম গঞ্জ থেকে শুরু করে শহর থক সাধারণ মানুষের বুঝার কিছু বাকি নেই, এ খেলা কিসের? মানুষজন ধিক্কার জানাচ্ছে, নির্লজ্জেতার যেন শেষ নাই!

আমি বলছি, খেতাব সরানো যাবে, লাশও সরানো যাবে, কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা জিয়া কি সরানো যাবে? না, জিয়া মানুষের হৃদয়ে গাঁথা এক ভালোবাসার নাম। যার অস্তিত্ব বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে, প্রতিটি নদীর বাঁকে, প্রতিটি মেঠো পথে, রাখালের কণ্ঠে, গানের ছন্দে, এই নাম কালজয়ী, এই নাম অজয়। এখন প্রয়োজন একটি গণ বিপ্লবের মাধ্যমে মাফিয়া কে বিদায় করা। এখনই সময় কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা রুখে দাঁড়াতে হবে। বিপ্লবের ডাক বিএনপিকেই দিতে। এখন সময় ক্ষেপণ করা আহম্মকের পরিচয়।

আজ যারা ক্ষমতার ভারে মাফিয়া তন্ত্রে বীর উত্তম, স্বাধীনতা পদক ইত্যাদি বাতিল করছেন। তাদের বুঝা দরকার ক্ষমতা কখনও এক জায়গায় থাকে না। রদ বদল হবেই। তারা একদিন ইতিহাসে লিখিত হবেন। ইতিহাসের গহীন গহ্বরে পতিত হবেন। সময় সন্নিকটে। ইতিহাস ইতিহাসের গতিতেই চলবে।

প্রকাশকাল : শুক্রবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শীর্ষখবর

তৃ তী য় প র্ব

শীর্ষ খবরে সম্মানিত লেখকবৃন্দ

সূ চি প ত্র

তৃ তী য় প র্ব : শীর্ষ খবরের সম্মানিত লেখকবৃন্দ

- বঙ্গভবনের সেই দিনগুলো : **মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ॥ ২১১**
- যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে : **শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস ॥ ২২০**
- তবুও কি আ.লীগ জিয়ার অবদান অস্বীকার করবে? : **মারুফ কামাল খান ॥ ২২৩**
- আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া : **শওকত মাহমুদ ॥ ২২৮**
- তারেক রহমান সম্পর্কে যা শুনেছি শুনছি এবং যেরকম দেখেছি : **মিনার রশিদ ॥ ২৩৪**
- মুক্তিযুদ্ধ খেতাব বাতিলের রাজনীতি : **ড. আসিফ নজরুল ॥ ২৩৯**
- কৃষি-উন্নয়নে রণাঙ্গনের যুদ্ধা শহীদ জিয়ার অবদান : **জামান সরকার মনির ॥ ২৪৩**
- ইতিহাস তারেক ও কোকো'কে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাক্ষী দেয় : **রাকেশ রহমান ॥ ২৫০**
- চরিত্রহনন এবং গণতন্ত্র : **হুমায়ুন কবির ॥ ২৫৩**
- মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে জিয়ার সাহসিকতার খেতাব বাতিল কার স্বার্থে? : **ডক্টর এম মুজিবুর রহমান ॥ ২৫৮**

বঙ্গভবনের সেই দিনগুলো

মোখলেসুর রহমান চৌধুরী

২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারির নির্ধারিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশ নিয়েছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটও সেই নির্বাচনে অংশ নেয়। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এখন এ বিষয়ট বর্ণনা করার কারণ কি? হ্যাঁ, অবশ্যই কারণ আছে। যারা সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব পালনকারী ২০০৬-২০০৭ইং এর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছিলেন তাদের জন্য এই উত্তর দিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে সেই নির্বাচন হলো না কেন? সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মনোয়য়ন বাতিলের ঘটনা ছিল এখানে ট্রাম্পকার্ড। এ ঘটনাই প্রধান বিরোধী দলকে নিবাচন বর্জন করার সুযোগ করে দেয়। রির্টানিং অফিসাররা দেশের পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় জেনারেল এরশাদের মনোনয়ন বাতিল করার কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ আসে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে নির্বাচনটি হয় এবং সকল সকল দলের অংশগ্রহনের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দিন-রাত কাজ করেছি। প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে আমি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা দুই নেত্রীর সঙ্গে আলদাভাবে একান্ত বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের কাছাকাছি উপনীত হই। পরে সেনারগাঁও হোটেল কমপ্লেক্সে প্রধান বিরোধী দলের দাবিনামা নিয়ে বসে সমাধানযোগ্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করি ক্রমাগত তিন দিন বৈঠক করে।

মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন সর্বশেষ আরও দু'দিন বাড়ানোর জন্য আওয়ামীলীগ থেকে বার বার দাবি জানানো হচ্ছিল। বলা হয়েছিল, এটিই তাদের শেষ দাবি। এর আগে একটি দাবি মানতেই আরেকটি দাবি দেওয়া হচ্ছিল। তাই আর দাবি মানার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি ছিল। কিন্তু আমরা সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন করতে কাজ করছিলাম। এইচএম এরশাদ মনোনয়নপত্র বাড়ানোর দাবির এই অবস্থায় অর্থাৎ মনোয়নপত্র প্রত্যাহার প্রথমে নির্ধারিত তারিখের আগের রাতে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে তিনবার ফোন করেছিলেন। কাজী জাফর আহমদ করেছিলেন দু'বার। প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন প্রোগ্রাম, খাওয়া ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরে যখন রিং ব্যাক করা হলো তখন জেনারেল এরশাদ বললেন, মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আওয়ামীলীগ নির্বাচন বর্জন করলেও আমরা নির্বাচন করবো। সারা দেশের সব নির্বাচনী এলাকায় এ জন্যই আমাদের আলাদা প্রাথী দেওয়া আছে। কিন্তু আমরা সকলেই চাচ্ছিলাম ১৯৮৮ বা ১৯৯৬ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী মতো নির্বাচন না করতে। সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন করতে। ওই রাতে বঙ্গভবনে দু'জন উপদেষ্টা মাহবুবুল আলাম ও ড. শোয়েব আহমদ উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপদেষ্টাদের নিয়মিত চা-চক্রের অংশ হিসেবে তারা এসছিলেন। এছাড়া, মনোয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বাড়ানোর দাবির পক্ষেও তারা কথা বলছিলেন।

অনেক ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে যে আওয়ামী লীগকে আমরা নির্বাচনে নিয়ে এসেছিলাম সেই শ্রম সফল করতে ওই রাতেই আমরা মনোনয়নপত্রও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ দু'দিন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগ এ সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিল। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করে এভাবে নির্বাচনের তারিখ বার বার পেছাচ্ছিলাম আওয়ামী লীগের দাবি মানতে গিয়ে। কিন্তু রিটানিং অফিসারদের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় এরশাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করার ঘটনা এসব উদ্যোগ আয়োজন তছনছ করে দেয়। চারটি আসনে রটানিং অফিসার ছিলেন ডিসি। তারা একই রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। আর ঢাকায় রিটার্নিং অফিসার ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার। ঢাকায় এরশাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্থাৎ মনোনয়ন গ্রহণ বা বাতিল-এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াই প্রথমে কাগজ পাঠানো হয়েছিল নির্বাচন কমিশনে। ইতোমধ্যে সিলেট, হবিগঞ্জ, রংপুর ও নীলফামারী থেকে রিটার্নিং অফিসারদের পাঠানো সিদ্ধান্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচারিত হচ্ছিল। নির্বাচন কমিশন ঢাকার রিটার্নিং অফিসারকেই তখন সিদ্ধান্ত দিতে বলেছিল। অন্যান্য রিটানিং অফিসারের সিদ্ধান্ত ফলো করা হয়

তখন। এরশাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলেছিলাম কিন্তু তারা বিধির উল্লেখ করে বলেছিলেন, এ বিষয়ে রিটানিং অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। নির্বাচন কমিশনের কিছু করা নেই। পরে যথারীতি জেনারেল নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছিলেন এবং বিধি অনুযায়ী তা খারিজ করে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা একেবারে নিম্ন পযায়েও কোন হস্তক্ষেপ করিনি। ডিসি ইউএনও কোন পর্যায়েই নয়। আমরা চেয়েছিলাম প্রশাসন স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কিন্তু সেদিন কেন এবং কিভাবে এ ঘটনা ঘটেছিল সে প্রশ্নে র উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। কেবল দাবির পর দাবিই নয়, রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আমরা এমন সব দায়িত্ব পালন করেছি যার ফিরিস্তি হবে অনেক লম্বা। যেমন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একদিন রাতে ফোন করে পরের দিন রাতে প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রাম চেয়েছিলেন। চারদলীয় জোটের যেসব নেতা তার সঙ্গে থাকবেন তিনি তাদের নামের তালিকাও দিয়েছিলেন। পরদিন রাত সাড়ে ৯ টায় তার ওই প্রোগ্রাম কনফার্ম করে দিয়েছিলাম। সামরিক-বেসামরিক সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে ওই প্রোগ্রাম চলে গিয়েছিল। পরদিন সকালে আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। মহাজোটের নেতৃবৃন্দ যারা তার সঙ্গে থাকবেন যথারীতি তাদের তালিকাও দেন। ওই দিন সারাদিন প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রাম ছিল এবং রাতে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম যুক্ত হওয়াররপর ফুরসত নেওয়ার সময় ছিল না। কিছুদিন আগে গুরুতর অসুস্থ অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভকারী প্রেসিডেন্টের ওপর এভাবে চাপ দেওয়ার বিরুদ্ধে তার মেডিকেল বোর্ড ক্ষুব্ধ ছিল। শেখ হাসিনা যখন ফোনে সময় চাচ্ছিলেন তখনই আর কোন প্রোগ্রামের জন্য সময় দেওয়া ম্যাডিকেল বোর্ডের বারণ ছিল কঠোরভাবে। কিন্তু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে সম্মান করে প্রোগ্রাম দিয়ে ফেলেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি জানতে চান ওই দিন রাত সাড়ে ৯টায় বেগম জিয়ার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে বলা হয়, তাকে ওই সময় দিতে এবং বেগম জিয়াকে সময় সন্ধ্যা ৭টায় (যে সময় শেখ হাসিনাকে দেওয়া হয়) নিয়ে আসতে। বেগম খালেদা জিয়াকে এ বিষয়ে অনুরোধ করলে, তিনি বলেন, আমিতো আগের দিন রাতে সময় নিয়েছি। তাহলে প্রোগ্রাম বাদ দিন। এখন দু'দিক থেকেই সমস্যা হলো। দুটি প্রোগ্রামই বাদ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। একাদিকে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের চেষ্টা, অন্যদিকে এই ইগো সঙ্কট এবং প্রশাসনিক কাযক্রম তো রয়েছেই- বলা চলে আমাদেরকে সারাক্ষণ স্নায়ুচাপের মধ্যে রেখেছিল। প্রটোকল অনুযায়ী ইমিডিয়েট পাস্ট প্রাইম মিনিষ্টার বা সদ্য

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্মান করতে গিয়ে ওই দিন সময় দেওয়া হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দুই নেত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে যোগাযোগ করে বরফ গলাতে চেষ্ট করেছিলাম। বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেবল বলছিলেন, স্যার আপনি তাদেরকে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন। অথচ প্রটোকল অনুযায়ীও ইমডিয়েট পাষ্ট পিএম শেষে সময় পান। ২০০১ সালে এ রীতি অনুসরণ করে শেখ হাসিনাকে সব শেষে সময় দেওয়া হয়। যা হোক শেষ পর্যন্ত বেগম জিয়া রাজি হন। স্বল্প সময় হাতে নিয়ে তিনি চারদল নেতৃবন্দকে নিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনে আসেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ বৈঠক শেষ হতেই সাড়ে ৯ টায় বৈঠকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট নেতৃবৃন্দ আসেন। উপদেষ্টা এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে আমি যোগ দিই। শেখ হাসিনা প্রোগ্রামের সময় নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে ধন্যবাদও দিয়েছিলেন।

আমাদের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন মোট ১৪ জন। একপর্যায়ে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে তাদের শূন্যস্থান পূরণে আরও চারজন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের সকলের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক ছিল। তারা দেখেছিল রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানে কিভাবে রাত দিন নিরলস পরিশ্রম করেছিলাম। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে দুই নেত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ এবং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে সরকারের উপদেষ্টারাও এপ্রিসিয়েট করছিলেন। আমি তাদেরকে আলাদাভাবে যার যার মতো যোগাযোগ করতে বলি। ফলাফল ছিল একই। আমাদের মধ্যে সমস্বয়ের কোন সমস্যা ছিল না। দুই নেত্রীর সঙ্গে একান্তভাবে বসা এবং শেখ হাসিনার মনোনীত ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে বসে নির্বাচন করার স্বার্থে একটি সমাধানে উপনীত হওয়ার পর্যায়ে এসে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পরিষদকে সময়ে সময়ে অগ্রগতি অবহিত করতাম।

আমাদের সামনে ছিল সংবিধান নির্ধারিত দুটি পথ। একটি দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। আর অপরটি ঘড় Policy decision সরকারের day to day affair অর্থাৎ কেয়ারটেকার হিসেবে রুটিন দায়িত্ব পালন করা। সংবিধানের ১২৩ ও ৫৮ ধারা ও এসব ধারার উপধারাসহ মিলিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা হচ্ছেন দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। জনগণের ভোটে তারা ক্ষমতায় আসেন। প্লেয়ার ছাড়া যেমন খেলা হয় না তেমন রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ করতে না দিলে নির্বাচন হবে না। এ মূলনীতি সামনে রেখে আমরা রাজনীতিকদের সঙ্গে সমঝোতার লক্ষ্যে কাজ

করছলাম। যারা এ দেশে হাওয়া ভবন বানাতে মূল দায়িত্ব পালন করলেন এবং পরবর্তীতে বিএনপি থেকে সরে গেল তারা আমাকে হাওয়া ভবনের এজেন্ট, গুপ্তচর ইত্যাদি আখ্যা দিলেন। অথচ আমি হাওয়া ভবনে কখনও যোগাযোগ করিনি এবং হাওয়া ভবন থেকেও আমার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ করা হয়নি। দুই নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারাও করেছেন। এসব নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সঙ্কট সমাধানের জন্যই করতে হয়েছে। আমি যা কিছু করেছি প্রকাশ্যে, গোপনে নয়। কিছু মিডিয়া প্রচার করেছে আমি নাকি মোবাইল ফোনে মিটিংয়ের কথোপকথন ধারণ করে পাচার করেছি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্রি ফ্লো অব ইনফরমেশনের যুগে ট্রান্সপারেন্সির জমানায় কোন কিছুই গোপনীয় ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কোন গোপন মিটিং করতে বঙ্গভবনে আসতেন না। যা আলোচনা হতো সব দু'পক্ষের বক্তব্য হিসেবে প্রেসে যেতো। ব্রিফ্যিং দেওয়া হতো। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হয়নি এমন সব অবান্তর ইস্যু কিছু কিছু মিডিয়ায় তখন স্থান পেয়েছে।

প্রেসিডেন্ট যখন প্রধান উপদেষ্টা হন তখন তাকে দায়িত্ব পালনের সহযোগিতার জন্য উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দায়িত্ব পালনকালে সরকার প্রধানের উপদেষ্টা ছিলেন সালাহ্ উদ্দিন কাদের চৌধুরী (মন্ত্রী), অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম (প্রতিমন্ত্রী), রিয়াজ রহমান (প্রতিমন্ত্রী), বরকত উল্লাহ বুলু (প্রতিমন্ত্রী), ও মাহমুদুর রহমান (উপমন্ত্রী), ডা. এসএ মালেক (মন্ত্রী), এম আনিসুজ্জামান (মন্ত্রী), খোন্দকার আসাদুজ্জামান (মন্ত্রী) ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (পদমর্যাদা দেওয়ার কথা ছিল) প্রেসিডেন্ট যখন প্রধান উপদেষ্টা অর্থাৎ একসঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান তখন এতজন কিংবা ডাবল উপদেষ্টা না নিয়ে রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী এমনকি আইন মন্ত্রণালয়, এটর্নি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায় থেকে ভেটিং করে একজন উপদেষ্টা নিয়েছিলেন। এটাকে না বুঝে অনেকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য ড. আকবর আল খান মিডিয়াকে তখন একাধিকবার এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট যতজন ইচ্ছা উপদেষ্টা নিতে পারেন এবং অতীতেও নেওয়া হয়েছে এবং কাজের স্বার্থে এটা প্রয়োজন। উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়ার কথা থাকলেও আমি প্রতিমন্ত্রী হিসেবেই রাজি হই। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ ও মহাজোট নেতৃবৃন্দের সামনে বঙ্গভবনে আমাকে দেখে কনগ্র্যাচুলেশনস বলে বলেছিলেন, হোয়াই স্টেট মিনিষ্টার, হোয়াই নট ফুল মিনিষ্টার? কিন্তু আওয়ামী লীগের কিছু নেতা আমার বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কারণে প্রেসিডেন্ট বানালেও তার হাত দিয়ে ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। আবদুর রহমান বিশ্বাসকে একইভাবে বিএনপি প্রেসিডেন্ট বানালে তার হাত ধরে

ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। বিএনপি'র মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আমাকে উপদেষ্টা বানানোর কারণে আমাকে বিএনপি ধরা হলো কেন– সেটি আমার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচন সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে আমরা কাজ করেছি কিনা। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশে কেয়ারটেকার সরকার নেই। কিন্তু আমাদের দেশে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণে সংবিধানে এ সরকারের ঠাঁই হয়েছে। এরপরও অবিশ্বাস থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। ২০০৭ সালের ২২ শে জানুয়ারির নির্বাচন নিরপেক্ষ হতো এবং বড় দল দু'টির যে কোনটিই ক্ষমতায় আসতে পারতো। কিন্তু এ বাস্তবতা ও এ ক্ষেত্রে গৃহীত সকল কার্যক্রমকে নস্যাৎ করা হয়েছে কিছু রাজনীতকের অবিমৃষ্যকারিতার কারণে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ১৯৯১ সালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনকালে বলেছিলন No bodz is neutral কিন্তু যার যার কাজটা নিরপেক্ষভাবে ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে করতে হবে। এটাই হচ্ছে বিধান।

প্রেসিডেন্ট একজন ব্যক্তি নন, একটি ইন্সটটিউশন। এটি দেশের সর্বোচ্চ ইন্সটটিউশনও বটে। প্রেসিডেন্টের নাম বিকৃত করাসহ বিভিন্নভাবে এই ইন্সটিটিউশনকে অসম্মান পর্যন্ত করা হয়েছে। আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইন্সটিটিউশনকে উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বিএনপি মহাসচিব ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ে সংলাপ শেষ পর্যন্ত ৩১ দফা থেকে এক দফায় পরিণত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বিচারপতি কে. এম. হাসান চলে গেলেই হবে। বিচারপতি হাসান অপারগতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আবদুল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বল্পমত সময়ে তাদেরকে প্রেসিডেন্টের সামনে হাজির করি। জনাব জলিল কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে সংবিধানের ৬টি অপশন প্রসঙ্গে বললেন, প্রেসিডেন্ট তো আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তিনি দায়িত্ব নিলে তো আমরা বেশি খুশি হবো। কারণ তিনি অসুস্থ হলে তো তাকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং আমরাই তার পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলাম। বঙ্গভবনের গেটে টিভি ক্যামেরাগুলোর সামনে তিনি তখন গিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ মহামান্য প্রেসিডেন্ট রাজি হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে। সঙ্কটের সমাধান হয়ে যাবে। ধানমন্ডিতে গিয়ে মিটিং করে বললেন, মানি না। অথচ প্রেসিডেন্ট বলেছিলের সদ্যসাবেক দু'জন প্রধান বিচারপতি সদ্য সাবেক আপিল বিভাগের দুজন সিনিয়র বিচারপতি বিভিন্ন কারণে দায়িত্ব নিতে না পারায় অর্থাৎ চারটি অপশন এক্সজস্টেড হওয়ায় পঞ্চম অপশন অনুযায়ী আপনারা দু'পক্ষ একমত হোন। তারা প্রকমত হতে না পারলে ষষ্ট ও শেষ অপশন অনুযায়ী আই কুড অপার মাইসেলফ। দেশের স্বার্থে আমি অসুস্থতা থেকে কিছুদিন আগে মোটামুটি সুস্থ হলেও এ

দায়িত্ব নিতে পারবো। দুজন প্রধান বিচাপতির মধ্যে বিচারপতি কেএম হাসানের পর ছিলেন বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী। তিনি তখন মাত্র কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। আর দু'জন সিনিয়ার বিচারপতির মধ্যে প্রথম ছিলের বিচারপতি এম এ আজিজ। যিনি সদ্য আপিল বিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলগুলো তাকে মানছিল না। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবেও আপত্তি করছিল।

এরপর আসে বিচারপতি হামিদুল হকের নাম। তাকে বিএনপি সরকার বিচার প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান করেছিলেন। অবসরের পর লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা অযোগ্যতার মধ্যে পড়ে। তারপরও তিনি লিখিত দিয়েছিলেন এক পক্ষের আপত্তির কারণে তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে সম্মত নন। পঞ্চম অপশনে বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী প্রসঙ্গ এসেছিলেন। মান্নান ভূঁইয়া তার জোটের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বলেছিলেনকে এম হাসানের ব্যাপারে যে কারণে আপনাদের আপত্তি একই কারণে এখানে আপত্তি আছে। কে এম হাসানের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি নিদিষ্ট ছিল। আর পঞ্চম অনুযায়ী সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে মাহমুদুল আমিন হতে পারতেন। তথাপি জনাব চৌধুরীর সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি বলেছিলেন কেবল সকল পক্ষ একমত হলেই আমি দায়িত্ব নেব।

সমস্যা সমাধানে দুই নেত্রীকে একসঙ্গে বসাতে চেয়েছিলাম। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কিভাবে ছুটিতে পাঠানো হলো- ইত্যাদি ঘটনা বণনা করা যাবে। তবে আমাদের আমলে আমরা কিভাবে সমাধান করেছি বিশেষ করে নির্বাচনে সকল দলকে আনা পর্যন্ত এসব বলতে আমি রাজি হয়েছি। নির্দোষ বিষয় প্রকাশ করতে অসুবিধা নেই। তবে অনেক মিডিয়ার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে পারলেও পারিনি জনাব মতিউর রহমান চৌধুরীর উপর্যুপরি আন্তরিক অনুরোধ ফেলে দিতে। তবে একটি জায়গায় আমরা একাগ্রত হয়েছি যে, আমরা গত অসমাপ্ত নিবাচন পযন্তই থাকবো। সে সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর ঘটনাগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। সারা জীবন সততার সঙ্গে আমার দায়িত্ব পালনের ঘটনাবলী যারা আমাকে কাছে থেকে দেখেছেন তাদের কাছে নতুন করে বলার নেই। প্রেসিডেন্টের প্রেসসচিব থাকাকালে আল্লাহর অসীম রহমতে বঙ্গবভনের শতবর্ষ ও Hundred Years of Bangabhaban নামে দুটি বই প্রকাশ, প্রেসিডেন্টের অসুস্থতাকালে তার মুখপাত্র হিসেবে প্রেস ফেস করা এবং সবোপরি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে ঐতিহাসিক মুহূর্তে দায়িত্ব পালনের স্মৃতিময় ঘটনাগুলো সম্পর্কে এ দেশের মানুষের জানার আগ্রহ, কৌতুহল এবং সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যাপারে জনগণের

জানার অধিকারটি আমার আছে গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফর ও ব্রিগেডয়ার জেনারেল শাবাব আশফাক হত্যা–ইত্যাদি ঘটনার সময় সাংবাদিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের স্মৃতির ঘটনা অনেকে জানেন।

আমি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা থেকে পদত্যাগ করার পর একটি পত্রিকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেশকিছু নিয়োগ, রদবদল ইত্যাদি নিয়ে লেখা হয় এবং যেখানে এসব ঘটনার জন্য আমাকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এসব ঘটনা দেখে আমি অবাক ও বিস্মিত হই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকলেই হেসেছেন। পরে এগুলোর তদন্ত হয়েছে। আমি পত্রিকাটির সম্পাদকের সঙ্গে কথা বললে তিনি অনুযোগের সুরে বলেন, চার-পাঁচদিন নাকি তিনি আমাকে ফোন করেছেন এবং কথা বলতে পারেন নি। এ জন্য এটি লেখা হয়েছে। আমি বললাম সত্য-মথ্যা যাচাই করে নিলে তো পারতেন।

সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুযায়ী সংবাদে আক্রান্ত ব্যক্তির বক্তব্য নেওয়া তো বাধ্যতামূলক। এক পত্রিকায় মোখলেস চৌধুরী মিন্টো রোডের লাল বাড়িতে শিরোনামে নিউজ ছেপেছিল। মন্ত্রী বা উপদেষ্টা হিসেবে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাড়িতে থাকা আমার কোন অপরাধ ছিল কিনা জানি না। আমি ওমরাহ হজ করে আসার কারণে মাথায় টুপি দিতে হয়েছিল। এই টুপি দেওয়ার ছবিও বিকৃত করে একটি পত্রিকা ছেপেছিল। মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা বিভিন্ন আবেদন সুপারিশ করেন। এমন একট বই সরবরাহের আবেদনে সুপারিশ করার কারণে ইচ্ছামতো লেখা হয়েছে। এডিসি ইউএনওরা জবাব দিয়ে বলেছেন, উপদেষ্টা এ ধরনের সুপারিশ করতে পারেন। তবে কোন হস্তক্ষেপ করেননি এবং দরখাস্তে কাজও হয়নি। আরেকট দরখাস্তে সুপারিশ করার জন্য অনেক তদন্ত হয়েছে। Honesty is the best policy, এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরনে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন ইত্যাদি বাণী ছোটোবেলা থেকেই আমাকে ওই ভাবে গড়ে উঠতে ভূমিকা রেখেছে। টাকা পয়সার প্রতি আমার কখনোই কোন লোভ ছিল না। Simple living and light thinking এই নীতিমালা আমাকে জীবনের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। জীবনের একটি বড় অংশ ইতোমধ্য কাটিয়ে দিয়েছ। তবে আমার সততা নিয়ে শত্রুরাও প্রশ্ন করতে পারবে না।

অনেক তদন্ত হওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। আমি কেমন সংশ্লিষ্টদের তা জানা দরকার। আমি শত্রুরও ক্ষতি করি না। কেবল বিশ্বাস করি, পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল নিহিত রেখেছেন- যা আল্লাহই জানেন, আমরা জানি না। সব সময় মাটির সঙ্গে মিশে চলার চেষ্টা করেছি। মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়ে কাজ করছ। সাংবাদিকতার নীতিমালার অনুযায়ী No rumour will be news এ কথাটি

সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হিংসা-প্রতিহিংসা, মানুষের ক্ষতি করা, কাউকে cut to size করা সাংবাদিকতার ধর্ম নয়। Journtlism এর পরিবর্তে অনেকে Sensationalism করেন। Black-mail করেন। এতে সাংবাদিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দেশ ও জাতির স্বার্থে Responsible Jaurnalism অত্যন্ত জরুরি।

সাবেক রাষ্ট্রপতি, উপদেষ্টা

প্রকাশকাল : মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০

শীর্ষ খবর ডটকম

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে

শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

শতাধিক মামলা মাথায় নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়েই দেখলাম, পুরো দেশটাই যেন এক বৃহৎ কারাগার। জেলে বন্দি রেখে আর রিমান্ডে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে আমাকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মাসের পর মাস বিনা চিকিৎসায় স্যাঁতসেঁতে ও আলো বাতাসহীন কারা প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয় আমাকে। সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে অনেকগুলো নতুন ব্যাধি শরীরে বাসা বেঁধেছে। বন্দি অবস্থায় প্রায় দিনই হাজিরার জন্য নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী কারাগার থেকে জজকোর্ট-সিএমএম কোর্টে আনা-নেয়া ছিল 'শাস্তি'র অন্য এক রূপ। উচ্চ আদালত থেকে সব মামলায় জামিন পেয়েও 'ওপরের হুকুমে' নির্জন কারাকক্ষে কাটাতে হয়েছে দিনের পর দিন। অতঃপর আবারো 'গায়েবি' মামলা জুড়ে দিয়ে প্রলম্বিত করা হয়েছে কারাভোগ। যখন মুক্তি পেলাম, তখন আমার কাঁধে ১২২টি মামলার বোঝা। সবগুলো মামলাই 'গায়েবি', নয়তো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাজানো। বেরিয়ে এসে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করিয়েও সুস্থতা ফিরে পাইনি। গত বছরের ৪ মে নরসিংদীর কারাগার থেকে বেরুনোর পর সপ্তাহের বেশির ভাগ দিনের উদয়াস্ত কাটাতে হচ্ছে আদালতের বারান্দায় অথবা আইনজীবীদের চেম্বারে। এত মামলায় লড়তে গিয়ে আমার আর্থিক কষ্ট বুঝে আইনজীবী ছোটো ভাই টাকা নিতে চান না। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে আপনার চলবে কী করে? তিনি আর্থিক সমস্যার বাইরে

আরেকটি ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা জানালেন : লাখ লাখ বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে; একেক জনের বিরুদ্ধে একাধিক তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে শতাধিকও। নেতারা পরিচিত; মামলায় নিয়মিত হাজির না হলে তাদের জামিন বাতিল হবে এবং বড় ধরনের সমস্যায় পড়বেন- এ কারণে তারা নিয়মিতই মামলায় হাজির হন। সমস্যাটা হয় কর্মীদের নিয়ে। বেশির ভাগ কর্মী আদালতে হাজির হন না। অনেকের বাড়ি থেকে আদালতে আসার টাকাও নেই। কেউ কেউ বাড়িতে থাকার সুযোগ হারিয়েছেন অনেক আগেই; থাকেন পালিয়ে, লুকিয়ে, এখানে-সেখানে। গরহাজির এই কর্মীদের কারণে বিপদে পড়েন তাদের আইনজীবীরা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আদালতের কাছে নিয়মিত জবাবদিহি করার ভয়ে পারলে এই আইনজীবীরা এখনই পালিয়ে যান। কাজেই, প্রিয় তৃণমূল কর্মীদের কাছে সবিনয় অনুরোধ, একটু কষ্ট হলেও আপনাদের আইনজীবীদের দিকে তাকিয়ে, মামলার হাজিরাগুলো নিয়মিত দেবেন। দীর্ঘদিন গণতন্ত্রহীন কর্তৃত্ববাদের চর্চা ও শাসনের ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে; কেউ কাউকে মানতে চায় না, সবাই স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি অপশাসনের কুফলের কারণে সামষ্টিক শুভ চিন্তার পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুফল পাওয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনীতি করা ব্যক্তিরা সমাজের বাইরের কেউ নয়। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের এই ক্ষতিকর প্রভাব তাদের কারো কারো মধ্যেও পড়তে থাকে। এমন চিন্তা কাজ করে যে, অন্যরা আন্দোলন করুক, আমি সুফল ভোগ করব। সরকার নিজেও কূটকৌশলে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, 'তুমি আন্দোলন করে কী পাবে? প্রধানমন্ত্রী তো হবেন আরেকজন; 'তুমি' মিছিলে গেলে কিসের লাভ? নেতা হবেন আরেকজন'। এই অশুভ চিন্তাগুলো থেকে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সতর্কভাবে মুক্ত থাকতে হবে। দেখা যায় জনসমাগম অনেক বেশি হলে বাধাদানকারী শক্তি বাধ্য হয় পিছু হটতে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত সমাবেশ এবং গণমিছিল-এর উদাহরণ। মানবসভ্যতা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই অনেক প্রাণী পৃথিবীতে বসবাস করছে; যেমন- তেলাপোকা। এই ছোট্ট পতঙ্গটি থেকে শুরু করে আরো অনেক প্রাণী বিগত শত শত বছরেও তাদের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে পারেনি, কোনো সভ্যতা তৈরি করতে পারেনি, কিন্তু মানুষ পেরেছে। কারণ মানুষ কেবল নিজের জন্য বাঁচে না, সে তার পরিবারের জন্য বাঁচে, সমাজের জন্য বাঁচে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচে; সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে সে পরবর্তী প্রজন্মের জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্য নিয়মিত সংগ্রাম করে থাকে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই একটি

ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, ধৈর্য্যসহকারে এ লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। 'এই লড়াইয়ে আমার কী লাভ', এমন স্বার্থসর্বস্ব চিন্তা করা যাবে না। এমন চিন্তা করে না লড়ে জীবন না দিলে, আজ আমাদের জাতিকে বাংলা ভাষার পরিবর্তে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে হতো, আজো আমাদের থাকতে হতো পরাধীন। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য অগণিত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর ত্যাগ, লাখো শহিদের জীবন, গণমানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং একসাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও গণমানুষের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই স্বাধীনতা ও গণমানুষের অধিকার আজ বন্দিশালায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সব পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। আধিপত্যবাদসহ বিদেশী শক্তির সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রেখে ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পদদলিত করে সব কিছু লুটেপুটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিএনপিসহ বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম-হত্যা এবং নির্যাতনের মধ্যেও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সরকারের নানামুখী নির্যাতনের মধ্যেই লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। সামনে আরো জোর লড়াই অপেক্ষা করছে। রাজনীতি সচেতন সমাজ বিশ্লেষকরা দৃঢ়ভাবে বলছেন, আগামী দিনের লড়াইয়েও সাধারণ মানুষ দলে দলে অংশ নেবে এবং রক্ত দিয়ে হলেও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। লক্ষ্য স্থির থাকলে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাড়না সৃষ্টি হয়। সেটাই মানুষকে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আওয়ামীলীগ পরিকল্পিতভাবে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ-অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দেশের সর্বত্র এক অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করেছে। এটা সবার জন্যই বিপজ্জনক। দেশবাসী এই অনিশ্চিত পরিবেশের অবসান চায়। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের দায়িত্ব হলো, বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির অবসানের জন্য লড়াইয়ের সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন এবং ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আগামীর লড়াইয়ে ক্ষমতাসীনদের করুণ পরিণতি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বিএনপির চ্যায়ারপার্সন
বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত সচিব

প্রকাশকাল : ৩ আগস্ট ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

তবুও কি আ.লীগ জিয়ার অবদান অস্বীকার করবে?

মারুফ কামাল খান

অন্ততপক্ষে গত দুই যুগ ধরে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মূল্যায়ন ও প্রচারণা মোটামুটি সকলেই জানে। একটা মানুষ অনেক আগে নিহত হয়েছেন কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বাক্যও তারা উচ্চারণ করেনি। শ্রদ্ধা জানানো দূরের কথা, এমন কোনো কুৎসা নেই যা তারা রটনা করতে বাদ রেখেছে। তাঁর শাসনামলের সমালোচনা শুধু নয়, স্বাধীনতা ঘোষণার কথাটাও স্বীকার করেনি। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বীরউত্তম খেতাব অর্জনকারী একজন সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান।

যুদ্ধ চলাকালেই গঠিত ব্রিগেড আকৃতির জেড ফোর্স-এর অধিনায়ক হিসেবে উন্নীত হন তিনি। অথচ সেই জিয়াউর রহমান আসলেই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কিনা আওয়ামী লীগের নাবালক নেতা-কর্মীরা পর্যন্ত বিলিয়ে বেড়ান সেই সন্দেহের সার্টিফিকেট। "জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানী চর, মন থেকে মুক্তিযুদ্ধ করেননি, স্বাধীনতার চেতনার তিনি বারোটা বাজিয়েছেন, সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাসের জন্য যাবার পথে পাবলিক জিয়াকে ধরে এনে তাকে দিয়ে রেডিওতে স্বাধীনতার কথা বলিয়ে নেয়"– এসব আওয়ামী বয়ান শুনতে শুনতে আমাদের কান পচে গেছে। অথচ জিয়া যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেননি, ক্ষমতায় আসেননি, দল করেননি তখন আওয়ামী লীগ কি এসব কথা বলেছে? যে আওয়ামী লীগ কখনো পারতপক্ষে অন্য কারো

কৃতিত্ব স্বীকার করেনা সেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম বেতার ভাষণে বলেছিলেন: "চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়েউঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী ও বীর চট্টলের ভাইবোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্টালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে।

এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম আজও শত্রুর কবলমুক্ত রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।" মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই জিয়াউর রহমানের বীরত্ব, সাফল্য ও কৃতিত্বের ব্যাপারে যুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অমোচনীড রেকর্ড। অথচ সেই দলেরই কিছু অর্বাচীন এখন কী বলে বেড়াচ্ছে! আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকার ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধের সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিবরণ নাকি এই অর্বাচীনদের প্রচারণাকে দেশবাসী, বিশ্ব ও ইতিহাস গ্রহন করবে?সেই একই ভাষণে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন। বলেন: "এই প্রাথমিক বিজয়ের সাথে সাথে মেজর জিয়াউর রহমান একটি পরিচালনা কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে আপনারা শুনতে পান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর। এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।" বুঝেন তাহলে। কালুরঘাটের বেতার তরঙ্গ মারফত জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠে দেওয়া ঘোষণাকে সেই সময়েই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলছেন: 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর।' এর অর্থ খুব পরিষ্কার। এই ঘোষণার আগে আর কোনো কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হয়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা, এটাই প্রথম। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থেকে সারা দুনিয়ার সামনে দেওয়া বেতার ভাষণে তিনি কি নিশ্চিত না হয়ে এই কথা এতো স্পষ্ট করে বলেছিলেন?কেবল তাই নয়, জিয়াউর রহমান নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিবাহিনীর সাময়িক প্রধান হিসেবে উল্লেখ করে সরকার গঠনের যে ঘোষণা দেন, জনাব তাজউদ্দীন সে ঘোষণাও তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে অনুমোদন করেন। তার সে অনুমোদন স্পষ্ট হয়, "এখানেই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়"-এই বাক্যটির মাধ্যমে। আর এতেই স্বাধীনতার ঘোষণাকাল থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ধারাবাহিকতা পায়।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজউদ্দীনের প্রথম বেতার ভাষণের আগে মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের বৈঠক হয় তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু সেই বৈঠকে এম এ জি ওসমানীকে প্রধান করে মুক্তিবাহিনীর কমান্ড স্ট্রাকচার গঠিত হলে মুক্তিবাহিনী প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানের সাময়িক দায়িত্বের অবসান ঘটে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে অবসান ঘটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে জিয়াউর রহমানের প্রতিকী দায়িত্ব পালনের। এসব তথ্য আওয়ামী লীগ কখনো নিজে থেকে বলা দূরে থাক, কেউ বললেও তা নানা রকম ধানাই পানাই করে অস্বীকার করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দলীয় স্বীকৃতির আরেকটি রেকর্ড ইতিহাসে রয়ে গেছে। তখন প্রেক্ষাপট ভিন্ন। দেশ স্বাধীন হয়েছে।

অপ্রতিরোধ্য মর্যাদায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে বিজয়ীর বেশে ফিরে এসে সদ্যস্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শাসনভার হাতে নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সরকারের নেতা তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে অর্থমন্ত্রী হয়ে এককোনায় সরতে হয়েছে। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও শেখ সাহেব মুক্তিযুদ্ধে নিজের অনুপস্থিতির কারণে যুদ্ধকালীন ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। উনার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে ব্যক্তি তাজউদ্দীন এবং আরো অনেক কিছুকেই তিনি খুব সহজ করে নিতে পারেন না। তাঁকে খুশি রাখতে তখন ঐসব প্রসঙ্গে সকলকেই খুব মেপে কথা বলতে হয়।এরকম একটা পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার পরপর ১৯৭২ সালের ৭-৮ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয় শেখ সাহেবের সভাপতিত্বে। সেই কাউন্সিলে সকলের সম্মতিতে পাস হওয়া সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে আছে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কয়েকটি কথা। তাতে বলা হয়েছে : "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামেরত মেজর জিয়াউর রহমান বেতার মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং বাংলাদেশে গণহত্যা রোধ করতে সারা পৃথিবীর সাহায্য কামনা করেন।" স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতা ঘোষণার মোটামুটি একক কৃতিত্ব দেওয়া হলেও স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ বিষয়টাকে একটু মডিফাই করে। এটাকে একেবারে মিথ্যাও বলা যাবেনা।

নিজের নামে স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা কয়েকবার দেওয়ার পর আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা হিসেবে

শেখ সাহেবের নাম তাতে যুক্ত করেছিলেন জিয়াউর রহমান। কেননা জাতির ঘোর সংকটকালে তাঁর নিজের কৃতিত্ব নেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। শেখ সাহেব তখন এই অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা। ঘোষনাটি তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া হলে এর গ্রহনযোগ্যতা আরো বাড়ে। এই যুক্তি ও পরামর্শ শোনার পর তিনি সেটা করতে মোটেও দ্বিধা বা বিলম্ব করেননি।যাই হোক, শেখ সাহেব নিজে এবং তাজউদ্দীন সহ প্রবাসী সরকারের সব নেতার সম্মতিতে পাস হওয়া রিপোর্টে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের এটাই একমাত্র অফিসিয়াল পজিশন এবং এটা ইতিহাসের রেকর্ড। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ অয়্যারলেস, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার বা এর ওর মারফত বার্তা পাঠানোর যে-সব গল্প চালু করেছে সেগুলোর কোনোটি কিংবা অন্য কোনো ভাবে অন্য কারো স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো ভাষ্য আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ওই রিপোর্টে নেই। ওই ঘোষণায় জিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা রোধে সারা পৃথিবীর সাহায্য চেয়েছেন বলেও স্বীকার করা হয়েছে। জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠে প্রচারিত ঘোষণাটিকেই আওয়ামী লীগ তাদের ভাষায় 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা' বলে উল্লেখ করে এবং রিপোর্টের পরবর্তী বাক্যেই বলা হয়, "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা জানতে পেরে বাংলার মানুষ এক দুর্জয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললো। সারা বাংলাদেশে সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক কর্মীরা অপূর্ব দক্ষতা, অপরিসীম সাহসিকতা ও অতুলনীয় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অগ্রসর হন।

"কী বুঝলেন? আওয়ামী লীগের সেই ঐতিহাসিক দলিলই বুঝিয়ে দিচ্ছে, আগে কিংবা পরে নয়, অন্য কোনো ভাবেও নয়, জিয়ার কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষনা। মুজিবের নামাঙ্কিত জিয়ার সেই ঘোষণাই স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি। এই ডাকের ফলেই স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়।তবুও কি আওয়ামী বন্ধুরা জিয়ার অবদান অস্বীকার করবেন? জিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার পর আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁকে তুচ্ছ বা খাটো করার জন্য কত রকমের কেচ্ছা-কাহিনীর যে জন্ম দিচ্ছেন তার ইয়ত্তা এই। নিত্য নতুন সেসব গল্প বলা ফুরায় না। কিন্তু তারা ভুলে যান ইতিহাস তাদের কৃপার ভিখারি নয়। তাদের দেওয়া সার্টিফিকেটের জন্য ইতিহাস বসে থাকবে না। জাতীয় জীবনে যখন কোনো বড় কোনো ঘটনা ঘটে যায় তখন বিভিন্ন ব্যক্তি তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কারো ভূমিকা থাকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে, আবার কারো বিপক্ষে। ঘটনার বিকৃত বয়ান দেওয়া যায়, কিন্তু ঘড়রি কাঁটাকে পেছনে ঘুরিয়ে সে ঘটনাকে বদলানো যায় না। কুৎসা রটানো যায়, কিন্তু টাইম

মেশিনে চড়ে পেছনে ফিরে গিয়ে পাল্টানো যায় না কারো ভূমিকাকেও। জীবনকালে ইতিহাস-নির্ধারিত ভূমিকা পালনের কারণে নন্দিত হয়ে জিয়াউর রহমান মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়ে যবনিকার আড়ালে চলে গেছেন। তাঁর সব কর্ম, ভূমিকা ও অবদান এখন ইতিহাসের সম্পত্তি। এগুলো বদলে ফেলার সাধ্য কারো নেই এবং কারুর স্বীকৃতি, বিকৃতি বা অস্বীকৃতির তোয়াক্কাও করেনা।

সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক
বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার
সাবেক প্রেস সচিব
প্রকাশকাল : ১৮ জানুয়ারি ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম

আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া

শওকত মাহমুদ

কোনও ইতিহাস স্বত্বের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান সত্য নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। (রবীন্দ্রনাথ)

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন সত্যটি আঘাত-সংঘাতে পূর্ণ হয়ে উঠছে? ফ্যাসিবাদের চলমানতা, না গণতন্ত্রের পুনরুন্মেষ? জালিমের রোষাগ্নি, না মজলুমের উত্থান? কোনটা চলবে আর কোনটা ঘটবে? মনে হতে পারে, দেহে-মনে ফ্যাসিবাদ মেখে বসে আছে যে স্বৈরাচার, তার বুঝি অবসান নেই। বিধ্বস্ত গণতন্ত্রের ভাগাড়ে বাংলাদেশ যেন পচতেই থাকবে। এক নেতার এক কন্যার মালিকানার যে গড়াপেটা ইতিহাস, তা বজ্র এমন এক দ্ব্যর্থ উপসংহারে একমত যে যত গর্জে তত বর্ষে না। বজ্রপাত সাময়িক। তা দেখে জনমত ঠাহর করা ভুল। প্রকৃত জনমত হচ্ছে ভোরের শিশিরের মতো, নীরবে-নিঃশব্দে প্রতি বর্গইঞ্চি মাটি ও তৃণমূলকে ছেয়ে ফেলে। সত্যের উপলব্ধি সেখানেই। ইতিহাসের চালচলন নিয়ত সত্যাভিমুখী। জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, ৭ নভেম্বরের জাতীয় বিপ্লবে সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উচ্চ নিনাদ, এক বলিষ্ঠ ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে শহীদ জিয়ার সুকীর্তির সম্ভার এবং দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার তা বিকশিত করার সফল অভিযাত্রাসর্বোপরি স্বৈরাচারবিরোধী আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক নতুন বিএনপি নির্মাণ ইতিহাসেরই এক সোনালি অধ্যায়। এই সত্যকে উপড়ে ফেলার দেশীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিহাসের নির্দেশ হচ্ছে, অন্যায়-অনিয়ম ও পরনিন্দা আর খুনাখুনির মধ্য দিয়ে জালিম সরকারের যে প্রলম্বিত অবৈধ শাসন, তার ইতি আসন্ন। দিন বদলাবেই এবং তা হবে ইতিহাসের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র খালেদা জিয়ার হাত ধরেই। এই সত্যটাই সুবহে সাদিকের মতো দৃশ্যমান। কেন এবং কিভাবে? পতনের গল্পটা কোত্থেকে উঠবে? এর আখ্যান-ব্যাখ্যানই বা কী? মিথ্যা মামলায় খালেদা জিয়াকে দণ্ড দেওয়া থেকে? নাকি সিটি করপোরেশনগুলোর নির্বাচন থেকে? ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ক্রান্তিলগ্নে এখন বাংলাদেশ। এর প্রতিটি জনপদই গণতন্ত্রের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায়, সভ্যতা ও আইনের শাসনের অসহনীয় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠেছে এবং সেই গণবিস্ফোরণ ঘটবে বেগম জিয়ার ঈমানি নেতৃত্বে এবং জিয়াসন্তান অসম্ভব জনপ্রিয় তরুণ নেতা আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের সেনাপতিত্বে। এই সত্যটাই আঘাতে-সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। সহ্যের অতীত রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত নিপীড়নের কঠিন ঝঞ্ঝায় শুধু প্রত্যয়-নিষ্ঠার ওপর ভর করে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য, সভ্যতার এক নতুন জাগরণের জন্য বেগম জিয়া সর্বাত্মক বিজয় ছিনিয়ে আনবেনই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একমাত্র বেগম জিয়ারই সক্ষমতা আছে এবং তা দুইবার করে ইতিপূর্বে তিনি দেখিয়েছেনও।

ইতিহাসের এই আলোকিত সত্যকে কে অস্বীকার করবেন যে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা নিয়ে বিরাজমান। সবচেয়ে বেশি আসনে নির্বাচিত হওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর অকুণ্ঠ জনসমর্থন আর সুতীব্র সহানুভূতি তাঁকে ঘিরে আছেই। রাস্তায় নামলেই লাখো মানুষের ঢল। তরুণরা তাঁর গাড়ি ঘিরে রাখে লৌহবেষ্টনীর মতো। রাজনীতির শুরুই হয়েছে এরশাদের স্বৈরশাসনকে মানি না এই বজ্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ এবং স্বৈরাচারী এরশাদের অশুভ আঁতাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নৈরাজ্য-নীতিহীনতার ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে। তা থেকে বাঁচানোর একমাত্র উজ্জ্বল বাতিঘর খালেদা জিয়া। বুকভরা সাহসে লড়াইটা জনগণের পক্ষে একাই করেন। নব্বইয়ে তিন জোটের রূপরেখা থেকে আজ পর্যন্ত সেই সৎ, নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি তিনি ধরে রেখেছেন। কেউ বলতে পারবেন না, তিনি বাংলাদেশের কোনো অবৈধ শাসনকে আই অ্যাম নট আনহ্যাপি অথবা আমার আন্দোলনের ফসল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরশাদ এবং মঈনউদ্দীন-ফখরুদ্দীনের স্বৈরতন্ত্রকে বেগম জিয়া অনমনীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদায় করেছেন। বর্তমান দুনিয়ায় এমন কোনো রাজনৈতিক নেতার কৃতিত্ব আছে দুটি সামরিক শাসন হটানোর? ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রকে খুন করেছিল। বেগম জিয়া তা ফিরিয়ে আনলেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা অনিবার্য প্রধানমন্ত্রী এমন ধারণায় ইতিহাসকে যখন সাব্যস্ত করা হচ্ছিল, অলক্ষ্যেই সেই শিশিরভেজা সত্যটি দৃশ্যমান হলো। নাহ! আন্দোলনের সাচ্চা নেত্রী বেগম জিয়াই প্রধানমন্ত্রী, তাঁর হাতে গড়া নতুন বিএনপিই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। বেগম জিয়ার গণতন্ত্রবোধ পরিমাপে একটি দৃষ্টান্ত অবশ্য উল্লেখ্য। ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচন হওয়ার বিধান ছিল ওয়ার্ড কমিশনারদের ভোটে। এতে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী জেতে। কিন্তু তিনি মেয়র পদকে জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার বিধান করলেন। আর সংবিধানের প্রতি আনুগত্য? তিন জোটের রূপরেখা অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার যুগপৎ আন্দোলন ছিল নব্বইয়ের দশকে একটি অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সংসদ থেকে আগেই পদত্যাগ করে ওই সব দল বেগম জিয়াকে এই বিপদে ফেলতে চেয়েছিল যে তিনি ঐকমত্যের ভিত্তিতে যেন সংসদে এসংক্রান্ত বিল পাস করাতে না পারেন। তিনি যেন কোনো সংবিধানসম্মত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না পারেন। পর্দার অন্তরালে ওই অশুভ আঁতাত সামরিক অভ্যুত্থানের প্ররোচনাই দিচ্ছিল। এটা হতো বেগম জিয়ার সারা জীবনের জন্য কলঙ্ক। কিন্তু বেগম জিয়া শুধু সংবিধান সংশোধনের নিমিত্তে ১৯৯৬-তে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন দিলেন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এই চক্রান্ত নস্যাৎ করলেন। জেনারেল নাসিমের ক্যু হয়েও হতে পারল না। রাজনীতির নীতিনৈতিকতা খালেদা জিয়া জীবনজুড়ে মেনে চলেছেন। কোনো দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনে যাননি। ১৯৮৬, ১৯৮৮, ২০১৪ তার উদাহরণ। এবারের লড়াই তাঁর চূড়ান্ত লড়াই। হাসিনা সরকারের অধীনে ভোট নয়। আজ প্রমাণ হয়েছে, ২০১৪-তে ভোটে না গিয়ে তিনি কত বড় প্রজ্ঞা ও নৈতিক ধারাবাহিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গোটা বিশ্ব আজ একমত, বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে। শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন মানে ৩০০ আসনে স্বদলীয় প্রার্থীর অর্ধেকের বেশি বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়া।

শুধুই কি গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য খালেদা জিয়া চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন? তাঁর দেশ পরিচালনাকালে আইনের শাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বত্র প্রশংসিত। ঢাকা থেকে সব মহাসড়ক দিয়ে বাইরে গেলে দুই পাশে আজ যে শুধু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পস্থাপনার সম্ভার, তা তাঁর আমলেই। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপকতার দরুন দশ গ্রাম মিলে সাপ্তাহিক হাটের বদলে প্রত্যেক গ্রামে আজ বাজার বসে, টাকা দিয়ে লেনদেন হয়। নারীরা ক্ষুদ্রঋণে স্বাবলম্বীএটা তাঁর সাফল্য। খাদ্যে, মাছে স্বয়ম্ভরতা, নারীশিক্ষার বিপ্লব, রপ্তানির সমৃদ্ধি, সবচেয়ে

বড় কথা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭০ হাজার কোটি টাকার মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৬.৭-এ পৌঁছার অবিশ্বাস্য কাহিনির নির্মাতা বেগম জিয়াই। আজকের স্বৈরাচারের মতো গণতন্ত্র হত্যা করে উন্নয়নের যজ্ঞে তিনি মাতেননি। এই উন্নয়ন হচ্ছে দুর্নীতিতাড়িত। খালেদা জিয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন করেছেন। লোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের ভাষায় যা হচ্ছে freedom oriented development বা অধিকারভিত্তিক সমৃদ্ধি।

প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রীযে পদেই থাকুন বা না থাকুন, বেগম জিয়া রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বদাই। তাঁর গণতান্ত্রিক ঔদার্যকে উপহাস করা হোক, তাঁকে নিয়ে গিবত, কটুকাটব্য যতই বর্ষিত হোক, তাঁকে ঘরছাড়া করা হোক বা বাড়ি ও অফিসে অন্তরিন রাখা হোক, তাঁর ওপর মরিচের গুঁড়া স্প্রে করা হোক, তাঁর গাড়িতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা করুক, তাঁর পথের দুপাশে উদ্বেলিত জনতাকে পুলিশ পেটাতে থাকুক, বেগম জিয়া আছেন অবিচল। মামলার তারিখ যত দ্রুতই দেওয়া হোক, তিনি হাসিমুখে আদালতে যান, ঠায় বসে থাকেন। তাঁকে জনসভা করতে দেওয়া হয় না, সংবাদ সম্মেলন সরাসরি সম্প্রচার করতে বাধা দেওয়া হয়। কেননা তাঁর কথায় মানুষ উদ্বোধিত হয়।

বিশেষ করে ২০০৭ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কেটেছে বাংলাদেশ ও তার গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায়। সাধারণ মানুষ, দলের নেতাকর্মীর জন্য তাঁর সহানুভূতি ফুরায় না। অপার তাঁর নিজস্ব মনোবেদনা। পারিবারিকভাবে নিঃসঙ্গ। এক-এগারোর সময় জেলে ছিলেন, মৃত্যুশয্যায় মাকে দেখতে পারেননি। দুই ছেলেকে জেলে নির্যাতন করা হচ্ছে। তারেক রহমানকে মেরে ফেলতে চাইছিল এক-এগারোর বর্বরকুল। কী বিভীষিকার দিনগুলো ছিল তখন! রাজনীতি থেকে বিয়োগ করার জন্য কী চাপ, বিদেশে জোর করে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু বেগম জিয়া বেগম জিয়াই। দেশ ছেড়ে, দেশের জনগণকে ছেড়ে তিনি বিদেশে গেলেনই না। তারেক রহমান মুক্তি পেয়ে যেদিন পিজি হাসপাতালে, কী অঝোর কান্নায় জড়িয়ে ধরে ছিলেন সন্তানকে! মানুষ দেশনেত্রীর সেই কান্নায় কেঁদেছিল। আজ তারেক রহমান মিথ্যা মামলায় মামলায় দুর্বিষহ অবস্থায় বিদেশে। দুর্নীতির খলনায়ক বানানোর হাজারো অপচেষ্টা বিফলে গেছে। তিনি দেশে আসতে পারেন না। আরাফাত রহমান কোকো ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু লাশ হয়ে। সরকারের নির্যাতনে কষ্টে কষ্টে ওই প্রাণবন্ত তরুণটি মরে গেল। জানাজার নামাজে লাখ লাখ মুসল্লি অশ্রুভেজা চোখে তাতে অংশ নিল। ২০০৮-এর নির্বাচনের সময় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের একাংশে খালেদা জিয়া বলেছিলেন, মানুষ হিসেবে আমি ভুল-ত্রুটির

ঊর্ধ্বে ছিলাম না। ব্যর্থতার গ্লানিও আমাকে অনেক সময় স্পর্শ করেছে; কিন্তু যে সীমাহীন কুৎসা এবং অপপ্রচারের শিকার আমাকে হতে হচ্ছে, সেটা কি আমার প্রাপ্য? আপনারা দেখেছেন, অপপ্রচারের পথ ধরেই আমাকে আপনাদের কাছ থেকে মাইনাস করার, বিদেশে নির্বাসনে পাঠানোর অপচেষ্টা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমাকে বিনা অপরাধে ছয় মাস গৃহবন্দি ও এক বছর নির্জন কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে, আমি আমার মায়ের মৃত্যুর সময়ও তাঁর পাশে থাকতে পারিনি। গুরুতর অসুস্থ সন্তানদেরও দেখতে দেওয়া হয়নি। তারপরও যত দিন বাঁচি, আপনাদের মাঝেই থাকব। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশই আমার একমাত্র ও শেষ ঠিকানা।

অবাক করার বিষয় হচ্ছে, ক্রসফায়ারে নিহত ও গুমে নিখোঁজ স্বজনরা এবং নানা নির্যাতনে ক্লিষ্ট মানুষরা যখন বেগম জিয়ার সান্নিধ্যে যান, তখন তিনি এমনভাবে সান্ত্বনা দেন, যেন তাঁর কোনো নিজস্ব বেদনা নেই। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে যান এই মহিলার অসম্ভব মনের জোর দেখে। জীবনভর সংগ্রামই করে চলেছেন, তবু মাথা নোয়াবার নয়। মহান স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রী, হানাদার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী ও যুদ্ধ সূচনাকারীর সহধর্মিণী হিসেবে পরিবারসহ বন্দি ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধানের স্ত্রী হিসেবে সংসারে নিভৃতে ছিলেন। জিয়া যেমনিভাবে দরখাস্ত করে ক্ষমতার মঞ্চে আসেননি, তেমনি খালেদা জিয়াও বিএনপির চেয়ারপারসন স্বেচ্ছায় হননি। দল ও জনগণের অনুরোধে ওই দায়িত্ব নিয়ে কী সংগ্রামী জীবনকেই না যাপন করছেন! সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত তাঁর প্রতি আছে। নইলে এমন রাজনৈতিক নেতা কে আছেন, যাঁর প্রতি নির্যাতনের কুঠারাঘাত প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয়। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে বিএনপি আজ সুবিশাল দল।

বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুছে দিতে কতই না হিংস্র প্রয়াস চলছে! কিন্তু রাজনীতি করার, দেশটাকে বাঁচানোর, জাতিকে গণতন্ত্র দেওয়ার ইচ্ছাটা কখনো তাঁর মনে মরেনি, মরবেও না। ৩৫ বছরের রাজনীতিতে তিন নম্বর স্বৈরশাসনকে গণজাগরণের মধ্য দিয়ে বিদায় দিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প। তাঁর চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

বেগম জিয়ার মতো অসামান্য রাজনৈতিক নেত্রীর পক্ষেই মানুষকে এমন সভ্য স্বপ্ন দেখানো সম্ভব, যখন তিনি বলেন, শরতের আকাশে সাতটি রঙের বিচিত্র প্রভাব নিয়ে রংধনু যেভাবে মনোরম সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটায়, আমরা চাই সকল মত ও পথকে নিয়ে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি লালন ও পরিপুষ্ট করতে, যে সংস্কৃতি বাংলাদেশকে একটি রংধনু জাতিতে (rainbow nation) পরিণত করবে। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে ও

ভবিষ্যতমুখী এক নতুন ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিএনপি। এ জন্য নতুন এক সামাজিক চুক্তিতে পৌঁছতে বিএনপি সচেষ্ট হবে (ভিশন-২০৩০)। সেদিন দূরে নয়, মেগাদুর্নীতি, লোমহর্ষক গুম-খুন, অবিশ্বাস্য ভোট চুরি ও লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনাগুলো উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। বেগম জিয়ার ধৈর্যে আমরাও ধৈর্যশীল। ফারসি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, দের আয়েদ দুরস্ত আয়েদ। যা দেরিতে আসে, সাজানো-গোছানোই আসে। এক দশকের অন্ধকারের সমাপ্তি বেগম জিয়ার হাতেই।

সাংবাদিক, ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি

প্রকাশকাল : রবিবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২১

শীর্ষখবর ডটকম

তারেক রহমান সম্পর্কে যা শুনেছি শুনছি এবং যেরকম দেখেছি

মিনার রশিদ

নব্বই সালের মাঝামাঝি সময়। প্রফেসর গোলাম আজমকে নিজের চর্ম চোখে দেখার একটা উদগ্র বাসনা মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয় আমাদের মিডিয়া। তখন তাঁর সাদা কালো ছবি দেখেছি মাত্র। কপালে চাঁদ-তারা খচিত ব্যাজ, আর ভয়াবহ ড্রাকুলা মুখে দাঁড়ি ও মাথায় টুপি দিয়ে আঁকা তাঁর কার্টুন দেখতাম নিত্যদিন। কাজেই আসল চেহারাটি দেখার মানসে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে নব্বই সালের মাঝামাঝি সময়ে মগবাজার মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যাই। তাঁকে প্রথম দেখে সত্যি সত্যি একটা ধাক্কা খাই। তখন ঐ মসজিদটি খুবই ছোটো ছিল। দরজার সামনে থেকে ঈমামের খুতবার জায়গা মাত্র কয়েক মিটার। অনেকটা বেয়াক্কেলের মতো দরজার সামনে দাড়িয়ে খুতবা পাঠরত গোলাম আজম সাবকে দেখতে থাকি। সত্যি বলতে এত শ্বেতশুভ্র চেহারা আমি এর আগে কখনোই দেখি নাই। আমাকে এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে উনিও আমার দিকে তাকালেন, আমার মতলব বুঝতে চেষ্টা করলেন। তখন আমার খেয়াল হলো, উথাল পাতাল মন নিয়েই ভেতরে গিয়ে বসে পড়ি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব চেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তির মধ্যে একজন গোলাম আজম হলে অন্যজন নিঃসন্দেহে তারেক রহমান। এক সময়ে প্রফেসর আজম সম্পর্কে দুয়েকটা প্রশংসা সূচক বাক্য বলা এদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক

বলয়ে খুবই দুরূহ কাজ বলে গণ্য হত। কেউ নিজের বিরাট সর্বনাশ করতে না চাইলে এমন বোকামি কেউ করতেন না। এখন তারেক রহমান সম্পর্কে অনেকটা কাছাকাছি ফ্যানোমেনা শুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় তার চেয়েও অনেক বেশি! নিজের দলের নেতারাই এব্যাপার মুখ খুলতে ভয় পান। সরকার পক্ষ দিনে কয়েকবার বেগম খালেদা জিয়ার ও তারেক রহমানের সাজার কথা বলেন। কিন্তু তারেক রহমানকে বেকসুর খালাস দিয়ে জাজ মোতাহার হোসেনকে যে দেশ ছাড়তে হয়েছে, সেই কথাটি বিএনপি নেতারা বছরে একবারও উল্লেখ করেন না। যদিও বিএনপির জন্যে এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পয়েন্ট।

যে সুশীল গ্রুপটি প্রফেসর আজমকে নিয়ে ভয়াবহ কার্টুন আঁকত এরাই পরবর্তিতে তারেক রহমানের মোটা গর্দান ও ফোলা গালের কার্টুন ছাপাতে শুরু করে। উক্ত প্রপাগান্ডা বাজেটের নব্বই ভাগ খরচ করা হয় তারেক রহমানকে নিয়ে। যে পত্রিকাটি এবিষয়ে বেশি উৎসাহ দেখাত তারেক রহমানের দলের নেতা কর্মীদের ঘরে ঘরে সেই পত্রিকাটিরই বেশি দেখা মিলত, হয়তোবা এখনও তাই মিলে।

সবকিছু নিজের চোখে কিংবা নিজের অনুভবে পরখ করে নেওয়ার এই স্বভাবটি আমার মজ্জাগত। আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং পেশাগত জীবনেও আমি এই পলিসিটি অনুসরণ করি। আমার মা-বোন সম্পর্কে আমার স্ত্রীর বর্ণনা কিংবা আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কোনো মন্তব্যকেও একই ভাবে পরখ করে নেই। যাতে কারো সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির উপর অবিচার করে না বসি। এর ফলে আমার পরিবারে বড় কোনো জটিলতা দেখা দেয় নাই। পেশাগত জীবনেও অনেক মানুষের কাছ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভালো ব্যবহার-আচরণ পেয়েছি যা শুনে অন্যরা অবাক হয়। আমি কান দিয়ে যা শুনি, অন্য চার ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তা পরখ করে নেই।

২০১৬ সালের অক্টোবরে এই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়েই লন্ডনে যাই তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে। বিষয়টি আমি কখনোই পাবলিক করতে চাইনি। কারণ অনুসন্ধানটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, খরচ সম্পূর্ণ নিজের পকেট থেকে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ বিষয়ে কিছু না লিখলে কোথায়ও অবিচার করা হবে।

তাই আজ চার বছর পর সেই ঘটনাটি কিঞ্চিৎ লিখছি। তখনকার একটি ছবিও সংযুক্ত করলাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর আগে শোনা অনেক কিছুই মেলাতে পারি না। আমি এদেশের কেউকেটা কেউ নই। তারপরেও আমাকে যতটুকু সময় দিয়েছেন, আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছেন তাতে তাকে এতবড় দলের সেকেন্ডম্যান বলে মনে হয় নাই। আমি সেখানে থাকাবস্থায় দলের বেশ কয়জন সাধারণ নেতা কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তাদের সকলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেও এমন কিছু চোখে পড়ে নাই। কাজেই তারেক রহমান দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে যথাযথ সম্মান দেখান না, বিষয়টি আমার কাছে কিছুটা খটকা লাগে!

আমি চলে আসার দিন হোটেল থেকে নেমে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন! এমন একজন ব্যক্তি দলের সিনিয়র নেতাদের যথাযথ সম্মান দেখান না বিষয়টি আমার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে। এটা তার ইনবিল্ট ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। তবে যে দলে তিন'শ এমপি পদের জন্যে কমপক্ষে তিন হাজার শক্তিশালী প্রার্থী দাঁড়িয়ে যান- সেখানে সকলকে সন্তুষ্ট রাখা একজন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে কতটুকু কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। সোনার হরিণ হাতে পাওয়া এই তিন শ জন তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেও বাদবাকি ২৭০০ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। এই না পাওয়াদের হাওয়া বা বাতাস দেয় বিশেষ মিডিয়া! আদর্শ ব্যতিরেকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে এই আচরণ অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

আমার তিন দিন অবস্থানের অধিকাংশ সময় এসব বিষয় নিয়েই ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা করেছি। একটা নলেজ বেইজড পার্টি ও দেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি। আমি বলেছি আমার থিওরিটিকেল কথাবার্তা। জবাবে উনি বলেছেন উনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। সেগুলোর কিছু পাল্টা জবাব দিয়েছি। অনেকগুলির জবাব দিতে পারি নাই।

একুশে আগষ্ট নিয়েও খুচিয়ে খুচিয়ে প্রশ্ন করেছি। ক্ষমতা গ্রহণ করলে নেতা কর্মীদের এতদিনের ক্ষোভ কীভাবে সামাল দিবেন - এক পর্যায়ে সেটাও জানতে চেয়েছি। নির্বাসিত একজন নেতা যার শত শত নেতা কর্মী গুম হয়েছে, হাজার হাজার জেল খাটছে, লাখ লাখ নেতা কর্মীর মাথায় মামলা - সেই নেতার পক্ষে এমন প্রশ্নের জবাব দেওয়া সত্যিই কঠিন। উনার জবাব আমার মন:পুত না হলে পাল্টা প্রশ্ন করেছি। এই সব প্রশ্ন এবং পাল্টা প্রশ্নে আমার মনে কোনো ভয় জাগে নাই যে আমি একজন ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ আর্মির একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর তারেক রহমানকে বেশ কিছু নসিহত করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তারেক রহমান দলের বয়স্ক নেতাদের সম্মুখে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ভিডিওটি দেখে একটু খটকা খেলাম। বয়েস হিসাব করে দেখলাম উনি নিজেও তারেক রহমানের জুনিয়র হবেন। একজন সিনিয়রকে তিনি যে কিছিমে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন, সেটিও অনেক দৃষ্টিকটু ঠেকেছে।

আজকে যেখানে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তির ইস্পাত কঠিন ঐক্যের প্রয়োজন সেখানে এই ধরণের একা একা গোল দেওয়ার প্রবণতা কতটুকু যৌক্তিক তা ভেবে দেখার বিষয়। আমরা ফ্যাসিবাদি শক্তির সার্বিক শক্তি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল না থাকার কারণেই এরকম আচরণ করছি।

আমরা যেভাবে ফ্রি স্টাইলে একজন আরেকজনকে সমালোচনা করি, সবাই নিজেকে হিরো এবং অপরকে জিরো জ্ঞান করি তাতে এই ফ্যাসিবাদকে সরানো দুরূহ হয়ে পড়তে পারে।

আমরা এখন একমত যে একটি গণ জাগরণ ও গনঅভ্যুত্থান ছাড়া এই ফ্যাসিবাদের হাত থেকে সহজে মুক্তি মিলবে না। তজ্জন্যে সকল মহলের বোধ আর ভাবনায় পরিবর্তন জরুরি। বড় রাজনৈতিক দলকে যেমন তার বড়ত্বের অহমিকা ও নেতৃত্ব হারানোর ভয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তেমনি ছোটো খাট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও একা একা হিরো বনার বৃত্ত/ফ্যান্টাসি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একটা ফায়ার বা আগুনের জন্যে যেমন একটি স্পার্ক দরকার তেমনি সেই স্পার্ককে অক্সিজেন জোগানের জন্যে বাতাস দরকার। সেই বাতাসটি সরবরাহ করবে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি।

এমতাবস্থায় ব্যক্তি তারেক রহমানের একটা ভূমিকা এখনও গৌণ হয়ে পড়ে নি।

সেই আশাবাদ থেকে মি: রহমানকে তাঁর ৫৬তম জন্ম দিনে একটা শুভেচ্ছা জানালে খুব বেশি ক্ষতি হবে না।

প্রকাশকাল : ২২ নভেম্বর ২০২০
শীর্ষ খবর ডটকম
#

মুক্তিযুদ্ধ খেতাব বাতিলের রাজনীতি

ড. আসিফ নজরুল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের চার ধরনের খেতাব প্রদান করে। এর মধ্যে জীবিতদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব ছিল বীর উত্তম। এ খেতাবে ভূষিত মাত্র ৪৯ জন মুক্তিযোদ্ধার একজন ছিলেন প্রয়াত জিয়াউর রহমান। এর প্রায় ৪৮ বছর পরে শাজাহান খানের প্রস্তাবে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) ৯ ফেব্রুয়ারি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিয়াউর রহমানের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে শাজাহান খান জানান প্রথম আলোকে।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডে জড়িত চারজনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন খেতাব বাতিলের সুপারিশও করা হয় ৯ ফেব্রুয়ারির সভায়। বঙ্গবন্ধু হত্যায় এ চারজনের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত হয় বিভিন্ন প্রচারণার ভিত্তিতে, কোনো প্রমাণিত অপরাধের ভিত্তিতে নয়।

জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের এই সিদ্ধান্তে দেশে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। তিনি সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে গোটা জাতিকে উদ্দীপিত করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন। প্রশ্ন আসে, তাঁর

খেতাব ৪৮ বছর পর অপ্রমাণিত অভিযোগে বাতিল করা গেলে খেতাব বাতিলের কাজটি ভবিষ্যতে কত দূর যেতে পারে? জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলটির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর খেতাব বাতিল রাজনৈতিক কারণে কি না, এটি রাজনীতিতে তিক্ততাকে আরও উসকে দেবে কি না, সেটি নিয়েও আলোচনার অবকাশ আছে।

২

জামুকা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে একটি আইনে। এই আইনবলে এর অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন ও সনদ প্রদান এবং 'জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র' বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা। জামুকার বৈঠকে জিয়াউর রহমানের খেতাব জাল বা ভুয়া এটি বলা হয়নি।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে। শাজাহান খান বলেছেন, জিয়ার খেতাব বাতিল হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার মদদ দেওয়ার জন্য। জামুকার প্রধান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজ্জাম্মেল হকের বক্তব্য অনুসারে জিয়াউর রহমান সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী লোকজন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশত্যাগে সহায়তা করেছেন। আইনমন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নষ্ট করলে তাঁর কি খেতাব রাখার অধিকার আছে?

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ওঠা কিছু অভিযোগ তথ্যগতভাবে সঠিক নয়। যেমন তখনকার সামরিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসারে, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যখন হয়, তখন তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। তাঁদের বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটি হয় রক্তপাত এড়ানোর জন্য খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তাঁদের আপস আলোচনার অংশ হিসেবে (সূত্র: এসম্পর্কিত মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, লে. কর্নেল এম এ হামিদ ও মেজর হাফিজউদ্দিনের গ্রন্থ)। তবে পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে জিয়ার সহায়তা ছিল।

জিয়ার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু হত্যার মদদের অভিযোগ আওয়ামী লীগ প্রায়ই করে থাকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আমলে দায়েরকৃত ও বিচারকৃত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জিয়াকে আসামি করা হয়নি, এর রায়ে হত্যাকাণ্ডে জিয়ার সংশ্লিষ্টতার কথাও বলা হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড রোধে জিয়াসহ সেনাবাহিনীর তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের ব্যর্থতা ছিল। তবে এটি রোধের মূল

দায়িত্ব ছিল তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ ও ঢাকার ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার এবং রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের।

জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের একজন বেনিফিশিয়ারি ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের ৯ দিন পর জিয়াকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হয়, তবে তাঁর ওপর স্থান দেওয়া হয় আরও দুজন সামরিক কর্মকর্তাকে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় এবং মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে 'চিফ অব ডিফেন্স' স্টাফ নিয়োগ করা হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে এ প্রেক্ষাপটে জিয়ার খেতাব কেড়ে নেওয়া হলে, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর খেতাবও কেড়ে নেওয়ার যৌক্তিকতা তৈরি হয় কি না।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে তিন বাহিনীর প্রধানদের দুজন ছিলেন বীর উত্তম খেতাবধারী, তাঁরাও বঙ্গবন্ধুর খুনি সরকারের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। পরিস্থিতির চাপ ছিল, এ চাপ এড়ানোর জন্য পদত্যাগ করার সুযোগ তাঁদের ছিল। সেটি তাঁরা করতে পারেননি বলে তাঁদেরও কি খেতাব বাতিলের দাবি ওঠা সংগত? এ জাতিকে এভাবে কি প্রায় বীর উত্তম-শূন্য করে ফেলব আমরা? মুক্তিযুদ্ধের বীরদের এভাবে ছেঁটে ফেলা কি মুক্তিযুদ্ধেরই চরম অবমাননা হবে না?

৩

জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানের মূলনীতি বাতিল করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সংবিধান থেকে জিয়া ধর্মনিরপেক্ষতা মূলনীতিটি বাতিল করেছিলেন সত্য। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সংযোজন করা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আর এরশাদ প্রবর্তিত 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানে রেখেছে তো এখনকার আওয়ামী লীগ সরকারই। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতা?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে বৃহত্তর অর্থে ১৯৭২ সালের সংবিধানের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ১৯৭২ সালের সংবিধানের চরিত্রহরণ স্বাধীনতার পর প্রতিটি আমলেই হয়েছে (যেমন চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম)। এ দেশের উচ্চ আদালত ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ বলে রায় দিয়ে জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। এসব শাসনতান্ত্রিক বিতর্কের বিষয়। ভুয়া নির্বাচন, অবাধ দুর্নীতি, চরম দলীয়করণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী। এটি কারা কতটুকু করেছে তা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়। এসব বিতর্ক মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ খেতাব কেড়ে নেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সত্যি। তিনি কয়েকজন চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর সমালোচনা হতে পারে। বঙ্গবন্ধু নিজে দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালনকারী কয়েকজন পুলিশ আর গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে আমলাতন্ত্রে রেখে দিয়েছিলেন, তিনি ১৯৭১ সালে গণহত্যার অন্যতম নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ করে নিয়েও এসেছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, জিয়াউর রহমানের সমর্থকেরাও একই কথা বলে থাকেন। হতে পারে তাঁর সমর্থকেরা অসত্য বলছেন, হতে পারে জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। কিন্তু এসব বিতর্ক খেতাব কেড়ে নেওয়ার ভিত্তি হয় কী করে?

জিয়ার খেতাব কেড়ে নেওয়ার সমর্থনে সরকারপক্ষ থেকে নোবেল পুরস্কার আর ডক্টরেট প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। নোবেল প্রত্যাহারের কোনো তথ্য আমার জানা নেই। আর ডক্টরেট প্রত্যাহার হয়ে থাকে ডক্টরেট নকল এ মর্মে তদন্ত প্রমাণিত হলে। তার সঙ্গে একজন সেক্টর কমান্ডারের যুদ্ধে অর্জিত খেতাবের কীভাবে তুলনা হয়?

আমাদেরই মতো যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, জিম্বাবুয়েসহ অনেক দেশ। স্বাধীনতাযুদ্ধের শৌর্যে-বীর্যে অর্জিত খেতাব এসব কোনো দেশে পরবর্তী সময়ে শুধু কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে বাতিল করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৪

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিক্ততা আর ঘৃণার শেষ নেই। এসব তিক্ততা জারি থাকলে বা বাড়লে অনৈক্য আর হানাহানি বাড়ে, দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি কমে যায়, রাষ্ট্রসত্তা দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো কোনো মহলের জন্য তা লাভজনক হলেও দেশের জন্য তা চরম ক্ষতিকর।

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিলকে কি এমন কোনো হাতিয়ারে পরিণত করার চেষ্টা চলছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
আইন বিভাগের অধ্যাপক
প্রকাশকাল : শনিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শীর্ষখবর ডটকম

কৃষি-উন্নয়নে রণাঙ্গনের যুদ্ধা শহীদ জিয়ার অবদান

জামান সরকার মনির

জামান সরকারঃ শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম বাংলাদেশের এক ক্ষণজন্মা মহান ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে জিয়াউর রহমানের আর্বিভাব হয়েছিল হঠাৎ করেই ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় জাতির চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের আগমন ঘটে। এরপর রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধ প্রশাসনের নীতিনির্ধারণে অসামান্য অবদান রেখে শহিদ জিয়া আপামর জনমানসে স্থান করে নেন এক মহানায়কের আসনে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় বাগবাড়ি গ্রামে। তার বাবা মনসুর রহমান ছিলেন কলকাতায় একটি সরকারি দফতরের কেমিস্ট। ভারত ভাগ হওয়ার পর তিনি করাচি বদলি হয়ে গেলে জিয়াউর রহমান সেখানেই একাডেমি স্কুলে পড়াশোনা করেন।

করাচিতে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৯৫৩ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন একজন ক্যাডেট অফিসার হিসেবে। জিয়াউর রহমান ১৯৫৫ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা শাখাসহ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর আগে ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম সেনাবাহিনীর অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে সহঅধিনায়ক হিসেবে বদলি হন। তখনই জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

ওই সমটাতে সময় জিয়াউর রহমান দেশের ব্যাপারে খুব চিন্তিত থাকতেন। একপর্যায়ে তিনি বলতেন, নির্বাচনের পর পাকিস্তান থেকে নতুন সেনা দল আসছে, অস্ত্র আসছে। মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদস্যরা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেবে না বা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এতে আমাদের কী করণীয়?

এরপর একপর্যায়ে জিয়াউর রহমান বিদ্রোহের পরিকল্পনা করলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের ঘটনার পর অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা বিদ্রোহ করেন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে।

২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বর্বর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সমগ্র ঢাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, চট্টগ্রাম থেকে তখন একমাত্র শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা বিদ্রোহ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে ২৭ তারিখে জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৫ মার্চে মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে এ ঘোষণা দেন তিনি, যা তৎকালীন ইপিআরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

জিয়াউর রহমান প্রথমে সেক্টর কমান্ডার এবং পরে জেড ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে স্বাধীনতাযুদ্ধ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্ট অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হন এবং ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ পরিচালনা করেন। দেশের ইতিহাসে তার শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮১) এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্বল্প সময়ের শাসনামলে নানা সঙ্কটে বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে জিয়া ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, সময়োপযোগী গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব

রাজনীতিতে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অবস্থান ও গতিপথ নির্ধারণ এসব বহুমাত্রিক সাফল্যের কথা সুবিদিত এবং বহুল চর্চিতও। তবে আলোচ্য নিবন্ধের বিষয়বস্তু একটু ব্যতিক্রম। শহীদ জিয়া ছিলেন মাটি ও মানুষের নেতা। এ দেশের গরিব মেহনতি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ছিল তার অন্যতম জীবন সাধনা।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ও উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি বললে অত্যুক্তি হয় না। এখনো এ দেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের অধিকাংশ উপাদান আসে কৃষি থেকে। আমাদের খাদ্যের একমাত্র উৎসও কৃষি। এ কৃষিকাজের সাথে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। তবে এ কৃষি ও এর রূপকার কৃষক সব সময় এ দেশের রাষ্ট্র পরিচালকদের যথাযথ মনোযোগ পেয়েছেন বা পাচ্ছেন এমনটি নিশ্চিত করে বলার অবকাশ নেই।

জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতাসীন হন তখনো এ কৃষি খাত ও কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। এ অবস্থায় একজন মানবদরদি ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে জিয়াউর রহমান নানা ধরনের পদক্ষেপ নেন। ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কৃষিখাতের উন্নতির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপের কথা বলেন। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও কৃষি ক্ষেত্রে অনগ্রসরতাকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ বলে তিনি আখ্যায়িত করেন।

সে সময় খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশের অন্যতম একটি গুরুতর সমস্যা ছিল। ঘাটতি পূরণে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার খাদ্য আমদানি করতে হতো। ফলে জাতীয় অর্থনীতি প্রবল চাপের মধ্যে ছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব বলে জিয়াউর রহমান বিশ্বাস করতেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দেশের প্রতি ইঞ্চি আবাদি ভূমিকে চাষের আওতায় এনে তাতে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে তিনি কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষক ও গ্রামের মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাগরণ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া গ্রামে গিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। বাড়ির চার দিকে পতিত জায়গায় ফল ও সবজি চাষ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছেন। রাস্তার দুই পাশে ফলের গাছ লাগানোর জন্য তিনি গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উৎপাদিত উচ্চ ফলনশীল ধান এবং মৌসুম উপযোগী নতুন নতুন শস্যবীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। কৃষিতে সব থেকে বেশি ভর্তুকি এবং সুলভ মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাসহ সার ও কীটনাশকের মূল্য কৃষকের নাগালের মধ্যে রাখা হয়। সারের চাহিদা পূরণের জন্য আশুগঞ্জে জিয়া সারকারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণে কৃষকদের সহযোগিতা করার জন্য ছয় হাজার বেকার যুবককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমনকি তারা যেন নিজ এলাকায় ছোটোখাটো প্রকৌশল শিল্পপ্রতিষ্ঠা করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯ দফা কর্মসূচি ছিল শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি কালজয়ী অবদান। রাষ্ট্রনীতিবিদরা এ ১৯ দফা কর্মসূচিকে একটি যুগোত্তীর্ণ 'ভিশন'হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জিয়াউর রহমান এ কর্মসূচি নিয়ে সারা দেশে ব্যাপক গণসংযোগ করেন। চার সপ্তাহের জনসংযোগ কর্মসূচিতে তিনি ৭০টি জনসভায় ১৯ দফা কর্মসূচির যৌক্তিকতা সম্পর্কে তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। ১৯ দফা কর্মসূচির ৫ নম্বর দফায় 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতি জোরদার করা' এবং ৬ নম্বর দফায় 'দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে', তার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়।

কৃষি উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। সেচের জন্য এ দেশের কৃষকরা প্রধানত বৃষ্টির পানির ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। ১৯৭১ সালে আবাদি জমির মাত্র ১৫ শতাংশ সেচের আওতায় ছিল। সেচের জন্য বৃষ্টির পানির ওপর

নির্ভরশীলতা কমানোর তাগিদ থেকে কৃষি খাতে উন্নতির লক্ষ্যে জিয়া সরকার ব্যাপকভিত্তিক 'খাল খনন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের মাধ্যমে খরা মৌসুমে কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেন। খাল খনন কর্মসূচিকে জিয়াউর রহমান একটি 'বিপ্লব' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭৯ সালের ১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি স্বয়ং উলশী-যদুনাথপুরের বেতনা নদীতে স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর প্রথম বছরেই ৫০ লাখ একর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানযোগ্য ১০৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০ সালে আরও ২৫০টি নতুন প্রকল্প চালু হলে ১৮০ লাখ একর কৃষিজমি সেচের আওতায় আসে। ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত জিয়া সরকারের খাল খনন কর্মসূচি চালু ছিল। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মতে, সরকার দেড় বছরের মধ্যেই দেড় হাজারেরও অধিক খাল খনন ও পুনঃখনন করে। সেই সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকদের সেচ সুবিধার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে তিনি বাংলার খরাকবলিত কৃষকের ভূমিতে পানির প্রবাহ ঘটিয়ে বাংলায় 'সবুজ বিপ্লবের' জন্ম দিয়েছিলেন।

শুধু সেচ সুবিধা বৃদ্ধি নয়, কৃষি খাতের উন্নতির জন্য জিয়া সরকার কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ১০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। একজন কৃষক নির্ধারিত ঋণ পরিশোধ করে বছরে তিনটি ফসলের জন্য ঋণ নিতে পারতেন। ঋণ নেওয়ার জন্য জমি ব্যাংকে দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

রাষ্ট্রপতি জিয়া বর্গাচাষিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জমি বন্ধক দিতে হতো না বলে বর্গাচাষিরাও কৃষিঋণ নিতে পারতেন। কৃষি উৎপাদনে সমবায় পদ্ধতির প্রচলনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। জিয়া সরকারের গৃহীত এসব কৃষিবান্ধব কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পরপর দুই বছর বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়। ১৯৭৪ সালের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ যেন না হয় সে জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারিভাবে ন্যায্যমূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান-চাল ক্রয়ের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হয়। সোনালি আঁশ নামে খ্যাত পাটচাষ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষক যেন পাটের ন্যায্যমূল্য পান সে জন্য মূল্য নির্ধারণসহ নানা কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়। বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পাটকলগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। জিয়ার আমলে এ দেশে রেশম ও রাবার উৎপাদন সম্প্রসারণ করা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব সরকারের আমলে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৭৮ সালে শেষ হয়। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নতুন একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের আগে একটি দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষির উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কৃষি খাতের জন্য পরিকল্পিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ছিল উচ্চফলনশীল জাতের কৃষিপণ্য আবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, বর্ধিত হারে বনায়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আমাদের খাদ্য তালিকায় আমিষের সরবরাহের একটি অন্যতম উৎস হলো মাছ। জিয়াউর রহমান হাজা-মজা পুকুর ও জলাশয় সংস্কার করে এতে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেন। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় খননকৃত খালে মাছচাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। আমিষ চাহিদা পূরণে হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষি চাষাবাদ, মাৎস্য ও দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গবাদিপশু পালনে কৃষকদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সরকারিভাবে উন্নতমানের গবাদি পশুর প্রজনন, পশুখামার প্রতিষ্ঠা, পশুখাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপন এবং পশু চিকিৎসা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৮০ সালের জুলাই মাসে জিয়া সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করেন। এ পরিকল্পনারও প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশ। এ লক্ষ্যে কৃষি পদ্ধতির দ্রুত রূপান্তরের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পুষ্টি চাহিদা পূরণে মাছ চাষ বৃদ্ধি এবং কাঠ উৎপাদন ও পরিবেশ রক্ষার জন্য বনায়ন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। স্বনির্ভর বা আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ১৯৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচির সূচনা করেন। গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে স্বনির্ভর সমিতি গঠন করা হয়। স্বনির্ভর সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রামে বৃক্ষরোপণ, মাছ ও হাঁস-মুরগি পালনের খামার তৈরি হয়। জিয়ার স্বনির্ভর বাংলাদেশ কর্মসূচির আরেকটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল 'গ্রাম সরকার' ব্যবস্থা। গ্রাম সরকারের ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডের পরিধির মধ্যে অন্যতম ছিল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারি নীতি কর্মসূচি বাস্তবায়নে কৃষকদের সহায়তা ও সরকারের সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের তদারকি। বস্তুত রাষ্ট্রপতি জিয়ার এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে

প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ায় কৃষক ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি ঘটে। জিয়াউর রহমান বিশ্বাস করতেন, গ্রামবাংলার উন্নতির ওপরই নির্ভর করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। এ জন্যই তিনি তার স্বল্পকালীন শাসনামলে গ্রামীণ কৃষি ও কৃষক সমাজে উন্নতির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এ দেশের কৃষক সমাজ তাকে গ্রহণ করেছিলেন তাদের বন্ধু ও একান্ত স্বজন হিসেবে। বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও কৃষি সাংবাদিক শাইখ সিরাজ ১৯৯৫ সালে বিটিভিতে প্রচারিত 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে 'কৃষকপিতা' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমান সত্যিকার অর্থেই একজন কৃষকবন্ধু ছিলেন। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের উন্নয়নের জন্যই তিনি জাতীয়তাবাদী কৃষক দলও গঠন করেছিলেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য গৃহীত বহুমুখী কার্যক্রমের জন্য তিনি এ দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে আছেন, থাকবেন।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
প্রকাশকাল : সোমবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২১
শীর্ষ খবর ডটকম

ইতিহাস তারেক ও কোকো'কে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাক্ষী দেয়

রাকেশ রহমান

বাংলাদেশের বিএনপি দলে অনেক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক রয়েছে। কষ্টের বিষয় তারা তা জানতে ও প্রচার করতে নারাজ।

অপর দিকে আঃলীগ প্রচারে অনেক এগিয়ে রয়েছে তাই তাঁরাই আজ বড় গলায় সবাইকে বলে রাজাকার আর আমরা চুপকরে হজম করে ফেলি। প্রচারে মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে রাজাকার আর রাজাকারের দল হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার দল।

বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বার বার তুলে ধরতে হয়। তাই ইতিহাস থেকে তুলে ধরছি আবারও।

পৃথিবীর ইতিহাসে আরও একটি বিরল ও বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহৎতম জানাযা হিসেবে শিশু মুক্তিযোদ্ধা আরাফাত রহমান কোকো'র জানাযা প্রমাণ করে দিলো বাংলাদেশের কোটি জনতার হৃদয়ে মিশে আছে জিয়া পরিবারের এই চার মুক্তিযোদ্ধার নাম।

মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ বাংলাদেশ, গণতন্ত্র বিজয়ীদের দেশ বাংলাদেশ, পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র দেশ বাংলাদেশ যে দেশ লড়াই করে বিজয় অর্জনের পরেও গণতন্ত্রের স্বাধীনতা পায়নি। গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে বার বার বাধা পেতে হয়েছেও এখনও হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিকামী ও শান্তি

প্রিয়, বাংলাদেশের মানুষ নিরীহ ও প্রতিবাদী। সময়ের প্রয়োজনে বার বার প্রতিবাদ করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। তবে প্রতিবাদের কিছু ধরণ রয়েছে যেমন- বহিঃপ্রকাশ।

বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে বুঝে নিতে হয় জনগণ বা বাংলাদেশের মানুষ কি চায়? আর যদি বহিঃপ্রকাশ থেকে বুঝেও ৭১' এর পাকিস্তানীদের মতো জোর করে বাংলাদেশিদের উপর ক্ষমতাসীনরা তাদের ইচ্ছের প্রতিফলন চাপাতে চেষ্টা করে তাহলে ফলাফল তাই হবে যেটা ৭১'এ ঘটেছিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশিরা বার বার তাদের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছিল। সেই বহিঃপ্রকাশকে থামিয়ে দিতে যে নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যা শুরু করেছিল পাকিস্তানীরা শুধু তারই প্রতিবাদে ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। ১৯৭৫ এর পরবর্তী সময় তৎকালীন সফল মেজর জিয়া যেভাবে বাংলাদেশকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সেটা গোটা বিশ্বের দরবারে আলোচিত হয়েছিল তারই প্রতিফলন বাংলাদেশের মানুষ দেখিয়েছিল শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জানাযায় চোখের পানি ফেলে শেষ সম্মান প্রদর্শন করে।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের জানাযায় যে পরিমাণ জনসাধারণ উপস্থিতি হয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বৃহৎতম আর বাংলাদেশের ইতিহাসে অদ্বিতীয়।

তারপর প্রথম স্বাধীনতা যোদ্ধা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সুদীর্ঘ আন্দোলনে বিজয় এনে দিলো বাংলাদেশের গণতন্ত্র।

তাই বাংলাদেশের জনগণ ৯১' সালে বিএনপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে তাদের প্রতিফলন দেখিয়েছিল।

আবার ফিরে এলো সেই পাকিস্তানী আমলের মতো অন্ধকার যুগ বাংলাদেশে। স্বাভাবিক নিয়ম ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিলুপ্ত করে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী সরকার ব্যবস্থা চালুর দিকে ধাবিত হচ্ছে আজ বাংলাদেশ।

যদিও বাংলাদেশের জনগণ ২০১৪ এর ৫ই জানুয়ারির নির্বাচন অনীহার সাথে বর্জন করেছে, এতেও যদি জনগণের বহিঃপ্রকাশ বুঝতে কষ্ট হয় তবে আর কিভাবে বাংলাদেশের জনগণ বুঝাবে?

২০১৪ এর ৫ই জানুয়ারির পর থেকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে বিরোধিতা জানিয়ে আসছিল।

এছাড়াও বিপুল পরিমাণ লোক সমাগত হয়ে বেগম খালেদা জিয়ার জনসভা গুলোতে একাত্মতার মাধ্যমে তাদের মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

যা শুধু আমরা বাংলাদেশের জনগণই নয় বরং বহিঃবিশ্বও দেখেছে এবং বহিঃবিশ্ব বর্তমান সরকাকে অনুরোধও করেছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসার জন্য। যদিও বাংলাদেশ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বহিঃবিশ্বের উপর নির্ভরশীল কিন্তু বর্তমান সরকার বহিঃবিশ্বের যে সব দেশে প্রচুর পরিমাণ বাংলাদশী আছে বা এখনও ঐ সব দেশের বাংলাদেশি নাগরিক প্রবেশের সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেসব দেশের সাথে নিজ ইচ্ছায় ও স্বার্থে সম্পর্ক ছেদ করছে। এতে সরকার নিজের পায়ে নয় বরং দেশের সকল জনসাধারণের পায়ে কুড়াল মারছে। আর এর মাসুল জনগণকে দিতে হবে। একের পর এক অনৈতিক কাজ যা দিয়ে বর্তমান সরকার বাংলাদেশেই নয় বরং পৃথিবীর ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের নাম লিখাচ্ছে।

তারেক জিয়া ও কোকো শিশু মুক্তিযোদ্ধা এটাই সত্যি, এটাই ইতিহাস। কারণ যারা ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত বা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদেরকেই ৭১' এর মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়া হয়েছে বা হয়। এই ক্ষেত্রে তারেক জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকো দীর্ঘ ৫ মাস পাক হানাদার বাহিনী দ্বারা আটক ছিলেন অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাঘাত ঘটিয়ে তারা ঐ শিশু বয়সেই দেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং ৭১' এর মুক্তিযুদ্ধে তাদের এই সরাসরি ভূমিকার কারণে তাদেরকে শিশু মুক্তিযোদ্ধা না বলার কোন কারণ নেই। আর এই ক্ষেত্রে ইতিহাস তারেক জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকো'কে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাক্ষী দেয়।

সময়ের প্রয়োজনে স্থান, কাল ও পাত্রের ভিক্তিতে ইতিহাস রচিত হয়। সেই ক্ষেত্রে কে বললো বা কে লিখলো সেটা মুখ্য বিষয় নয় বরং বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় স্থান, কাল ও পাত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ঘটনাটি সত্য তাহলে সেটাই বড় বিষয় সেটাই ইতিহাস।

লেখক ও কলামিস্ট লন্ডন থেকে

শীর্ষ খবর ডটকম

চরিত্রহনন এবং গণতন্ত্র

হুমায়ুন কবির

আমি মুক্ত উদার, তুমি প্রগতির শত্রু। উনি প্রগ্রেসিভ, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। আর সে তো একটি ওকাটা মুখ্য। আমাদের নিয়েই এই দেশ। একা কেউ রাষ্ট্র নয়, দেশ নয়, দল নয়, নীতি নয়, আদর্শ নয়। একা কেউ এসব হতে পারে না।

সবাইকে নিয়েই দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, দল, নীতি-আদর্শ। অন্যকথায় দেশ বা রাষ্ট্র জাতি বা দল নীতি ও আদর্শ একার জন্য হতে পারে না। দেশকে, রাষ্ট্রকে, নীতি ও আদর্শকে হতে হয় সবার জন্য। সবার কল্যাণের জন্য। এই সব কারা? এরা সবাই মিলে সব। কেউ কথায় কেউ কাজে তুমি প্রকাশ্য ঘোষণা করো আমি প্রতিক্রিয়াশীল। আমি প্রকাশ্য গদা ঘুরাই তুমি প্রকৃতির শত্রু। অথচ আমাদেরকে নিয়েই দেশ বা রাষ্ট্র জাতি বা দল নীতি ও আদর্শ নয় কি?

আমরা সবাই বুঝি কে কোন অ্যাঙ্গেলে কি কথা বলছি। তুমি যখন বল আমি প্রগতির শত্রু, তখন মনে করো না যে তোমার ওই বক্তব্যের পিছনে যে মানসিকতা লুকানো, তা আমার অজানা। অথবা আমি যখন বলি যে তুমি প্রতিক্রিয়াশীল, দালাল; তখন তুমিও ভালোভাবে জানো আমি কোন মতলবে কি বলতে চাইছি। উনি তিনি নামধারী জন-মহাজনেরাও সবকিছু জানেন, সব কিছু বুঝেন। আর না জানা-বোঝার দরুণই স্কুলের শতকিয়া নামতার 'ডাক' পড়ুয়া চতুর ছেলে-মেয়েদের মতো এক লাফে জয়ের ঘর থেকে নয়-এর ঘরে ডিঙ্গাতে কারো বাধে না। এই নয়-ছয়ের কান্ডকারখানা দৌলতে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে স্বীকৃত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মরহুম নেতারাও হয়ে জান 'সাচ্চা গণতন্ত্র' বা 'শোষিতের গণতন্ত্রের' ধারক-বাহক!

উনি তিনি দের সেই বক্তব্য নিয়ে আমরা পাড়া মাথায় তুলি। টেবিলের কাঁচ ভাঙতে চাই। চায়ের কাপে ঝড় উঠাই। যুক্তি দেখায়ই। কেতাবি ঝুলি ঝাড়ি। কেউ বলি এটা 'গণতন্ত্রের মানস-পুত্রের' প্রকাশ্য অপমান। কেউ বলি এটাই তার সঠিক মূল্যায়ন। কেউ বলি, এই পরিবর্তন অড়নিবার্য। কেউ টেবিল চাপড়ে ঘোষণা করি এটা স্রেফ পরিবর্তনের খাতিরে পরিবর্তন -তাও শুধু বক্তব্যে। এক কথা সাত কথায় পরিণত হয়। আমি বলি তুমি প্রতিক্রিয়াশীল। তুমি বলো, আমি প্রগতির শত্রু। আর আমাদের সবার থেকে দূরে শতকরা ৮৫ জনের 'মানস পুত্র' ওই আকালু শেক ও বেচারা অভিমান করেই বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যায়। মৃত্যু দিয়ে জানিয়ে যায় জীবনের দাবি। কিন্তু দাবির ব্যাপারে শুধু আকালু শেকেরাই নয়, অধুনা আমরাও কম যাই না। আমরাও সোচ্চার থাকি। সে দাবি পরিবর্তনের দাবি। সে দাবি কাঠামো বদলানোর দাবি। সে দাবি মিঠু বক্তৃতা দাবি। টেবিল চাপড়ানোর দাবি। দাবি এত বেশি যে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে বসে থাকলেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। প্রতিবাদ তো দূরের কথা টু শব্দটি করলেও হতে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আখ্যা পেতে হয় প্রগতি শত্রু বলে। আর টেবিল টকে বা চায়ের কাপে ঝড় তুলবার বেলায় এসব শব্দ যত ওয়ার্ড আত্ম বাক্যের মতো শোনায় বাস্তবে কাজের বেলায় এসব শব্দ যে আদৌ তা নয়, তা গলাকাটা লাশ নদীতে ভাষা মৃতদেহ থেকেই অনুমান করা চলে।

সে অনুমান তুমি যে করো না, তা নয়। আমিও সে অনুমান করতে পারি। উনি তিনি এরা তো পারেনি। আর পারেন বলেই তো এক-কথা সাত-কথা হয়। সবার অলক্ষ্যে 'আটক কেন্দ্র' থেকে বিবেকের সাবধান বাণী হয় উচ্চারিত। কান পাতি, শুনি, 'লিস্টি' তৈরি হওয়ার কথা। চোখ মেলে দেখি পরিকল্পিত মৃত্যুর আলামত। একটু গভীর চিন্তায় বুঝতে পারি অমুক বিরোধী বা তমুক বিরোধীদের নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। চক্রান্ত হচ্ছে দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করারও।

বিবেকের ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ! কেই বা শুনে, আর কে বা তার জবাব দেওয়ার গরজ অনুভব করে। সবচেয়ে বড় কথা হল, বোবার কোন শত্রু নাই। অথচ প্রতিবাদহীন অবস্থায় অলক্ষ্যে থেকে উচ্চারিত এই বক্তব্য যে একদিন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে কেউ তা অস্বীকার করতে পারেন কি? অথবা এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র চক্রান্ত যদি থেকেই থাকে, পারেন নাকি কেউ তা উদঘাটন করতে? তুমি পারো না। আমি পারি না। উনি পারেন না। তিনিও পারেন না। কিন্তু যারা পারত এধরনের কোনো ষড়যন্ত্র অস্বীকার করার, কিংবা সে চক্রান্তের বিষদাত উপড়ে ফেলার ক্ষমতা যাদের ছিল। সেই শতকরা ৯৫ জন যাদের সমষ্টিগত নাম আকালু শেক, তারা আজ বেওয়ারিশ।

অলক্ষ্য উচচারিত বিবেকের অভিযোগের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এ প্রতিবাদ তুমি করতে পারতে। আমি পারতাম। উনি পারতেন। এখনো প্রতিবাদ করতে পারেন। দেশবাসী বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিতে পারেন। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার কথা এখন কথার কথা। ওটা বক্তৃতায় ভালো শোনায়।

দেশে দারিদ্রতা আছে, চরম দুর্নীতি, দুঃশাসন, বিচারহীনতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, সামাজিক অবক্ষয়, অবহেলিত বঞ্চিত নির্যাতিতদের আর্তনাদ, পদে পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত, রক্ষক এর নামে ভক্ষক এখনো আছে।

সময় এগিয়ে চলছে। অথচ সবাই আমরা ভালোভাবেই জানি, কোন প্রতিবাদ কোন আহব্বান আন্তরিকভাবে কখনো ধ্বনিত হয় নাই। তাই তুমি যখন বল আমি প্রতিক্রিয়াশীল তখন আমি ভয় পাই। তোমার বক্তব্যের পিছনে আশঙ্কার একটা কালো ছায়া দেখি। অথবা আমি যখন বলি তুমি দালাল তখন তুমি স্বাভাবিকভাবেই ভুলে যাও ভাবো তাহলে কি লিস্টের নাম উঠছে?

উনি যখন বলেন আদি ও অকৃত্রিম গণতন্ত্রের যুগ শেষ, এখন প্রয়োজন 'সাচ্চা গণতন্ত্র' গণতন্ত্র তখন ভয়ে সন্দেহে আশঙ্কায় ও অবিশ্বাসে তিনি মুষড়ে পড়নে। জিজ্ঞাসা করারও সাহস খুঁজে পান না ওই 'সাচ্চা' ও শোষিত শব্দ বা বিশেষণ দুটি তাৎপর্য কি? দেশে উন্নয়ন উৎপাদন বৃদ্ধি পণ্যের মূল্য ইত্যাদি বিষয়গুলো অর্থনীতির। অর্থনীতিতে সক্ষমতা বজায় রেখে ও যে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র চালু সম্ভব অনেক উন্নয়নশীল দেশ তা প্রমাণ করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের মত সর্বজন স্বীকৃত আদর্শের বেলায় এ ধরনের বাড়তি শব্দ বা বিশেষণ কেন লাগানো হচ্ছে এর রহস্য কি?

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইদানীং বিভিন্ন মহলে চরিত্রহননের যে প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তার সবটাই যে এই ধরনের বিপ্লবী দর্শন থিওরি থেকে উৎসারিত তা মনে করার কোন কারণ নাই। কিছু কিছু থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু বেশির ভাগই মানসিক বিকারের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। নিছক ব্যক্তিগত আক্রোশ হিংসা-বিদ্বেষ থেকেও চরিত্রহননের বহু পাঁয়তারা অধুনা বহু মহলেই সংগঠিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায় এর প্রতিফলন ঘটছে অহরহ এ দ্বারা একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যে আমাদের এই সমাজটা যেন মানসিক দিক থেকে বড় বেশি মাত্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা জানি কোনো কোনো মহল ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের যা কিছু বড় মহৎ মহিয়ান গরিয়ান সে সব কিছুকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তৎপর। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই সমষ্টিগত ভাবে ও সত্যিকার অর্থেই কোন গুনগ্রহণের ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছি। যাকে মনে ধরে তাকে দেবতা কিংবা ফেরেশতা বানাই আর যাকে মনে ধরেনা তাকে শয়তান না শয়তানের সমগোত্রীয় বানিয়ে

ছাড়ি। স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে আবার সময় বিশেষে ফেরেশতাকে শয়তান বানাতেও দ্বিধা করি না।

কিন্তু ফেরেশতা ও শয়তানের মাঝখানে যে আরেকটি গোত্র আছে মানুষের গোত্র, যে মানুষ দোষে গুণে মানুষ। সেই সত্য আমরা ভুলে যাই। ফেরেশতা নয় বলেই মানুষ দোষ-ত্রুটির উর্ধে নয় কিন্তু কোন মানুষের গুণের তার প্রতিভার তার মহত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে শুধু তার দোষ ত্রুটি কেই যদি বড় করে দেখা হতে থাকে এবং দোষ ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি যদি তার চরিত্রহননের উপজীব্য করে তোলা হয় তাহলে সমাজের বিরাজমান মানসিক অসুস্থতাকে চাঙ্গা করা হয় না কি? এতে সমাজের দ্বারা সত্যিকারের অপরাধী তারাও নিজেদের অপরাধের সাফাই গাওয়ার চমৎকার ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চান, চান মানুষের তথা সমাজের উপকারে নিজের সেবা অবদান বিলিয়ে দিতে তারাও নিরুৎসাহিত হন।

চরিত্রহননের হিড়িক এর অবসান কামনা করে বলতে চাই একই ফুল থেকে যে যার চরিত্র উপাদান সংগ্রহ করে থাকে মানুষ নেয় সৌন্দর্য সুগন্ধ, প্রজাপতি নেয় রেনু, মৌমাছি মধু আর মাক্রোসা নেয় বিষ। স্মরণ করা যেতে পারে যে মহাকবি কায়কোবাদ তার একটি কাব্যে প্রচ্ছদে একটি কবিতা লিখেছিলেন এই বলে যে–

"মক্ষিকা ব্রণ খুঁজে
মধু খোঁজে ভ্রমর
সজ্জন গুণ খোঁজে
দোষ খুঁজে পামর।"

হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের সমাজের সজ্জনের অভাব বড়ো বেশি প্রকট কিন্তু যে সুখী সুন্দর ভবিষ্যত আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য কামনা করি সেখানে সজ্জনের সমাহার অধিক হবে এটাই আমাদের কামনা হওয়া উচিত।

আমরা শুনেছি গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে যে চ্যাঁচাও ও গণতন্ত্রের ডেফিনিশন জানো? তুমি আজ টেবিল চাপড়ে বল গণতন্ত্র দিয়ে হবেটা কী? যে দেশে গণতন্ত্র নাই সে দেশের লোকে খেতে পারছে না আমি আজ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলছি আইনের শাসন, আইনের শাসন, বলে চ্যাঁচিয়ে লাভ কি? এটা ব্রিটেন নয়।

সবাই আমরা এটা জানি যে সত্যিকারের গণতন্ত্র কোন বিশেষণে বিশেষিত নয়। সে গণতন্ত্র পার্লামেন্টেরিয়ান ফর্ম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজতন্ত্রেও গণতন্ত্র হয়। আপনিও জানেন সাচ্চা গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র, শোষিত দের গণতন্ত্র অথবা একদলীয় গণতন্ত্র যে

সব দেশে চালু তারা সবাই বলছেন আদি ও অকৃত্রিম গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তারা গণতন্ত্রের সাধনা করছেন।

আমরা খুব ভালো করেই জানি যে সাচ্চা গণতন্ত্র শোষিতদের বা জনগণের কিংবা কৃষক-শ্রমিকের গণতন্ত্রের সত্যিকারের গণতন্ত্র বলে যারা বলে থাকেন তারা ইতিহাসকে বিকৃত করেন না সংগ্রামীদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আদি ও অকৃত্রিম গণতন্ত্রকে খর্ব বিকৃত ও বিকলঙ্গ করতে চান। আমরা জানি এবং ইতিহাসেও প্রমাণ মিলে যে যেসব দেশে আদি ও অকৃত্রিম গণতন্ত্রে উত্তরণের নামে একবার কোন খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে ওই সব দেশ আর কখনো সাধারণভাবে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র পৌঁছতে পারেনি। যারা পেয়েছে তাদের কে সে জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দিতে হয়েছে অনেক মাশুল, অনেক রক্ত। পক্ষান্তরে যারা পারেনি, তাদের কেউ আজ সিকি শতাব্দী আবার কেউবা আদা শতাব্দি পরে এসে এই বলে নিজের মনকেই ঠারছেন যে, এই খণ্ডিত খর্ব বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র হলো সাচ্চা গণতন্ত্র!

কিন্তু এত কথা বলে কি লাভ। নিশ্চয়ই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছ না। আমি ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। আমরা সবাই কম চিন্তাযুক্ত নই। তবুও বলি গণতন্ত্রের নানা প্রশ্ন অনিবার্য গণতন্ত্রের মধ্যে থাকবেই বিরোধিতার অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র হয় না কিন্তু তাই বলে গুলি করে, গুম করে, জেলে ভরে, উন্নয়নের নামে লুটপাট চালিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না সেটা জনগণ মেনে নেয় না। পরিশেষে একটি কথাই বলি দেশ কারো একার নয়, দেশ সবার, গণতন্ত্র কোন মহল বিশেষের উত্তরাধিকার নয়, সবার সংগ্রামের অর্জিত এই গণতন্ত্র তাই আসুন দলমত নির্বিশেষে লোভ লালসা ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থে গণতন্ত্রের চর্চা করি।

লেখক ও সাংবাদিক

প্রকাশকাল : বুধবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শীর্ষ খবর ডটকম

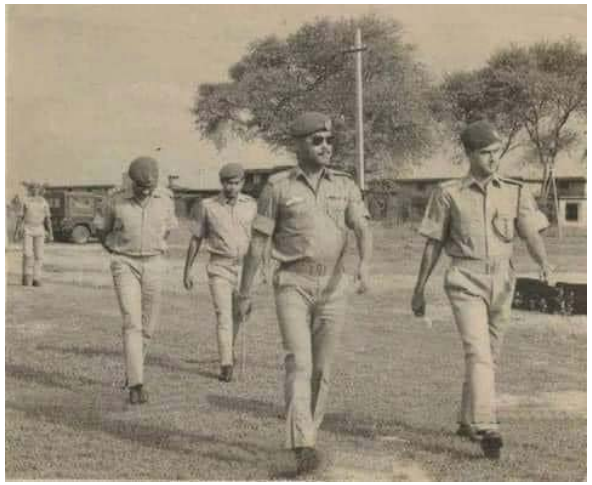

মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে জিয়ার সাহসিকতার খেতাব বাতিল কার স্বার্থে?

ডক্টর এম মুজিবুর রহমান

এক

জিয়াকে হেয় করা মানে মুক্তিযুদ্ধে দেশের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে 'উই রিভোল্ট' বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমান সম্মুখ সমরে অংশ নেয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকার কথা মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন লেখাতে উঠে এসেছে। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা এবং নিজে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের শেষ ভাগে সিলেট অঞ্চলে তাঁর বাহিনীর কাছেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে অদম্য সাহসিকতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে সাহসিকতার খেতাব বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে প্রতিষ্ঠিত জামুকার একটি সভায় খেতাব বাতিলে যেসব বক্তব্য উঠে এসেছে তা

ইতিহাস ও বাস্তবতার সাথে শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষী মনোভাবের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, ইতিহাসবিদ এবং তখনকার সামরিক কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গ্রন্থের দালিলিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে মুক্তিযুদ্ধ ও জিয়াউর রহমান ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রমাণিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আত্মমর্যাদাশীল ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার বাস্তব পদক্ষেপসমূহ জিয়াউর রহমানের হাত ধরেই শুরু হয়। আর এজন্যই আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের দোসরদের কাছে জিয়াউর রহমান বড়ই মনোবেদনার কারণ।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির দিকে চোখ রাখলে এটা বুঝার জন্য বড় বিশেষজ্ঞ বা পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পরে না যে, কারা বাংলাদেশে বিদ্বেষ, বিভাজন ও প্রতিহিংসার রাজনীতি জিইয়ে রাখতে চায়। বাংলাদেশকে কারা মর্যাদাবান রাষ্ট্রের উত্থান থেকে পিছিয়ে রাখতে চায়। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বকে বিতর্কিত করা গেলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের যুদ্ধেকে অন্য একটি দেশের সাথে পাকিস্তানের আঞ্চলিক যুদ্ধ হিসেবে চিত্রায়িত করার পথটি আরো সুগম হয়। হয়তো আমাদেরকে চরম মূল্য দেয়ার জন্য আগে থেকেই তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের রাজনীতিতে একজনকে সবার উপরে স্থান দিতে গিয়ে অন্যদের ম্লান করার জোরালো প্রচার চলছে। এখানে এই দুটি বিষয়ের পাশাপাশি পঁচাত্তরের আগে ও পরে জিয়াউর রহমানের অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোকপাত করার ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। যদিও ভারতীয় বাহিনী এ যুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়েছিলো একেবারে শেষের দিকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। অথচ ভারতের অনেকেই ১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেকে নিতান্তই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন। এটা কি শুধু বলার খাতিরে বলা নাকি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ, বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তা আজ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে?

গত ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অসীম সাহসিকতাকে স্মরণ করে টুইট করেছেন। কিন্তু তার টুইটে যেমন আসেনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তেমনি ওই টুইটে যে অসংখ্য ভারতীয় মন্তব্য করেছেন তাতেও প্রায় সবাই ওই যুদ্ধকে চিত্রিত করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার যুদ্ধ হিসেবে।

এর প্রেক্ষিতে বিবিসি বাংলার সাথে সাক্ষাৎকারে বেসরকারি সংস্থা ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এম এ হাসান যিনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি বলেন, "এটি সত্যি যে ভারতীয়দের অনেকে এখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলেন। এর সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বও একমত পোষণ করলে বুঝতে হবে যে অনেকে যে অভিযোগ করেন ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নয় বরং পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য ওই লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলো সেটিই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। '(সূত্রঃ বিবিসি বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০)।

এছাড়া ২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া ভারতের বলিউডে গুন্ডে নামের একটি সিনেমায় একাত্তরের যুদ্ধকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ না বলে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করা নিয়ে তুমুল শোরগোল হয়| বিশেষ করে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিলো বাংলাদেশীদের তরফ থেকে। এভাবে দেখা যায় ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব এমনকি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে ম্লান করে দেয়ার একটা প্রচেষ্ঠা রয়েছে এবং সেটি সেই ১৯৭১ সাল থেকেই। বলতে গেলে পাকিস্তানিদের আত্মসমপর্ণের সময় থেকেই পরিকল্পিতভাবে অনেক কিছু করা হয়েছিল বলেও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও ইতিহাসবিদের লেখা থেকে উঠে এসেছে।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের এপ্রিলে নতুন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্বতন্ত্র পরিচয়ে যাত্রা শুরু করে। আশা করা হয়েছিল, তৎকালীন সিনিয়র সামরিক অফিসার হিসেবে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করবেন। কিন্তু একই ব্যাচ বা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলের ১২তম লং কোর্সের সহপাঠী, কিন্তু জিয়াউর রহমান থেকে কনিষ্ঠ, কে এম সফিউল্লাহকে সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান কে এম সফিউল্লাহ কিছুদিন পূর্বে একটি সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন যে, জিয়াউর রহমান তাঁর থেকে সিনিয়র ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে প্রথম সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব দেয়ার সময় তিনি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে বিষয়টি মনে করিয়েও দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদ্যতাপূর্ণ ও আস্থার সম্পর্ক থাকার পরেও জিয়াউর রহমানকে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান করতে পারলেন না কেন? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীতে জানা যায় একটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আপত্তির কারণে সেটি সম্ভব হয় নাই। কারণটিও পরিষ্কার। জিয়াউর রহমানের নাম যত বিকশিত হবে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের অংশগ্রহণ

সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশীদের নেতৃত্ব নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা রয়েছে তাতে কোনো দ্বিমত নেই। তবে এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়েও (একাত্তর সালের নভেম্বর মাস) কেন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলেন নাই। আজকের লেখার উদ্দেশ্য স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কথা বলা নয়। ভারতের পক্ষ থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রাখা আর অদ্যাবদি ভারতের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ বলে প্রচারণা একই সূত্রে গাঁথা বললে কি অত্যুক্তি হবে?

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান তার বই মুক্তিযুদ্ধ ৭১'এ লিখেন, "১৯৭১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের নেতারা স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে ভারত সরকারকে খুব বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করেন। তখন স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে ভারত সরকার গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো প্রমাণ, কোনো দলিল, কোনো জীবিত সাক্ষ্য আপনাদের আছে কি? ভারত সরকার বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও অন্য প্রধাণ নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে, কাউকে কিছু বলে গেছেন কিনা শেখ মুজিবুর রহমান। এর মধ্যে জহুর আহমদ চৌধুরীও ছিলেন। প্রত্যেকেই বলেছেন, কাউকেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলে যান নি। জহুর আহমদ চৌধুরী নিজে তাজউদ্দীনকে বলেছেন তাকে কিছু বলা হয়নি।" (উল্লেখ্য জহুর আহমদ চৌধুরীর বরাত দিয়ে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা প্রচার করার চেষ্টা করে থাকেন)।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে ১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর বলেছিলেন, "স্বাধীনতার ডাক এসেছিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হবার পরে, তার পূর্বে নয়। আমার জানামতে তিনি কোনো সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি। " [The cry for independence arose after Sheikh Mujib was arrested and not before. He himself, so far as I know, has not asked for independence even now." শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রদত্ত ভাষণটি দেখা যাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহের নিউজ লেটারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালনার ব্যাপারে সন্দেহ ও ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে পারলেই ভারতের

সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়ক হয় বলে অনেকের ধারণা। ভারতের অনেক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নের কথা প্রায়ই শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের 'উই রিভোল্ট' বলে আনুষ্ঠানিক মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঘোষণা এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শন অন্যতম বাঁধা বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে তার পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় জার্মানি থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। জার্মানির পূর্বেকার সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার অদম্য বাসনা থেকেই হিটলার তার দেশের জনগণকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেন। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির গ্রোতধারা এবং বৃহৎ প্রতিবেশীর আচরণ সর্বোপরি উক্ত অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির গতি প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে সহনশীলতার বিপরীতে বিদ্বেষ, বিভাজনের রাজনীতি ও প্রতিহিংসামূলক কর্মকান্ড আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

দুই

জিয়ার রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিই তাঁকে প্রতিপক্ষের আসনে বসিয়েছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রয়াত অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ তাঁর একটি গবেষণামূলক লেখায় উল্লেখ করেন, "বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন, যে যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যর্থ হয়েছেন ওই সব ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমানের সাফল্য আকাশচুম্বী। এই ঐতিহাসিক সত্যই বাংলাদেশের রাজনীতিকে করে তুলেছে সংঘাতময়। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নেতা নেত্রীর নিকট এই সত্য দুঃসহ এক বোঝার মতো হয়ে রয়েছে। তারা না পারছেন এটা ভুলতে, না পারছেন ফেলতে। তাই তারা জিয়ার সকল সৃষ্ঠির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। লক্ষ্য একটাই শেখ মুজিবকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে হবে হবে। এদেশে তার মতো অন্য কোনো নেতার জন্ম হয়নি– একথা যেন তারা শতমুখে বলতে পারেন, তার উপর দেবত্ব আরোপ করে এরই মধ্যে শেখ মুজিবকে মাটি থেকে আকাশে তোলা হয়েছে। "

ব্যক্তিগতভাবে জিয়া কারও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নন। তাঁর রাজনীতিই তাঁকে প্রতিপক্ষের আসনে বসিয়েছে। বাকসর্বস্ব ও মেধাহীন রাজনীতির বিপরীতে জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষতা ও সততার সমন্বয়ে জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেন। জাতিভিত্তিক

জাতীয়তাবাদের জায়গায় তিনি রাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিয়তাবাদের দর্শন দেশের ধর্ম- বর্ণ- গোত্র- নৃগোষ্ঠী তথা আপামর সকল মানুষকে অভিন্ন প্লাটফরমে এনে দাঁড় করায়। ফলে বাংলাদেশ বিভেদ ও হানাহানির বাইরে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি তৈরির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পাটাতন লাভ করে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনেই জাতিসত্ত্বার সঠিক স্বরূপটি মূল্যায়িত হয়, যা আমাদের ভৌগলিক জাতিসত্ত্বার সুনির্দিষ্ট পরিচয় দান করে। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশীদের আত্মপরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিয়তাবাদের দর্শন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখারও সাহসী অঙ্গীকার।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় মেধা, দক্ষতা ও সততার সমন্বয় ছাড়া জাতি গঠনের রাজনীতির সফলতা মানুষের দ্বারগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সততার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান ছিলেন সোচ্চার। মেধাবী ও দক্ষ লোকদের রাষ্ট্র গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাছে টেনেছিলেন। রাজনীতিতে স্ব স্ব ধর্মের একটা অবদান থাকতে পারে। তাই ধর্মের আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল নয় বরং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আধুনিক ও সৃষ্টিশীল চিন্তা-চেতনার সমন্বয়ে গণমুখী ও কল্যাণকর রাজনীতির ধারা সূচনা করেন তিনি। যা দেশে হয় সমাদৃত। বিশ্ব রাজনীতি বিশেষ করে গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে চার দশক পূর্বে ঘোষিত জিয়াউর রহমানের রাজনীতির চিন্তা-চেতনা ছিল কতটা বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করার পাশাপাশি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর রাজনীতির ভিতকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে একটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের রাজনীতির প্রবক্তা শহীদ জিয়া।

জিয়া রাজনীতিতে ডান, বাম এবং মধ্যপন্থার চিন্তাশীল মানুষদের গণতন্ত্রের বিকাশ এবং দেশ গঠনে একত্রিত করে উজ্জীবিত করেছিলেন। স্বাধীনতার পর নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র এবং পরবর্তীতে একদলীয় বাকশালের বিপরীতে বহুদলীয় রাজনৈতিক চর্চা বিকশিত হয় তাঁর শাসনামলে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিকরণের স্বার্থে সহনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জিয়াউর রহমান দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। বহুদলীয় রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে ভারতে প্রেরণ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনেন।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন ও বিরোধী দলগুলোর প্রতি তাঁর উপলব্দি সম্পর্কে যদ্যপি আমার গুরু বইয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আহমদ ছফা প্রখ্যাত দার্শনিক জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের মতামত তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "স্যারের শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনা শেষ হলে আমি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে স্যারের মতামত জানতে চাইলাম। তখনও শেখ সাহেব বেঁচে আছেন। স্যার, একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন নাইন্টিন সিক্সটি নাইন থ্যাইকা সেভেন্টি ওয়ান পর্যন্ত সময়ে শেখ সাহেব যারেই স্পর্শ করছেন, তার মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিছেন। হের পরের কথা আমি বলবার পারুম না। আমি গভর্নমেন্টের কারও লগে দেখাসাক্ষাৎ করি না। সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তার লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন। কথায়-কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহেরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়া তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী ইলেকশানে অপজিশান পার্টিগুলো ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সীট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়া দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন, আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।"

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে জনমনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং দেশ পরিচালনায় জিয়াউর রহমানের ভূমিকা অন্য সবার থেকে আলাদা। বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্র চিন্তক এবং বাংলাদেশের সক্রেটিস খ্যাত অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক যে সংশয় ও আফসোস করেছিলেন জিয়াউর রহমান তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আর এটাই অন্য পক্ষের মনোক্ষুন্নের কারণ।

লেখক ও গবেষক প্রয়াত মাহফুজ উল্লাহ 'প্রেসিডেন্ট জিয়া অব বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থে জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, জেনারেল বা রাজনীতিবিদের কোনোটাই জিয়ার সঠিক পরিচয় নয়। ইতিহাসে জিয়া অভিহিত হবেন একজন স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। রাষ্ট্রনায়কের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। প্রথমেই যেটা বলা হয়, তা হচ্ছে একজন রাজনীতিবিদ শুধু পরবর্তী নির্বাচনের কথা ভাবেন। আর রাষ্ট্রনায়কের থাকে ভিশন, স্বপ্ন এবং তিনি ভাবেন ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের কথা। একজন রাজনীতিবিদ একটি প্রকল্পের ব্যয় নিয়ে তর্ক করেন আর রাষ্ট্রনায়ক আলোচনা করেন প্রকল্পের উপযোগিতা।

ঢাকায় একসময় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি বাইলাম লিখেছেন, জিয়া যদি ১৯৮১ এর পরিবর্তে ১৯৭৫ সালে নিহত হতেন তাহলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান অথবা লাইবেরিয়ার মতো একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারত। মাইলাম লিখেছেন, 'অবশ্য সেনা শাসকদের মতো কঠোর পদ্ধতিতে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিয়া বাংলাদেশকে ওই অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন।' রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাহাদাতের পর ১৯৮১ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট আয়োজিত এক সভায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কমনওয়েলথের তদানীন্তন মহাসচিব স্যার সিদ্ধার্থ রামফাল বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশে শুধু একদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করেননি; এ উন্নয়নকর্মী দেশকে সার্বিক উন্নয়নের রাজপথে পরিচালিত করেছিলেন।'

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের যে জাতীয় অঙ্গীকারগুলো ছিল দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আজ তা সুদূর পরাহত। আগে যারা আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থের জন্য লড়াই করেছেন, তাদের জায়গায় এখন আত্মস্বার্থ কায়েমকারীরা জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু জিয়া তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি যে গভীর দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। রাজনৈতিক বিরোধীরাও তাঁর সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনি। তাই জিয়াউর রহমানের রাজনীতিকে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে কাগুজে ফরমান জারির মাধ্যমে তাঁকে মুছে ফেলার বিকৃত মানসিকতা রাজনৌতিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ বৈ অন্য কিছু নয়।

তিন: মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার বীরত্বগাঁথা চেতনা ব্যবসায়ীদের অন্তর্জ্বালা।

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও অপপ্রচারের আরেকটি কারণ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়ার সাহসিকতা ও ঈর্ষণীয় সাফল্য। জিয়া হচ্ছেন ইতিহাসের হাতেগোনা জেনারেলদের একজন, যিনি সামরিক অফিসার হিসেবে মাতৃভূমির জন্য দুটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ করেছেন। দুটি যুদ্ধই জিয়ার জীবনকে দিয়েছে গৌরবের মর্যাদা। জিয়ার রণকুশলতা সর্ম্পকে ভারতের ইষ্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরো যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান প্রথম বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধের ৯ মাস অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ও জেড ফোর্সের অধিনায়ক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকার ২০০২ সালে এক স্মৃতিচারণায় বলেন, 'যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর একজন বাঙালি মেজরের কথা শোনা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আমি নিজে জানি, যুদ্ধের সময় জানি, যুদ্ধের পরবর্তী সময়েও জানি যে মেজর জিয়ার এই ঘোষণাটি পড়ার ফলে সারা দেশের ভেতরে এবং সীমান্তে যত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংঘাতিক একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে হ্যাঁ, এইবার বাংলাদেশ একটা যুদ্ধে নাম।' (এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ও এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন)।

১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য দেন, যেটি প্রচারিত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সেখানে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "The brilliant success of our fighting forces and the daily additions to their strength in manpower and captured weapons has enabled the Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh, first announced through Major Ziaur Rahman, to set up a full pledged operational base from which it is administering the liberated areas." [Bangladesh Documents, Vol-1, Indian Government, Page 284].

স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখিত তাজউদ্দীন আহমদ বেতার ভাষণে আরো বলেন,

"চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের সমর পরিচালনার ভার পড়েছে মেজর জিয়াউর রাহমানের ওপর। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর আক্রমণের মুখে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে উঠেছে এবং আমাদের মুক্তিবাহিনী বীর চট্টলের ভাই-বোনেরা যে সাহসিকতার সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রতিরোধ স্টালিনগ্রাডের পাশে স্থান পাবে। এই সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম আজও শত্রু কবলমুক্ত রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সম্পূর্ণ নোয়াখালী জেলাকে "মুক্ত এলাকা" ঘোষণা করা হয়েছে।"

এই ঘোষণায় প্রমাণিত হয়, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময়টিতে মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বশূন্য ছিল না। তাঁর ভাষায়, মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সেখান থেকে মুক্ত এলাকা (খরনবৎধঃরড়হ ধৎবধ) শাসিত হচ্ছে। তখন পর্যন্ত (১০ এপ্রিল ১৯৭১) জিয়াউর রহমান ব্যাতিত আর কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধরত দেশের কোনো শাসক, প্রশাসক, সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান দাবিদার ছিলেন না। বিষয়টি তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যে প্রমাণিত।

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের প্রথম দিকে ১৯৭৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার কৃতিত্ব ও সম্ভাবনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরেন। জিয়াকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'Your position is already assured in the annals of the history of your country as a brave freedom fighter who was the first to declare the independence of Bangladesh.' অর্থাৎ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রথম দিয়ে তিনি যেভাবে সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম চির সংরক্ষিত থাকবে।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্ ও তখনকার সামরিক কর্মকর্তাদের লিখিত বই পত্র এবং জীবিত কর্মকর্তাদের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তা তথ্যগতভাবে সঠিক নয় বরং প্রতিহিংসামূলক। শৃঙ্খলিত বাহিনীর সদস্য এবং একজন সামরিক অফিসার হয়ে জীবন বাজি রেখে স্বধীনতার পক্ষে প্রথম বিদ্রোহ করে আনুষ্ঠানিক মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সম্মুখ সমরে জিয়ার বীরত্মগাঁথা ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঊষালগ্নে নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করার হীনমন্যতা কাটাতে যারা জিয়াকে খাটো করার অপচেষ্টা করছেন তাদেরকে দেশের জনগণ ও ইতিহাস ক্ষমা করবে না, করতে পারে না।

চার: ১৫ আগস্ট পরবর্তী ঘটনার ক্রম তালিকা এবং প্রতিপক্ষের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বাপর ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সামরিক অফিসারদের লিখিত দালিলিক তথ্য-উপাত্ত এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও সামরিক অফিসারদের বয়ানে যেসব তথ্যাদি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করে যে, জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে একটি গোষ্ঠী বিদ্বেষ, বিভাজন ও প্রতিহিংসার রাজনীতিকে উস্কে দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনুষ্ঠানিক বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার ঘোষণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অন্য একটি দেশের যুদ্ধ বলে প্রচারণায় ঘি ঢালছেন।

দালিলিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সে সময়কার ঘটনাবলীর ক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১। ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সহ সভাপতি ও বাকশালের ৪ নং সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপৎ নেন। গঠন করেন মন্ত্রী সভা। শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার প্রায় সকলই খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রী সভায় শপৎ নেন। যাদের অনেকেই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে দলীয় সর্বোচ্চ ফোরামে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি এমপি, মন্ত্রী, উপদেষ্ঠাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন অথবা এখনো অনেকে করে যাচ্ছেন।

২। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়ে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ঐ সময় সেনা প্রধান ছিলেন কে এম সফিউল্লাহ। যিনি আবার পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নমিনেশনে এমপিও হয়েছেন।

৩। জিয়াউর রহমান সে সময় ছিলেন সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ।

৪। খন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রিসভার শপৎ পরিচালনা করেন তৎকালীন কেবিনেট সচিব এবং বর্তনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্ঠা এইচ টি ইমাম।

৫। মোশতাক সরকারের সংসদে স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শেখ মুজিব সরকারের মন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল। যিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

৬। খন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রিসভার শপথে যাননি জিয়াউর রহমান। বিজয়ের বেশে গিয়েছিলেন কর্নেল (অবঃ) তাহের, হাসানুল হক ইনুসহ যাদের অনেকেই এখন আওয়ামী লীগের সঙ্গী।

৭। ১৫ আগস্টের পর আরো ১০ দিন অর্থাৎ ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ ছিলেন সেনা প্রধান।

৮। রাষ্ট্রদূত হিসেবে মোশতাক সরকারি চাকুরী কনফার্ম করার পর সেনাপ্রধানের পদ ছাড়েন মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ।

৯। এরপর যথা নিয়মে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ থেকে প্রমোশন পেয়ে ২৫শে আগস্ট সেনাপ্রধান হন জিয়াউর রহমান।

১০। জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হলেও সে সময় তিন বাহিনী প্রধানের উপর আরো দুটি পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথমবারের মত চীফ অব ডিফেন্স নামে একটি পদ সৃষ্টি করেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক। সেই পদে দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্বের সর্বাধিনায়ক

জেনারেল ওসমানীকে করা হয় রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

১১। জিয়াকে মেনে নিতে পারেন নি উচ্চাভিলাষী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তিনি জিয়াউর রহমানকে সরানোর চক্রান্ত শুরু করেন। চক্রান্তের অংশ হিসেবে খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ সালের ২রা নভেম্বর সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দী করেন।

১২। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩রা নভেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোশতাকের অনুমোদন নিয়ে মেজর জেনারেল হিসেবে নিজেই নিজের প্রমোশন নেন।

১৩। ২রা নভেম্বর দিবাগত রাত থেকেই ক্যানটনমেন্ট এবং বঙ্গভবনে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেন খালেদ মোশাররফ। এরপর থেকে প্রশাসন চলে খালেদ মোশারফের ইশারায়।

১৪। জিয়াউর রহমান বন্দী থাকা অবস্থায় ৩রা নভেম্বর ঘটে যায় জেল হত্যাকান্ড।

১৫। খালেদ মোশাররফ ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সামরিক অফিসারদের নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনে চাকরির বন্দোবস্ত করার সমঝোতা করেন। সেই সমঝোতা অনুযায়ী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসেবে খালেদ মোশাররফের স্ত্রীকে তাদের সঙ্গে বিমানে তুলে দেয়া হয়। বেগম খালেদ তাদেরকে নিরাপদে ব্যাংককে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

১৬। ১৯৭৫ সালের ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন খন্দকার মোশতাক। খন্দকার মোশতাক এবং খালেদ মোশাররফের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। বিচারপতি সায়েম ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারী পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরেন। এর দু'দিন পর ১২ জানুয়ারী বিচারপতি সায়েমকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

১৭। ১৫ই আগস্ট থেকে মোশতাক-সফিউল্লাহ জারি করা সামরিক আইন বহাল থাকায় রাষ্ট্রপতি সায়েম একাধারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকেরও দায়িত্ব পালন করেন।

১৮। ৭ই নভেম্বর সংগঠিত হয় সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব। জিয়াউর রহমানকে বের করে আনা হয় বন্দী দশা থেকে। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব

সংঘটিত হওয়ার পর পালাতে গিয়ে নিহত হন ব্রিগেডিয়ার (অব:) খালেদ মোশাররফ।

১৯। ১৯৭৭ সালের ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি সায়েম।

২০। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথে সমঝোতার পর দেশ ছেড়ে যাওয়া ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সামরিক অফিসারদের বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে চাকরির গেজেট প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের ৮ জুন। এই সময় রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

২১। জিয়াউর রহমান তখন ছিলেন সেনাপ্রধান এবং ডিসিএমএলএ।

২২। ১৯৭৭ সালের ২০শে এপ্রিল প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন বিচারপতি সায়েম। এরপর প্রেসিডেন্ট এবং উত্তরাধিকার হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন জিয়াউর রহমান।

২৩। ১৯৭৮ সালের মে মাসে জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির উপর জনগণের আস্থা আছে কি না সেটি যাচাইয়ের জন্য ৩০শে মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

২৪। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হন জিয়াউর রহমান।

২৫। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি ২০৭টি আসনে জয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ পায় ৩৯টি আসন। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়।

২৬। জিয়াউর রহমান সামরিক আইন জারি করেন নি। ১৫ই আগস্ট সামরিক আইন জারি করেন খন্দকার মোশতাক যখন সেনাপ্রধান ছিলেন কে এম সফিউল্লাহ। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বরং তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

২৭। ১৯৭৪ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইনের সংশোধনীতে প্রথম ইনডেমনিটি দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনীকে অত্যাচার, নির্যাতন, লুটতরাজ ও গোপনে-প্রকাশ্যে হত্যাকান্ডের দায় থেকে মুক্তি দিতে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইনে এ সংশোধনী আনা হয়। এটা ছিল ১৯৭৪ সালের ১১নং আদেশ। ১৯৭৪ সালে রক্ষীবাহিনী আইনের সংশোধনী এনে ইনডেমনিটি দেয়া হলেও কার্যকারিতা দেখানো হয় ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। অর্থাৎ রক্ষীবাহিনী কার্যক্রমের শুরু থেকে যা কিছু করেছে সবই দায়মুক্তি পায় ১৯৭৪

সালের সংশোধনীতে। ১৯৭২ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনী অর্ডার নামে আইন তৈরির মাধ্যমে রক্ষীবাহিনী গঠনের পর এটিই ছিল এ আইনের প্রথম সংশোধনী।

২৮। জিয়াউর রহমান ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন নি। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক সরকার ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর।

২৯। শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করেন নি। ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, যিনি কিনা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক।

জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ১৫ আগস্টের হত্যার মদদের অভিযোগ করে থাকে আওয়ামী লীগ। তবে সত্য হলো আওয়ামী লীগ আমলে দায়েরকৃত ও বিচারকৃত মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডে জিয়াকে আসামি করা হয়নি, প্রকাশিত রায়ে হত্যাকাণ্ডে জিয়ার সংশ্লিষ্টতার কথাও বলা হয়নি। আর ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে রক্ষীবাহিনী গঠনের পর তাদের অত্যাচার, নির্যাতন, লুটতরাজ ও গোপনে-প্রকাশ্যে হত্যাকান্ডের দায় থেকে মুক্তি দিতে ১৯৭৪ সালে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইনের সংশোধনীতে প্রথম ইনডেমনিটি দেয়া হয়।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব ও সম্মুখ সমরে বীরত্বের ইতিহাসকে খাটো করে পদক বাতিলের জন্য যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রতিহিংসামূলক এবং রক্তের বিভাজন ও বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার অপকৌশল। রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রীয় মদদে গুম, খুন, দুর্নীতির অপশাসনে নিমজ্জিত রাষ্ট্রকে মাফিয়া রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করছে, তখন এ থেকে জনগণের দৃষ্টি আড়াল করতে জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের ইস্যুটি সামনে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশে রাজনৈতিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে হানাহানির পথকে উস্কে দেয়ার মাধ্যমে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলের পথকে সুগম করা। সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মূখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।

বাংলাদেশের স্বাধীন স্বত্তা এবং আত্মমর্যাদাশীল অবস্থান যাদের কাছে অপছন্দনীয় তাদের কাছে জিয়াউর রহমানের বীরত্বগাঁথা অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করে। এজন্যই জিয়াউর রহমানের বিরুদ্বে তাদের বিদ্বেষী ও বিকৃত

মানসিকতার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলাদেশ ও জিয়াউর রহমান এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাতের তালু দিয়ে নিজের চোখ ঢাকা যায় কিন্তু সূর্যকে নয়। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ থেকে জিয়াউর রহমানের নাম যারা মুছে ফেলতে চান, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে একদিন তারাই নিক্ষিপ্ত হবেন। জিয়া একটি ইতিহাস, জিয়া একটি বৈপ্লবিক চেতনা। তাই জিয়া বহন করছেন রাজনৈতিক অমরত্বের উত্তরাধিকার।

সংবাদ বিশ্লেষক
সাবেক সহকারী অধ্যাপক,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
প্রকাশকাল : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
শীর্ষ খবর ডটকম